এপ্রিল-জুন ২০২১

নিরীক্ষা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এর গণমাধ্যম সাময়িকী

২৩৫ তম সংখ্যা

নিরীক্ষা

২৩৫তম সংখ্যা : এপ্রিল-জুন ২০২১

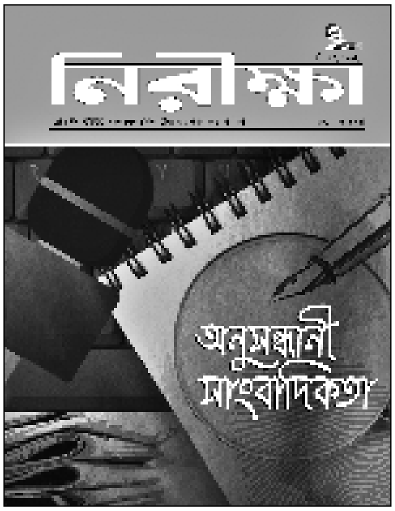

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো সাংবাদিকতার এমন এক স্তর, যেখানে প্রতিবেদকরা কোনো একটি বিষয়, যেমন–মারাত্মক অপরাধ, সামাজিক, প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি বা করপোরেট ভুলভ্রান্তিগুলো গভীরভাবে অনুসন্ধান করে থাকেন। খবরের ভেতরের খবর তলিয়ে দেখেন। একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক মাসের পর মাস, কখনো বা বছরের পর বছর একটি বিষয়ের ওপর গবেষণা করেন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করেন। অনুমাননির্ভর কোনো আলোচনা বা মতামত যুক্ত করার এখানে কোনো সুযোগ নেই। এ কথা সত্য, নানাবিধ কারণে ক্ষমতাধরদের সবচেয়ে অপছন্দের সাংবাদিকতা হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। কারণ, এটি সাক্ষ্যপ্রমাণসহ হাঁড়ির খবর বলে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবাদলিপি লিখেও সুবিধা করা যায় না। অনুসন্ধানী সংবাদ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় অনন্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মাধ্যমে সমাজের নানা অসংগতিসহ প্রভাবশালীর সর্বোত্তম ব্যবহারের বাধাগুলো দৃশ্যমান হয়। এতে জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

অনুসন্ধানী সংবাদ তৈরির প্রয়োজনে একজন সাংবাদিককে বিভিন্ন তথ্যসূত্রের কাছে যেতে হয় এবং বিভিন্নভাবে তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়। বাংলাদেশে কতটুকু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে? সাংবাদিকরা কি সংবাদের গভীরে প্রবেশ করেন? ইচ্ছা করলেই কি প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে অনিয়ম-দুর্নীতির রিপোর্ট করা সম্ভব? বাধা কখনো মালিক, কখনো সম্পাদকীয় নীতি, কখনো প্রভাবশালী হস্তক্ষেপ–এই প্রশ্ন রাখাই যায়। তবে কিছু যে হচ্ছে না, তা নয়। স্বাধীনতার পর দৈনিক ইত্তেফাকে 'ওপেন সিক্রেট' নামে প্রতিবেদন প্রকাশ হতো। ওই ধারাবাহিক প্রতিবেদন দিয়েই স্বাধীন দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সূচনা। সেই ধারাবাহিকতায় এদেশে বহু আলোচিত-সমালোচিত অনুসন্ধানী রিপোর্ট যেমন–তুই রাজাকার, যুদ্ধাপরাধীদের অতীত কর্ম, বাংলা ভাইসহ জঙ্গিবাদের উত্থান, রগ কাটা রাজনীতির উত্থান, আলোচিত এরশাদ শিকদার, রসু খাঁসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী-অপরাধীর উত্থানসহ শিক্ষা-স্বাস্থ্য খাতের দুর্নীতি, নানা মানবিক ঘটনাও উঠে এসেছে বিভিন্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। বলা যায়, অপরাধী বা দুর্নীতিবাজরা যতই প্রভাবশালী হোক, লোকচক্ষুর অন্তরালের ঘটনা সামনে এনে এজেন্ডা নির্ধারণের পাশাপাশি ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে পড়ানো হচ্ছে এবং বিভিন্ন সম্মেলনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে প্রতিবেদন-প্রতিযোগিতা উপস্থাপন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)। পিআইবি অনুধাবন করে ঢাকায় কিছু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলেও ঢাকার বাইরে এটি একেবারেই কম। তাই মফস্‌সলের সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিষয়ে প্রশিক্ষণকে গুরুত্ব দেয় পিআইবি। প্রশিক্ষণে দেখা যায়, বহু সাংবাদিকই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী, তা বোঝেন না। প্রশিক্ষণের পর লক্ষ করা গেছে, বেশ কয়েকজন সাংবাদিক ভালো কিছু প্রতিবেদন করেছেন। পুরোপুরি অনুসন্ধানী না হলেও মানের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগতি হয়েছে–আগামী দিনেও পিআইবির এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পিআইবির নিয়মিত প্রকাশনা 'নিরীক্ষা'র এই সংখ্যাটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে প্রকাশ করা হলো। সংখ্যাটিতে সিনিয়র সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও গবেষকদের মতামত ও অভিজ্ঞতা উঠে এসেছে। সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার শিক্ষার্থীসহ আগ্রহী পাঠকের প্রত্যাশা পূরণে সংখ্যাটি সহায়ক হবে বলে বিশ্বাস।

সম্পাদক
জাফর ওয়াজেদ

সহকারী সম্পাদক
দুলাল কৃষ্ণ আচার্য

সহ-সম্পাদক
আকিল উজ জামান খান

শিল্প নির্দেশনা
সোহেল আশরাফ খান

প্রকাশনা কর্মকর্তা
সরদার মো. রেজাউল করিম

প্রতিবেদক
নুরুন্নাহার নুরু

সংশোধক
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান
মো. লুৎফর রহমান

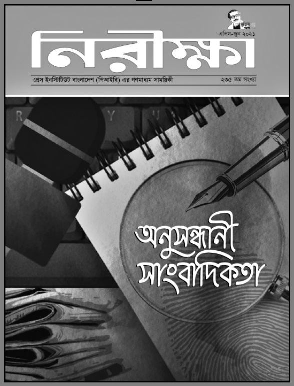

সূ|চি|প|ত্র

‘ওপেন সিক্রেট’-এর জন্ম-মৃত্যু ৩
আবেদ খান

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ ৫
শ্যামল দত্ত

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় শুদ্ধাচার অপরিহার্য ৮
জুলফিকার আলি মাণিক

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ও কিছু কথা ১১
শাহ নিসতার জাহান

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ইতিহাসের চোখে ১৪
তানভীর আহমদ

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস ও ধারণাগত ‘অপপ্রয়োগ’ অন্বেষণ ১৯
মাহামুদুল হক

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কলাকৌশল ও স্বরূপ ২৪
মামুন অর রশিদ

ডিজিটাল যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ২৯
শুভ কর্মকার

উপকূলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ৩৫
রফিকুল ইসলাম মন্টু

৪১ সময়ের সেরা পাঁচ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন
মিনহাজ উদ্দীন

৪৪ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রেক্ষিত কোভিড-১৯
মো. শরিফুল ইসলাম

৪৭ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার কাঠামো
আবুজার

৫৩ বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা সমস্যা ও সম্ভাবনা
মো. মামুন আ. কাইউম

৫৭ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা
মামুন রশীদ

৫৯ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ‘অনুসন্ধান’
স্মৃতি চক্রবর্তী

৬১ মৃত্যুঞ্জয়ী ম্যারি কলভিন
সারতাজ আলীম

৬৩ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও সামাজিক মাধ্যম
কামনা আক্তার ও ইশরাত জাহান নিঝুম

৬৯ গণমাধ্যম সংবাদ

৭৪ পিআইবি সংবাদ

ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com ■ ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd
পিআইবি’র সকল প্রকাশনা অনলাইনে পেতে হলে : www.rokomari.com
এবং বাতিঘর ঢাকা ও চট্টগ্রাম

মূল্য ৪০ টাকা

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত
ফোন : ৯৩৩৩৪০৩, ৯৩৩০০৮১-৮৪, ফ্যাক্স : ৮৮০-০২-৮৩১৭৪৫৮
ই-মেইল : pibnirikkha@gmail.com • ওয়েবসাইট : www.pib.gov.bd

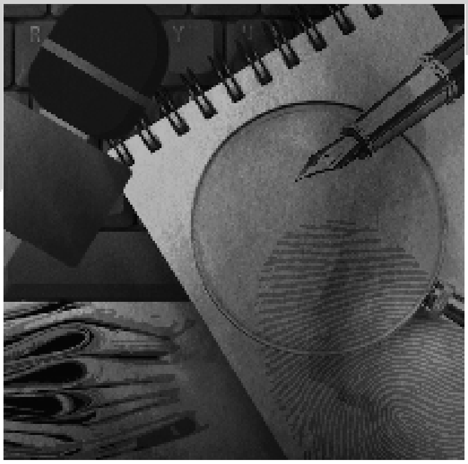

‘ওপেন সিক্রেট’-এর জন্ম-মৃত্যু

আবেদ খান

এ কাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেওয়ার পর থেকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন প্রথম ঢাকায় পা রাখলাম, সত্যি বলতে কী তখনই মনে পড়ল আমার প্রিয় কর্মস্থল দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার কথা। সিরাজ ভাইহীন দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার কথা তো কখনো চিন্তার মধ্যে রাখিনি। ইত্তেফাকের সাংবাদিক ইউনিয়নের ইউনিটপ্রধান বজলুর রহমান (বজলু ভাই) আমাদের বাড়িতে এসে বললেন, ‘তুমি অফিসে এসো, ইউনিটের দায়িত্ব পাওয়ার পর তুমি চলে গেলে আর সব দায়দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে আমাকে। কত ঝড়ঝাপটা গিয়েছে এই পত্রিকার ওপর দিয়ে, তা তো তুমি জান না–পাকিস্তানি সেনাদের কত উৎপাত, দালালদের কত অন্যায় আবদার যে সামলাতে হয়েছে, তা বোঝাতে পারব না। আমার বয়স হয়েছে আর সামলানো সম্ভব নয়। তোমার কাজ তুমি বুঝে নাও।’ ইত্তেফাকের চাকরিতে ফিরে গিয়েছিলাম দেশে ফেরার কিছুদিন পরেই; কিন্তু অনেক প্রিয়মুখ হারানো পাকিস্তানি বাহিনীর হামলায় কঙ্কালসার হয়ে যাওয়া ভবনটির ভেতরে পা রাখতে গেলে সব সময় বিমর্ষ হয়ে পড়তাম। ইত্তেফাক পত্রিকার চাহিদা তরতর করে নামছিল। ঢাকার পত্রিকাগুলো তখন নতুনভাবে তৈরি হয়েছে–দৈনিক পাকিস্তান নাম পালটে দৈনিক বাংলা হয়েছে। পূর্বদেশ প্রকাশিত হচ্ছে পূর্ণ কলেবরে। সংবাদপত্রের বাজারে আলোড়ন তুলছে মনি ভাইয়ের নেতৃত্বাধীন ও ব্যবস্থাপনায় ‘দৈনিক বাংলার বাণী’। ইত্তেফাকের প্রচারসংখ্যা নেমে আট হাজারে ঠেকেছে। আমি তখন ইত্তেফাকের ডেস্কে কাজ করি সহ-সম্পাদক হিসাবে। রাতের শিফটে ডিউটি। আসফউদ্‌দৌলা রেজা

ভাই আমাকে ডেকে বললেন, 'এখন থেকে তুই রিপোর্টার হিসাবে কাজ করবি। কাল থেকেই।'

নতুন দায়িত্ব পেয়ে খুশি হইনি। ডেস্কে থাকলে ছয় ঘণ্টা বাদে বাকি সময়টাই আমার নিজস্ব ছিল। রেজা ভাইকে বললাম, 'আপনার নির্দেশ মানছি; কিন্তু ছয় মাস পরে আমাকে আবার ডেস্কে ফেরত নিতে হবে।' 'আগে কাজ তো শুরু কর, তারপর দেখা যাবে। দেখি তুই কেমন পারিস।' বললাম, 'ইত্তেফাকের সার্কুলেশন বাড়লে কিন্তু আমাকে আবার ডেস্কে ফেরত নিতে হবে।' তিনি বললেন, 'আগে কাজ করে দেখা, তারপর যা করার করব।'

শুরু হলো আমার রিপোর্টিং-জীবন। বাহাত্তর সালের আগস্ট মাস থেকে শুরু করলাম দৈনিক ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় অনুসন্ধানী রিপোর্টিং সিরিজ 'ওপেন সিক্রেট'। নামকরণ সম্পূর্ণ আমার বটে; তবে যার নেপথ্য অনুপ্রেরণা আমার এই সিরিজটিকে পাঠকনন্দিত করেছে, তার পরিচয়টি আমি পরবর্তী কোনো লেখায় জানাব।

সেই সময়টি ছিল ভিন্ন পরিস্থিতির কাল। নতুন দেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। আমার নেপথ্য অনুপ্রেরণাদায়কের পরামর্শ অনুযায়ী 'ওপেন সিক্রেট'-এর মূলমন্ত্র হলো দুর্নীতি এবং নানাবিধ অন্যায়ের চিত্র তুলে ধরা। বঙ্গবন্ধুর সরকারকে অস্থিতিশীল এবং বিব্রত করার জন্য চলছিল নিরন্তর ষড়যন্ত্র। বঙ্গবন্ধু কালোবাজারি এবং পাচারকারীদের বিরুদ্ধে বারবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলেন। আমি সেই বিষয় হিসাবে নির্বাচন করলাম চোরাচালানকে। সীমান্তের চোরাচালান দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিচ্ছিল। কাজেই আমি সোর্স খোঁজার জন্য অতি সংগোপনে দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় নানান মাধ্যমে চেষ্টা শুরু করলাম। স্বাধীনতা-পরবর্তী দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা, এই পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছিল অত্যন্ত নিপুণ কৌশলে। আর এই কৌশলের পেছনে তিন আন্তর্জাতিক শক্তির ভূমিকা ক্রমাগত স্পষ্ট হয়ে উঠছিল বঙ্গবন্ধু সরকারের কাছে। সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যে বিলাসিতা তেমন দৃশ্যমান না হলেও কারও কারও মধ্যে কিঞ্চিৎ অলসতা পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আর এরই মধ্যে ভেতরে ভেতরে তৈরি হচ্ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময় মুজিবনগর সরকারের বিরোধী দুষ্টচক্র। তাদের প্রচ্ছন্ন ইশারায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নৈরাজ্য সৃষ্টির উসকানি দেওয়া হচ্ছিল। পানি-বিদ্যুৎ-বাণিজ্য-তথ্যের মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয়ের কর্তৃত্ব ওই কুচক্রীদের মুঠোর মধ্যে ক্রমাগত চলে যাচ্ছিল। বঙ্গবন্ধুও তা বুঝতে পারছিলেন; কিন্তু সেটাকে কীভাবে সামলানো উচিত, তা বুঝে পাচ্ছিলেন না। এর মধ্যেই অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বিভ্রান্ত–তারুণ্যের এক আত্মঘাতী বিভাজন। অন্যদিকে অতি উগ্র বাম আর রহস্যাবৃত সিরাজ শিকদারের উত্থান এবং লক্ষ্যহীন ধ্বংসাত্মক অপকীর্তি ও সন্ত্রাস। এই পরিস্থিতি মাথায় রেখে আমি 'ওপেন সিক্রেট' কলামের বিষয় নির্বাচন করতাম। পাঠককে আকৃষ্ট করার জন্য লেখার ভাষা ও শব্দচয়ন করতাম। আমার সৌভাগ্য হচ্ছে এই যে, দুর্নীতি, অনেক ধরনের অন্যায়, বেআইনি মুদ্রার লেনদেন, ব্যাপক চোরাচালানের রুট খুঁজে সেই সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করা ইত্যাদি লেখায় সরকারবিরোধীরা চমৎকৃত হতেন আর সরকারের ভেতরে যারা গোপনে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী, তারা সতর্ক হতেন।

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং করার জন্য আমাকে বিভিন্ন জায়গায় এবং অধিকাংশ সময় পরিচয় গোপন করে চলাফেরা করতে হয়েছে। চোরাচালানিদের মধ্যে কৌশলে ঢুকে সিগারেটের প্যাকেটের পেছনে নোট করতে হয়েছে। এমনকি দুটি দেশের সীমান্তরক্ষীদের গোপন আসরে ঢুকে লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছে। কোথাও কোথাও আমাকে হত্যার জন্য বিশাল এক অঙ্কও ধার্য করা হয়েছে। এমনকি আমার সম্পর্কে এমনসব আজগুবি উদ্ভট তথ্য প্রচারিত হয়েছে, যার সঙ্গে বাস্তবতার অণুমাত্র মিল নেই। আমার কোনো কোনো সাংবাদিক বন্ধুর কাছ থেকে শুনেছি, আমি যদি কোনো তথ্য সংগ্রহের জন্য কখনো সচিবালয়ে যেতাম, তার আগেই রটিত হতো যে আমি সচিবালয়ে যাচ্ছি। 'ওপেন সিক্রেট' কলামের জন্য অবশ্য আমার তথ্য সংগ্রহের সংকট হয়নি। বিশালসংখ্যক সূত্রভান্ডার আমি গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। মন্ত্রী, সচিব থেকে শুরু করে কেরানি, পিওন, দারোয়ান, দোকানদার পর্যন্ত বিস্তৃত করতে পেরেছিলাম আমার নেটওয়ার্ক। তখন তো এখনকার মতো মোবাইল ক্যামেরার চল ছিল না, এত জনবল কিংবা অর্থবলও ছিল না। সবই ছিল শ্রমসাধ্য। যানবাহনের অভাব তো ছিলই, অভাব ছিল সংগতিরও। তারপরও পেশার নেশা আমাকে রহস্যোপন্যাসের স্বাদ এনে দিয়েছিল।

আমার বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, আমার অনুসন্ধানী ধারাবাহিকটির প্রতিটি পর্বের পরেই সরকারের শীর্ষবিন্দু থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রীপর্যায়ে, সচিব পর্যায়ে, সেনা কর্মকর্তা পর্যায়ে, আমলা পর্যায়ে রদবদল হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করি। আমি তখন ছেলের কাছে গিয়েছি। কানাডায় সে ইউনিভার্সিটি অব টরেন্টোতে অর্থনীতিতে পিএইচডি করছে। সেখানে আমার সঙ্গে পরিচয় হলো মোল্লা বাহাউদ্দিন নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তিনি আওয়ামী লীগ করতেন বলে শুনেছি। বঙ্গবন্ধুর আমলে তিনি বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মচারী ইউনিয়ন করতেন। ইউনিয়নের সঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিএমডির বিরোধ ঘটে এবং এ কারণে বিপুলসংখ্যক ইউনিয়ন নেতার কর্মচ্যুতি ঘটে। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংকে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। ডিএমডি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান এবং স্বয়ং বঙ্গবন্ধুর বন্ধুস্থানীয়। এই পরিস্থিতিতে আমাকে লিখতে হলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন–বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে। সংবাদটি প্রকাশিত হওয়ার পর অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো–পুনর্বহাল হলেন ইউনিয়নের নেতারা। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ডিএমডি পদত্যাগ করলেন, তদন্ত কমিটি হলো এবং অতি দ্রুত ঘটনার যথার্থতা প্রমাণিত হলো। মোল্লা বাহাউদ্দিনের মতে, পরবর্তী সময়ে ডিএমডি আত্মঘাতী হয়েছিল দোষী প্রমাণিত হওয়ায়।

মোল্লা বাহাউদ্দিন প্রয়াত হয়েছেন সম্ভবত কয়েক বছর আগে। তবে তিনি একটি অথবা অধিক বই লিখেছেন তার প্রবাসজীবন নিয়ে। কী কারণে তাকে পঁচাত্তরের পরেই দেশত্যাগ করতে হলো, সেটা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি এই ঘটনার কথা লিখেছেন।

আমার 'ওপেন সিক্রেট' কলামটি পঁচাত্তরে বন্ধ হয়ে যায়। এটা বন্ধের পেছনে কারণ ছিল আমি সর্বশেষ যে লেখাটি লিখি, সেটার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আমি ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ফারুক-রশীদ-ডালিম-নূর-শাহরিয়ারদের গোপন বৈঠকের ষড়যন্ত্র বিষয়ে ওই লেখাটি লিখেছিলাম। অনেক কৌশলে সেটা ছাপানোর চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু ইত্তেফাকের চিফ ফোরম্যান বজলুর রহমানের কারণে এই চেষ্টা ফাঁস হয়ে যায়। আর লেখাটি যেন কোনোভাবে প্রকাশিত না হয়, এর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন তৎকালীন তথ্য প্রতিমন্ত্রী তাহের উদ্দিন ঠাকুর এবং তার গুরু খন্দকার মোশতাক আহমদ। এর কিছুদিনের মধ্যেই দেশ নিমজ্জিত হলো ঘন কালো অন্ধকারে। একটি মানবিক পরিবারের অবসান ঘটানো হলো, দানবের পদচারণায় লন্ডভন্ড হলো বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলা।

আমার 'ওপেন সিক্রেট' কলামের মৃত্যু ঘটল।

লেখক: সম্পাদক, দৈনিক জাগরণ

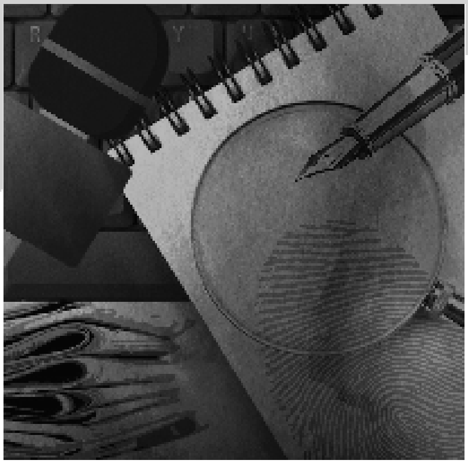

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ

শ্যামল দত্ত

কেউ কেউ বলে থাকেন সামাজিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার স্বার্থে গোপন তথ্য উন্মোচন করে মৌলিক গবেষণার মাধ্যমে তথ্যগুলো জনগণের সামনে উপস্থাপন করার নামই হচ্ছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। ইউনেস্কোর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের স্বার্থে মানুষের সামনে তুলে ধরা। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপনে নানা সোর্স ব্যবহার করতে হয়, ঘাঁটতে হয় নানা নথিপত্র।

বাংলাদেশের মতো অনেক উদীয়মান গণতান্ত্রিক দেশে গোপন নথিপত্র ও ফাঁস হওয়া তথ্যের ভিত্তিতে নির্মিত সংবাদকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলে উল্লেখ করা হয়। অন্যদিকে গভীর অনুসন্ধান না থাকার পরও অপরাধ বা দুর্নীতিবিষয়ক খবর ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্টকেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় এগুলো পড়ে না। মনে রাখতে হবে, অনুসন্ধান বিষয়টি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সতর্কতার সঙ্গে বিষয়ের গভীরে যেতে হয়, সত্যানুসন্ধান করতে হয় এবং নিখুঁতভাবে সেটা যাচাই করতে হয়। এভাবেই প্রকৃত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি হয়ে থাকে।

এ বিষয়ে প্রথমে কয়েকটি বিখ্যাত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কথা উল্লেখ করতে চাই।

১৮৭২ সালের মাঝামাঝিতে জুলুস চেম্বার্স নামের নিউইয়র্ক ট্রিবিউনের এক সাংবাদিক পাগলাগারদের ভেতরে প্রকৃতপক্ষে কী ঘটছে, কীভাবে থাকছে

সেখানকার বাসিন্দারা, সেটি জানার জন্য নিজেই মানসিক রোগী সেজে ভর্তি হয়ে গেলেন ব্লুমিংদাল এসাইলাম নামে শহরের এক পাগলাগারদে। অদ্ভুত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হলেন তিনি সেখানে। অন্তত ১২ জন লোককে আটকে রাখা হয়েছে সেখানে, যারা অসুস্থ বা পাগল নন। কাগজে-কলমে তাদের পাগল প্রতিপন্ন করা হয়েছে। খবর ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু হয়ে গেল এবং প্রমাণিত হলো অভিযোগের সত্যতা। এরপর তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে মুক্তি পেল সেই ১২ জন, সুস্থ হওয়া সত্ত্বেও যাদের পাগল বলে উল্লেখ করা হয়েছিল। ওলটপালট শুরু হলো এই রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর। কর্তৃপক্ষ আর পাগলাগারদের প্রশাসনের চাকরি গেল অনেক অভিযুক্তের। নতুন লোক নিয়োগ করা হলো। এমনকি দেশের লুনাসি অ্যাক্ট বা পাগলামি আইনে পরিবর্তন ঘটাতে বাধ্য হলো সরকার। ১৮৭৬ সালে তিনি একটা বইও লিখেছেন এ বিষয়ে। বইটির নাম 'অ্যা ম্যাড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইটস ইনহাবিটেন্টস'।

একই ঘটনা ঘটান ১৮৮৭ সালে নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের এলিজাবেথ কোকেন সিমেন নামের আরেক সাংবাদিক। নেলি ব্লাই ছদ্মনামে তিনি ঢুকে পড়েন মেয়েদের পাগলাগারদে। সেখানে ১০ দিন বসবাসের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করা প্রতিবেদন সাড়া ফেলে দেয় যুক্তরাষ্ট্রে। ঘটনা খতিয়ে দেখতে গ্র্যান্ড জুরি বোর্ড গঠন করা হয়। চিকিৎসালয়ের বাসিন্দাদের জন্য উন্নত খাবার ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানে বাধ্য হয় সরকার। এসব প্রতিবেদন নিয়ে একটা বই আছে 'টেন ডেইস ইন অ্যা ম্যাড হাউস' নামে।

এ তো গেল দেড় শ বছর আগের কথা। পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধানী রিপোর্টের অন্যতম ১৯৭৪ সালের ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি। বিশ্বের সাড়া জাগানো এক অনুসন্ধানী রিপোর্ট, ওয়াশিংটন পোস্টে ছাপা হওয়ার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল। ১৯৯৮ সালে সানডে টাইমসের সাংবাদিক ব্রায়ান ডিয়ারের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে জানা গেল, অটিজম আক্রান্ত শিশুদের ওপর প্রয়োগের জন্য এমএমআর ভ্যাকসিন নিয়ে বিশ্বখ্যাত চিকিৎসা সাময়িকী ল্যানসেটে যে প্রতিবেদন ছেপেছে, তার পুরোটাই জাল। পুরো চিকিৎসাব্যবস্থার জন্য একটি অত্যন্ত আতঙ্কজনক সংবাদ ছিল এটি। এই সমাজে নানা রকমের ভেদাভেদ রয়েছে, বিশ্বাসের ভিন্নতাও আছে। কিন্তু ল্যানসেটের প্রতিবেদন নিয়ে সংশয় প্রকাশ বর্তমান সময়ে প্রায় বিরল ঘটনা। অথচ সেটাই প্রমাণ হলো শেষ পর্যন্ত। শিশুদের ওষুধ নিয়ে নানা প্রতিবেদনের ওপর অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশ করল পত্রিকাটি।

দ্য টেলিগ্রাফ ২০০৯ সালে অনুসন্ধান চালিয়ে বের করল, ব্রিটেনের এমপিরা অনেকদিন ধরেই ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে অনেক বেশি খরচাপাতি দেখিয়ে বিল তুলে নিচ্ছেন। সরকারি কোষাগারে রাখা জনগণের টাকা এভাবে নয়ছয় করছেন জনগণের প্রতিনিধিরা। জনগণের টাকা লুটপাটের খবরটা চেপে রাখার জন্য অনেক চেষ্টা চালালেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। কিন্তু খরচাপাতির কাগজপত্র পর্যন্ত সংগ্রহ করেছিলেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা। সুবিধা হলো না সেদিকে। খবরটা টেলিগ্রাফে ছাপা হওয়ার পর জনপ্রতিনিধিদের এরকম ভূমিকা দেখে ক্ষুব্ধ হলো দেশের মানুষ। জনপ্রতিনিধিদের এই লুটপাটের ইস্যুতে কয়েক সপ্তাহজুড়ে টগবগ করে ফুটছিল ব্রিটেন। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাজগতের অসাধারণ কয়েকটি নমুনা উপরের ঘটনাগুলো।

প্রচলিত সাংবাদিকতা বনাম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

সংবাদের উৎস বিবেচনা করে যে কোনো ক্রিয়া বা ঘটনা সংবাদ হিসাবে আঙ্গিক ভেবে পাঠকের সামনে পরিবেশনের বিষয়বস্তু হতে পারে। কে করেছে, কী হয়েছে, কখন করেছে, কোথায় করেছে, কেন করেছে এবং কীভাবে করেছে–একটি সংবাদ তৈরি হয় এই প্রশ্নগুলোর মীমাংসা থেকে। একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরি হয় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর ও গভীর অনুসন্ধান নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে। কখনো এমন হয়–কে করেছে জানা গেল, কী করেছে জানা গেল, কখন করেছে জানা গেল, কোথায় করেছে হয়তো সেটাও জানা গেল; কিন্তু কেন তা করেছে কিংবা কীভাবে তা করেছে, সেটি জানা যাচ্ছে না। আবার এমন হয়–অন্য সব প্রশ্নের উত্তর জানা গেলেও কে ঘটিয়েছে, সেটি জানা যাচ্ছে না। সাধারণ একজন সাংবাদিক হয়তো বলবেন, আমরা সব প্রশ্নের উত্তর জানতে পেরেছি, আবার অনেক প্রশ্নের উত্তর আমরা জানতে পারিনি। এ বিষয়ে হয়তো দেখা যাবে তদন্ত কমিশন বা অন্য কোনো কমিশন বিস্তারিত খতিয়ে দেখছে। এটি একটি সাধারণ রিপোর্টের উদাহরণ হতে পারে। অনুসন্ধানী সাংবাদিক কিন্তু তা করবেন না। তার অনুসন্ধিৎসু মন ক্রমাগত প্রশ্ন করে যাবে। তিনি সত্য উদ্‌ঘাটন না করা অবধি থামবেন না। তিনি কার্পেটের তলায় খুঁজবেন, প্রতিটি পাথর উলটে দেখবেন। প্রতিটি আলামতের ওপর অনুসন্ধানী নজর ফেলবেন অতসী কাচ দিয়ে, যাতে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ জিনিসও দেখতে পাবেন এবং তিনি সত্য তথ্য উদ্‌ঘাটন করবেন। যে তথ্যবুভুক্ষু জনগণের তিনি প্রতিনিধি, তাকে সঠিক তথ্য জোগান দেবেন। কারণ ঠিক এ কাজটি করার জন্য তিনি সমাজে একজন সংবাদকর্মী হিসাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত এবং তার কাজই হচ্ছে একজন অনুসন্ধানী সংবাদকর্মীর।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে উদ্‌ঘাটিত হয় রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, করপোরেট অনিয়ম, অপরাধ সিন্ডিকেটের খবরাখবর, অন্ধকারজগতের হাজার হাজার কোটি টাকার কারবার। জড়িত থাকে এসবের সঙ্গে সমাজ ও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ লোকজন। এসব জায়গায় কঠিন সত্য নিয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। তিনি তার কাজের মধ্য দিয়ে নেপথ্যের গল্প বিস্তারিতভাবে উদ্‌ঘাটন করবেন। পুরো সত্যি খোলাসা করবেন মানুষের সামনে। আংশিক সত্য নয়, পুরো সত্য। এ কাজে তার কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছরও লেগে যেতে পারে। অনেকে একে বলেন ওয়াচডগ জার্নালিজম। গণতান্ত্রিক সমাজে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ মূলত সদাসতর্ক প্রহরীর মতো। সমাজে-রাষ্ট্রে যখন অন্যায়-অনিয়ম ঘটতে থাকে, তখন নৈশপ্রহরীর মতো বাঁশি বাজিয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলা একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। এজন্যই অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের বলা হয় হুইসেল ব্লোয়ার। গোয়েন্দা সাংবাদিক বা অনুসন্ধানী সাংবাদিক সমাজ শাসক ও ক্ষমতাবান মহলকে জবাবদিহিতার মুখোমুখি দাঁড় করান। প্রচলিত তথ্য নয়, সত্য-মিথ্যার মিশেল তথ্য পরিবেশন নয়, সত্যিকারের অনুসন্ধানী মন নিয়ে তথ্য পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রধান উদ্দেশ্য।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাই গণমাধ্যমের টিকে থাকার একমাত্র পথ

একুশ শতকে মিডিয়া ওয়াচডগের সাফল্যের ইতিহাস কিংবদন্তি পর্যায়ের। এর অন্যতম উদাহরণ উইকিলিকস, জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ এবং অন্যরা। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এই মুহূর্তে একমাত্র সাংবাদিকতা, যা সংবাদ ভুবনে প্রকৃত অর্থেই অর্থবহ হয়ে ওঠার সামর্থ্য রাখে। বৈশ্বিক তথ্য এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আবির্ভাবে হাতে হাতে এখন মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট, গুগল, ফেসবুক, আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম সিএনএন, বিবিসি, আলজাজিরা পৌঁছে যাওয়ার কারণে সাধারণ তথ্যভিত্তিক সংবাদ পরিবেশনের গুরুত্ব বস্তুত ফুরিয়ে গেছে। বস্তুত

সাধারণের অসাধারণ নেপথ্যের সংবাদই একমাত্র পূর্ণ মনোযোগ কেড়ে নেওয়ার সামর্থ্য রাখে সংবাদভক্তকুলের।

বাংলাদেশে যেসব সংবাদ নিয়মিত মানুষের নজর আকর্ষণ করছে কিংবা নজর ধরে রাখতে সমর্থ হচ্ছে, তার প্রতিটির চরিত্রও কমবেশি অনুসন্ধানী ধরনের। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এটি শুধু রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত এবং পরিবেশিত হয় পাঠকের সামনে। সে বিবেচনায় একে প্রকৃত অর্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলা যাবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। গভীর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যেসব শর্ত অনুসরণ করতে হয়, এসব ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করা হয় না। ফলে প্রকৃত অর্থেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞায় এগুলোকে ফেলতে দ্বিধান্বিত হন অনেকে।

সমাজে প্রতিদিন ভোক্তাস্বার্থ ক্ষুণ্ন হচ্ছে কীভাবে? পরিবেশ ধ্বংস করা হচ্ছে কীভাবে? সীমান্তে হাজার হাজার কোটি টাকার চোরাচালানের নেপথ্য শক্তি কারা? খনিজসম্পদ লুটপাটের পেছনে রাষ্ট্রের কোন কোন অসাধুচক্র সক্রিয়? ওষুধশিল্পের বৈশ্বিক কর্তাব্যক্তিরা কীভাবে তৃতীয় বিশ্বের শিশুদের জিম্মি করে রাখছে? মহল্লার মুখচোরা তরুণ ছেলেটিকে কীভাবে ভুলিয়ে-ভালিয়ে জঙ্গি বানিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাঠিয়ে দিচ্ছে মৌলবাদী শক্তিগুলো–এসব নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা যেতে পারে। একজন রাজনৈতিক নেতা মুখে যা বলছেন, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল-অমিল কতটুকু–এসব কিছু নিয়েও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা গোয়েন্দা সাংবাদিকতা করা যেতে পারে।

তবে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হচ্ছে করপোরেট পুঁজি, মালিকানার চরিত্র এবং সরকারি বিজ্ঞাপননির্ভরতা। এ ধরনের একটি পরিস্থিতিতে স্বাধীন সাংবাদিকতা প্রায় অসম্ভব। বিজ্ঞাপনের স্বার্থের কথা চিন্তা করে যদি করপোরেট পুঁজির বিরুদ্ধে অনুসন্ধানী রিপোর্ট করা না যায়, একটি গণমাধ্যমকে যদি অর্থের জন্য মালিকের অর্থ অথবা বিজ্ঞাপনের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়, তাহলে করপোরেট স্বার্থ বা মালিকের স্বার্থ দেখতে গিয়ে স্বাধীনভাবে সাংবাদিকতা বা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হবে। অন্যদিকে সমাজে যদি জবাবদিহিতার সংস্কৃতি চালু না হয়, আইনের শাসন যদি নিশ্চিত না হয়, তাহলে সে ধরনের সমাজে স্বাধীন সাংবাদিকতা আরও কঠিন। বিশেষ করে গণমাধ্যমকর্মীদের মধ্যে একটি হতাশা কাজ করবে, যদি তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তা থাকে। একটি জবাবদিহিহীন সমাজে হরহামেশাই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। রাষ্ট্রের অন্যান্য অঙ্গ যদি সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ গণমাধ্যম নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে গণমাধ্যম তার স্বকীয়তা নিয়ে দায়িত্ব পালন করার সুযোগই পায় না। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জায়গাটি তখন অনেক বেশি গৌণ হয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে গণমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সামনে এ বিষয়ে বাস্তব ধারণা অর্জন একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। অনেক আগ্রহী ও সাহসী সাংবাদিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিষয়ে জানতে চাইলেও কীভাবে পেশাদার প্রক্রিয়ায় সেটি বাস্তবায়নের জন্য অগ্রসর হতে হয়, সে বিষয়ে প্রশিক্ষণেরও ব্যাপক ঘাটতি রয়েছে।

সাংবাদিকতাকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই এই মুহূর্তে গণমাধ্যমে কর্মরতদের জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও তার বিস্তৃত ক্ষেত্র এবং সমাজে তার অভিঘাত তৈরির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হাতে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। কেননা শুদ্ধ সাংবাদিকতা না থাকলে সমাজে জবাবদিহিতা বলে কিছু থাকে না। আর একটি রাষ্ট্র এবং সমাজে যদি জবাবদিহিতার সংস্কৃতি তৈরি না হয়, গণতন্ত্র একটি অর্থহীন বুদ্‌বুদ ছাড়া অন্যকিছু তো নয়।

লেখক: সম্পাদক, ভোরের কাগজ

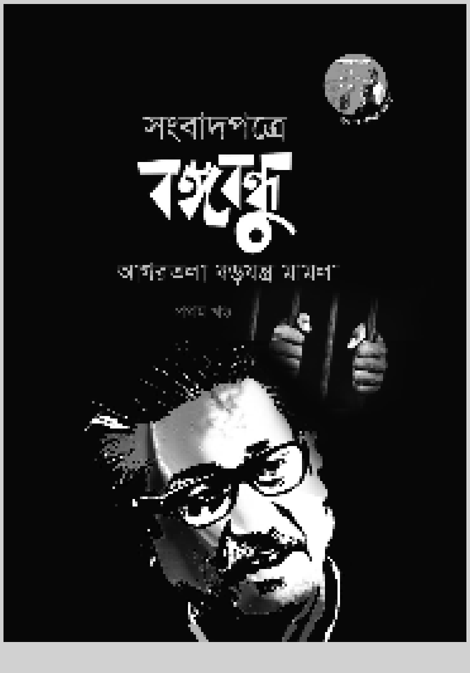

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

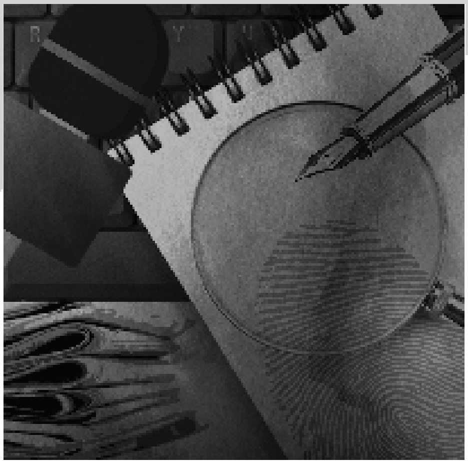

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় শুদ্ধাচার অপরিহার্য

জুলফিকার আলি মাণিক

সাংবাদিকতার জগতে আমরা যারা প্রতিবেদক, তারা কি 'তথ্য সংগ্রহ' করি, না কি 'তথ্য চুরি' করি? হুট করে প্রশ্নটা খটোমটো লাগতে পারে যে কোনো পাঠকের কাছে। তিন দশক পেশাদার সাংবাদিকতা চর্চার পর এমন প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে-লিখতে হবে, ঘুণাক্ষরেও কখনো ভাবিনি। দেশে সাংবাদিকতার চর্চা নিয়ে সম্প্রতি আকস্মিকভাবে উদ্ভূত অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবতা এমন চিন্তায় মগ্ন হতে বাধ্য করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিব্রতকর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি আমরা, সেই ঘটনার ভেতরে কী সত্য, কী মিথ্যা? কে সত্য, কে মিথ্যা? এসব প্রশ্নের নিশ্চিত শতভাগ উত্তর পাওয়া কিংবা যথার্থ উপসংহার টানা আদৌ কখনো সম্ভব হবে কি-না, তা বলা দুরূহ। এই লেখার বিষয়বস্তু অবশ্য সেসব খোঁজা নয়। বরং ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশের বহু সম্মানিত ও জনপ্রিয় সাংবাদিকের প্রতিক্রিয়া দুর্ভাবনার কারণ হয়েছে।

কার মনে কী আছে, তা চট করে জানার বিস্তৃত সহজ জায়গা এখন ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। আমাদের দেশে সাংবাদিকতার চর্চা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা, সমালোচনা, বিতর্ক করি না। বরং এসব এড়িয়ে চলাই আমাদের পছন্দ। সাধারণভাবে দেশে সাংবাদিকতার চর্চা নিয়ে সাংবাদিকরা উদার মনে কোনো সমালোচনামূলক প্রশ্নকে আনন্দের সঙ্গে স্বাগত জানান, তা বলার মতো এমন দৃষ্টান্তও তৈরি হয়নি। ফলে আমাদের ভুলত্রুটিগুলো ছোটো বা বড়ো–কোনো পরিসরেই

আলোচনায় উঠে আসে না, পড়ে থাকে আড়ালে। ফলে সাংবাদিকতায় ভুলগুলো সংশোধন হয় না, বরং প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে এবং সাংবাদিকতার চর্চাকে পরিশুদ্ধ করার পথ প্রশস্ত না হয়ে কেবলই সংকুচিত হয়। সাংবাদিকতা সবার জবাবদিহিতা চাইলেও– নিজেদের চর্চা বা কাজের ব্যাপারে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা ও গঠনমূলক সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকার উদার মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। এমনকি আত্মসমালোচনার চর্চা প্রায় অনুপস্থিত দেশের সাংবাদিকতার জগতে, যদিও আত্মসমালোচনা সাংবাদিকতার চর্চাকে উন্নত করে।

সরকারি দপ্তরে একজন সাংবাদিকের সাম্প্রতিক এক ঘটনা দেশজুড়ে সাংবাদিকতার চর্চা নিয়ে হইচই ফেলে দিয়েছে। সাংবাদিকরা তো বটেই, সাংবাদিকতার শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, বিভিন্ন পেশাজীবী, সাধারণ পাঠক-দর্শক-শ্রোতারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, বিতর্কে জড়িয়েছেন। ব্যক্তিগত সেসব প্রতিক্রিয়া সহজেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে জানা যায়। সেখানে অনেক সুপরিচিত, সম্মানিত, জনপ্রিয় সাংবাদিকের এমন কিছু প্রতিক্রিয়া ও বক্তব্য দৃষ্টিগোচর হয়, যেগুলোর সারমর্ম করলে দাঁড়ায়–দেশে সাংবাদিকতা, বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করতে হলে সাংবাদিকরা তথ্যের জন্য 'নথি চুরি করার' অধিকার রাখে। কোনো কোনো স্বনামখ্যাত সাংবাদিক, এমনকি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিককেও দম্ভ ও গর্ব করে লিখতে বা বলতে দেখা গেছে– তিনি নিজেও প্রতিবেদন তৈরির স্বার্থে নথি 'চুরি' করেছেন। কিছু সাংবাদিক তথ্যের জন্য নথি চুরির পক্ষে রীতিমতো প্রচার চালান, কেউ কেউ সাংবাদিকতার স্বার্থে আরও নথি 'চুরি' করবেন বলে স্বগৌরবে ঘোষণা দেন এবং এজন্য নিজেকে 'চোর' হিসাবে নিজেই আখ্যায়িত করেন বেশ গৌরবের সঙ্গে। এসব প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতেই লেখার শুরুতে উল্লিখিত প্রশ্ন মনে বাসা বেঁধেছে। হঠাৎই যেন আত্মপরিচয়ের সংকট অনুভব করছি–আমি কি সাংবাদিকতার জন্য তথ্য সংগ্রহ করি, নাকি তথ্য 'চুরি' করি? আমরা কি তথ্যের জন্য নথি বা নথির কাগজের কপি সংগ্রহ করি, নাকি নথি 'চুরি' করি? আমার পরিচয় কি সাংবাদিক, নাকি 'চোর'? এসব বিষয়ে দেশের মানুষ, তরুণ প্রজন্মের সাংবাদিক এবং যারা সাংবাদিকতায় আসবেন, তাদেরকে কি আমরা সাংবাদিকতার কাজ ও চর্চার কৌশল সম্পর্কে সঠিক বার্তা দিচ্ছি? নাকি ভুল, বিভ্রান্তিকর কিছু দিচ্ছি?

আমাদের রাষ্ট্র বা দেশ পরিচালিত হয় সংবিধান এবং এর আলোকে প্রণীত বিভিন্ন আইনকানুন দিয়ে। দেশের নাগরিক হিসাবে আমরা সংবিধান ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আর সাংবাদিক হিসাবে আমাদের পেশাগত কাজের জন্য আমরা অনুসরণ করি সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা। আমি বলতে ভালোবাসি, এথিক্স (ethics), অর্থাৎ নীতি-নৈতিকতা হলো সাংবাদিকের, সাংবাদিকতার সংবিধান; যা পালন করে সারা দুনিয়ায় সাংবাদিকতার চর্চা হয়। সাংবাদিকতা কোনো একক রাষ্ট্রের বা জাতির নয়, বৈশ্বিক পেশা। গোটা বিশ্বেই নীতি-নৈতিকতা মেনে সাংবাদিকতা করা বাঞ্ছনীয়। আমাদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম কিছু নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশে পেশাদার সাংবাদিকতার প্রতিষ্ঠানগুলোয় সাংবাদিকদেরকে নীতি-নৈতিকতার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কোনো চর্চা আমি তিন দশকের অভিজ্ঞতায় দেখিনি। ফলে কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে হলেও, প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে সাংবাদিকরা শিক্ষিত ও সচেতন নন। ফলে নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করে সাংবাদিকতার চর্চা হচ্ছে কি না, সেদিকে প্রতিষ্ঠানগুলোর নজরদারি তো দূরের কথা, তেমন কোনো মাথাব্যথা দেখা যায় না।

সাংবাদিকতা সৃজনশীল পেশা। বিদ্যালয়ে সাংবাদিকতার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ না থাকলেও যে কেউ এই পেশায় আসতে পারেন, যদি তার ভেতর সাংবাদিকতা করার গুণাবলি, যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকে। বিশ্বে উন্নত পেশাদার সাংবাদিকতা চর্চার জন্য সুপরিচিত প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজের মান শানিত করতে রীতিমতো সাধনার পর্যায়ে নিয়ে গেছে পেশাকে। তাই নিজেরাই নিজেদের কাজের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে, ভালোমন্দ খুঁজে, আত্মসমালোচনা ও বিতর্ক করে গবেষণায় মগ্ন হয় এবং গবেষণালব্ধ নতুন জ্ঞান ব্যবহার করে সাংবাদিকতার চর্চাকে আরও শানিত ও পরিশুদ্ধ করে। দুঃখের হলেও সত্য, এসব ভাবনা, গবেষণা থেকে আমাদের সাংবাদিকরা এবং সাংবাদিকতার বিদ্যালয়গুলো বহুদূরে। বিশ্বে উন্নত সাংবাদিকতা চর্চার প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সাংবাদিকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেয়, যেন প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত মান অনুসারে তারা সাংবাদিকতা উপহার দিতে পারেন। সেসব প্রশিক্ষণে ethical journalism বা নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ সাংবাদিকতার চর্চা সম্পর্কে জ্ঞানদান ও সচেতন করা হয়। সেই চর্চা থেকে কেউ কখনো বিচ্যুত হলে, কারও স্খলন ঘটলে, তাকে প্রাপ্য বুঝিয়ে দেওয়া হয়। তখন অনেকে শুধু কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, সাংবাদিকতা থেকেও ছিটকে পড়েন। আমাদের দেশে কোনো প্রতিষ্ঠান নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ সাংবাদিকতা চর্চার শক্তিশালী ধারা প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি, তেমন চেষ্টাও তিন দশকের সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় দেখিনি। বরং অভ্যন্তরীণ অনৈতিক চর্চাকে গোপন করে অব্যাহত রাখতে উৎসাহিত করেছে। ফলে সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে যার যখন যা যথার্থ মনে হয়, তিনি তা-ই করেন। এমনকি সেটা ভুল বা অন্যায় হলেও সেগুলোকেই সঠিক বলে প্রতিষ্ঠিত করতে তৎপর থাকেন। অন্যদিকে সাংবাদিকতার যথার্থ নীতি-নৈতিকতাপূর্ণ চর্চার নির্দেশনাগুলোকে নানা ছুতোয় বা অজুহাতে অস্বীকার করার মানসিকতা প্রদর্শন করতে থাকেন।

সাংবাদিকতায় প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহ করতে সর্বত্র ছুটে বেড়ান। তাদের সঙ্গে সব ধরনের মানুষের পেশাগত যোগাযোগ, সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্ক তৈরির একমাত্র উদ্দেশ্য–প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করা। অনেকে মনে করেন, যে কোনো উপায়ে তথ্য আনলেই হলো। এমন ধারণা সঠিক নয়। সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। প্রতিবেদক তথ্য সংগ্রহের জন্য কী করতে পারবেন আর কী পারবেন না, তা নীতি-নৈতিকতা দ্বারা নির্দেশিত। সেসব নির্দেশনা সাংবাদিক লঙ্ঘন করলে সাংবাদিকতার চর্চা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। এতে সাংবাদিকতার স্তম্ভ 'বিশ্বাস' ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তিন দশকের সাংবাদিকতার চর্চা থেকে লব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে বলতে পারি, একজন প্রতিবেদক টাকার বিনিময়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন না, কাউকে ভয়ভীতি দেখিয়ে বা জোর খাটিয়েও তথ্য আদায় করতে পারেন না এবং তথ্য বা তথ্যের জন্য কোথাও কোনো নথি বা নথির কাগজ সশরীরে 'চুরি' করতে পারেন না। এসব বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করলে নীতি-নৈতিকতাবহির্ভূত আচরণ বলে গণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। সাংবাদিকতার কাজ করার সময় সব ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখা অপরিহার্য নৈতিক চর্চা। পেশাগত কাজে কোনো পরিস্থিতিতেই প্রতিবেদক মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারবেন না। অথচ সম্প্রতি দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার জন্য সাংবাদিকের তথ্য বা নথি চুরিকে প্রকাশ্যে উৎসাহিত করতে দেখা গেছে–এমনটি আগে কখনো দেখিনি।

বহু স্বনামখ্যাত সাংবাদিকের কাছ থেকে ব্যক্তিগতভাবে সাংবাদিকতার পাঠ নেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছে। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংগ্রহের নানা কৌশল শিখেছি। শিখিয়েছেন নৈতিক চর্চার ভেতরে থেকে তথ্য সংগ্রহের কৌশল। কেউ কোনোদিন পেশাগত দায়িত্ব

পালনের জন্য তথ্য বা নথির কাগজ ‘চুরি’ করাকে কৌশল হিসাবে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেননি।

এটাই স্বাভাবিক যে, অসংগতিমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য সংশ্লিষ্টরা গোপন রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকবেন। নীতি-নৈতিকতার ভেতরে থেকে, নানা কৌশল অবলম্বন করে সেই গোপন তথ্য বা তথ্যসংবলিত নথির কপি সংগ্রহ করাই প্রতিবেদকের জন্য চ্যালেঞ্জ। এ দায়িত্ব পালনে প্রতিবেদকের মুনশিয়ানা বা দক্ষতা প্রমাণিত হয়। এসব কৌশলের মধ্যে সাংবাদিকের সশরীরে তথ্য বা নথির কাগজ চুরি করা নৈতিকতাবিবর্জিত কাজ। কোনো নথি বা নথির কাগজ প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বিশ্বস্ত এক বা একাধিক সোর্স তৈরি করে তাদের মাধ্যমে নথির কপি সংগ্রহ করার চর্চা শিখেছি তিন দশক ধরে। নীতি-নৈতিকতা অনুসরণ করে যেই সাংবাদিক এই মুনশিয়ানা দেখাতে পারেন, তিনিই সবার আগে প্রতিবেদন তৈরিতে সফল হন। অন্যরা তখন পিছিয়ে থাকেন, এটাই সাংবাদিকতায় সুস্থ প্রতিযোগিতা। নথি ‘চুরি’র পক্ষে সাংবাদিকদের সাফাই অশনিসংকেত। তথ্য ও নথি চুরি করা সাংবাদিকের অধিকার–এমন ধারণা দেওয়া পেশায় এবং সমাজে ভয়ংকর ও বিপজ্জনক বার্তা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। সৎ, সাহসী ও নৈতিকতার ভেতরে থেকে সাংবাদিকতা চর্চাকারীদের জন্য এই বাস্তবতা আতঙ্কের। কারণ, এমন অনৈতিক চর্চা বহুক্ষেত্রে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, নতুন নতুন বিপদ ডেকে আনবে–সর্বোপরি সাংবাদিকতাকে করবে কলঙ্কিত।

“এসব কৌশলের মধ্যে সাংবাদিকের সশরীরে তথ্য বা নথির কাগজ চুরি করা নৈতিকতাবিবর্জিত কাজ। কোনো নথি বা নথির কাগজ প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্য থেকে বিশ্বস্ত এক বা একাধিক সোর্স তৈরি করে তাদের মাধ্যমে নথির কপি সংগ্রহ করার চর্চা শিখেছি তিন দশক ধরে”

যে কোনো ধরনের প্রতিবেদন তৈরির কাজে নৈতিক চর্চার জায়গাটি একই রকম। এমন ধারণাও বিভ্রান্তিকর যে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বা প্রতিবেদন তৈরির কাজে নৈতিক চর্চা ভিন্নতর এবং সেখানে তথ্য বা নথি চুরির অধিকার রয়েছে সাংবাদিকের। বরং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় একজন সাংবাদিককে আরও অধিকতর সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যেন দীর্ঘ সময় বিপুল পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে তৈরি করা অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি সামান্য ভুল বা বিচ্যুতির জন্য পাঠক-দর্শকের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ ও অগ্রহণযোগ্য না হয়ে যায়। সম্প্রতি যে কোনো প্রতিবেদনকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলে দাবি বা প্রচার করার অদ্ভুত প্রবণতা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লক্ষ করা যাচ্ছে। বিশেষ করে, দুর্নীতি বা অপরাধবিষয়ক কোনো প্রতিবেদন হলেই সেগুলোকে অনেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলছেন। সবচেয়ে বিপজ্জনক হলো–প্রতিষ্ঠিত পেশাদার সাংবাদিকদের কেউ কেউ যখন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয়, এমন প্রতিবেদনকেও অনুসন্ধানী বলে প্রচার করেন। সাধারণ পাঠক বা দর্শকের পক্ষে কোন প্রতিবেদন অনুসন্ধানী এবং কোনটা নয়, এর তফাত বোঝা সম্ভব নয়। কিন্তু সাংবাদিক যদি সেই পার্থক্য বুঝেও কিংবা না বুঝে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয়, এমন প্রতিবেদনকে অনুসন্ধানী বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারণা চালান, তা সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবে এবং ভুল কিছু শেখানো হবে। সাংবাদিকতায় মিথ্যার কোনো সুযোগ নেই। সত্য প্রকাশ করা, সত্য বলাই সাংবাদিকতার ব্রত। কিন্তু সাংবাদিকরাও যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থে মিথ্যা বা অর্ধসত্য বলেন, সেটা সমাজকে ভয়ংকর দিকে ধাবিত করতে ভূমিকা রাখা ছাড়া আর কিছুই নয়। অনেকে অর্ধসত্যকেই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করাতে প্রাণান্তকর চেষ্টা চালান, তারা ভুলে যান অর্ধসত্য মিথ্যার চেয়েও ভয়ংকর। সাংবাদিকরা জাতির বিবেক, এটা একটি পুরোনো জনপ্রিয় কথা। বিবেকের কাজ সত্য গোপন করা কিংবা মিথ্যা বা অর্ধসত্যের আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ রক্ষা করা নয়। বিবেকপূর্ণ সাংবাদিকদের দায়িত্ব–সত্য না মিথ্যা, ন্যায় না অন্যায়, সঠিক না বেঠিক সেগুলো বিবেচনা করে সত্য, ন্যায় ও ন্যায্যতার পক্ষে অবস্থান নেওয়া। তবেই সাংবাদিক ও সাংবাদিকতার স্বার্থ, মানমর্যাদা রক্ষিত হবে। এসব ভাবনাকে এড়িয়ে চললে সাংবাদিকতার প্রতি দেশের মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা সম্পূর্ণ তিরোহিত হতে আর বেশি সময় লাগবে না। এমনিতেই বহুমানুষ অপসাংবাদিকতা দেখতে দেখতে দেশের সাংবাদিকতাকে কটাক্ষ করে ‘সাংঘাতিকতা’ বলে, আর সাংবাদিকদের বলে ‘সাংঘাতিক।’ সাংবাদিকতা বা এখন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নামে আমাদের পেশায় যে অপকর্মগুলো অনেকে করছেন, তা জনসমক্ষে না এলেও সেগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নৈতিক দায়িত্ব সাংবাদিকদেরই। আমাদের পেশায় কেউ নীতি-নৈতিকতাবহির্ভূত কিছু করলে, সেই অন্যায়ের পক্ষে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া উচিত? না কি অপচর্চাকে প্রত্যাখ্যান করে সাংবাদিকতার নৈতিক চর্চাকে এগিয়ে নিতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা থাকা উচিত? এসব ভাবার জন্য আরও সময়ক্ষেপণ করলে তা সাংবাদিকদের জন্য আত্মহত্যার শামিল হবে।

২০১১ সালে আমেরিকায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি বৃহৎ সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। সেখানে সাংবাদিকতা কোনো অপরাধ নয়, ‘Journalism is not a crime’, স্লোগানটি সর্বত্র শোভা পেতে দেখি। বিশ্বজুড়ে এটা সাংবাদিকদের জনপ্রিয় স্লোগান। সাংবাদিকতাকে যুগে যুগে, দেশে দেশে নানা কায়দায় আক্রমণ করা হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে সাংবাদিকতা এগোচ্ছে এগোবে–কারণ, সাংবাদিকতা গোটা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর পেশা, কোনো অপরাধমূলক কাজ নয়। আমাদের দেশের বর্তমান বাস্তবতায় জনপ্রিয় এই স্লোগানটির সঙ্গে আরও কিছু যুক্ত না করলে তা এককভাবে অনৈতিক চর্চার ঢাল হিসাবে ব্যবহৃত হতে থাকবে। তাই আরেকটু যোগ করে বলা যেতে পারে–সাংবাদিকতা কোনো অপরাধ নয়; চুরি করা সাংবাদিকতা নয়–অপরাধ। সাংবাদিকের কাজ তথ্য সংগ্রহ করা, তথ্য চুরি করা নয়। আমি চোর নই–আমি সাংবাদিক। আমি তথ্য চুরি করি না, সাংবাদিকতার স্বার্থে আমি তথ্য সংগ্রহ করি।

লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক

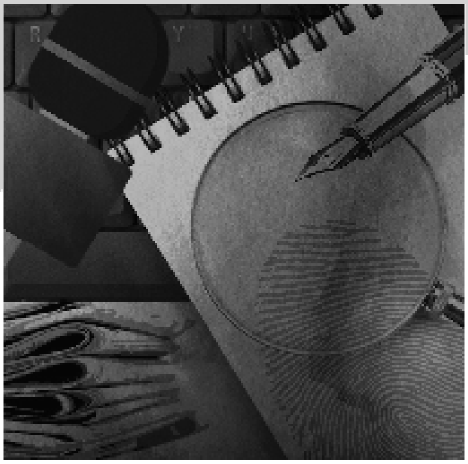

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ও কিছু কথা

শাহ নিসতার জাহান

গণমাধ্যমের সঙ্গে রাজনীতি এবং ক্ষমতার রয়েছে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তবে এই ঘনিষ্ঠতা সব সময়ই মধুর নয়। কখনো কখনো অম্লমধুর। কখনো কখনো একেবারেই মধুর, আবার সেটি তিক্ত হয়ে ওঠে খুব। ক্ষমতাধররা যখনই গণমাধ্যমের ক্ষমতা অনুধাবন করেছে, তখন থেকেই তারা একে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। এই নিয়ন্ত্রণের পেছনের মূল কারণটি হলো, যাতে তাদের থলের বেড়াল বের হয়ে না পড়ে। ক্ষমতাধর শ্রেণি সব সময়ই চেয়েছে এবং চাইবে সাংবাদিকরা কোনো সংবাদ এমনভাবে লিখুক যাতে তারা বিব্রত না হন। এখন যদি বিব্রত না হতে হয় এবং সাংবাদিক যদি সেভাবেই সংবাদ পরিবেশন করেন, তবে ক্ষমতাধরদের সঙ্গে সাংবাদিকদের বিরোধের কোনো অবকাশ থাকে না। কিন্তু বিরোধটি রয়েছে এবং সম্ভবত এই বিরোধ মিটে যাওয়ারও নয়। কেননা বিরোধটি মিটে গেলে সাংবাদিকতাও শেষ হয়ে যাবে।

এই বিরোধের মূল কারণ হলো সাংবাদিক সংবাদের 'পেছনের সংবাদ' খোঁজেন। এই পেছনের সংবাদই অনুসন্ধানমূলক সংবাদের পথ দেখিয়ে দেয়। এই অনুসন্ধানের সঙ্গে যুক্ত থাকে সামাজিক দুর্নীতি, রাজনীতির দুর্নীতি, রাষ্ট্রীয় দুর্নীতি প্রভৃতি; যা উদ্‌ঘাটন সব সময়ই চ্যালেঞ্জিং। যে কোনো সময় সাংবাদিকের এই কাজে বাগড়া আসতে পারে। সাধারণ হুমকি-ধমকি থেকে শুরু করে প্রাণহানির ঘটনা এই চ্যালেঞ্জের সঙ্গে জড়িত। উদাহরণ হিসাবে আমরা সৌদি সাংবাদিক জামাল খাসোগির কথা উল্লেখ করতে পারি।[১] তার বেশকিছু রিপোর্ট সৌদি রাজপরিবারের বর্তমান কর্তাব্যক্তিদের জন্য হুমকির

কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষত সৌদি প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। সালমান নানাভাবে তাকে বাগে আনার চেষ্টা করেছিলেন। পারেননি। শেষ পর্যন্ত খাসোগিকে প্রাণ দিতে হলো। বিশ্বব্যাপী এমন উদাহরণ বহু। বাংলাদেশেও এ ধরনের উদাহরণ খুব কম নয়।

বহুক্ষেত্রে দেখা যায়, শাসকরা একটি চক্র দ্বারা বেষ্টিত থাকেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা এই চক্রকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রশ্রয় দেয়। তারা চক্রটি ক্রমশ বড়ো করতে চান। এই চক্র কিংবা ক্ষমতার কাছাকাছি বসবাসরত লোকেরাও তাদের সুবিধার জন্য নিজ নিজ চক্র তৈরি করে। এরা তাদের ক্ষমতার কথাটি সমাজে জানান দিতে কখনো কুণ্ঠিত নয়। এরও নানাবিধ কারণ রয়েছে। মূলত তাদের রয়েছে নানা অপরাধে সংশ্লিষ্টতা। নদী ভরাট থেকে শুরু করে নিজ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ কায়েমে নানা অপকর্ম আমরা দেখেছি। এসব ঘটনার উদাহরণ আমরা প্রায়ই আমাদের দেশে দেখতে পাই। এর মানে, এই যে সংবাদ, এটি একজন সাংবাদিকের জন্য কেবলই সাধারণ ঘটনা নয়।

অনুসন্ধানী রিপোর্ট একটি আপাতসাধারণ ঘটনাকে ক্লু হিসাবে ধরে বহু বড়ো বিষয় পাঠকের সামনে তুলে ধরার ক্ষমতা রাখে। যে কোনো ঘটনা একজন সাংবাদিকের নজর ঘুরিয়ে দিতে পারে। এই নজর ঘুরিয়ে নিয়ে যে পথ তিনি আবিষ্কার করবেন, তা-ই হবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে পাওয়া সংবাদ। সাংবাদিককে সেই পথটি ধরতে জানতে হয়, সে পথ যে আছে তা বুঝতে হয় এবং সে পথ ধরে মূল লক্ষ্যে চলে যাওয়ার জন্য অবিরাম পরিশ্রম করতে হয়। মূলত সংবাদ সংগ্রহে 'অনুসন্ধানের' এই পথটিই একজন সাংবাদিককে 'সাংবাদিক' হিসাবে তৈরি করে। যার অনুসন্ধানে মন নেই, তার জন্য 'সাংবাদিকতা' পেশা হতে পারে না। যিনি এলিট শ্রেণি বা ক্ষমতাধরদের সঙ্গে নিয়মিত আপস করেন, সাংবাদিকতা তার জন্যও নয়। সাংবাদিকতা যদি 'নোবেল' পেশা হয়ে থাকে, তার প্রাণটি এই অনুসন্ধানেই রয়েছে সুনিশ্চিত।

কিন্তু অনুসন্ধানের কাজটি অবশ্যই খুব সহজ নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বহুবিধ বিষয়। এর সঙ্গে যেমন স্থানীয় দুর্নীতি জড়িত, রাষ্ট্রীয় কাজে সংশ্লিষ্টদের দুর্নীতিও এর সঙ্গে জড়িত। বিশেষত আমাদের মতো 'তৃতীয় বিশ্বের' দেশগুলোয় রাষ্ট্রীয় আমলাদের দুর্নীতি বহুক্ষেত্রেই আকাশছোঁয়া। স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পরিবেশ, খাদ্য, শিক্ষা–দুর্নীতি কোথায় নেই? আবার অনেক বিষয় রয়েছে, যেখানে জড়িত আছে বিদেশি রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক। যেমন, ২০০৩ সালে ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হামলা হয়েছিল মিথ্যার ওপর ভিত্তি করে। সাংবাদিকরা শুরুতেই মিথ্যাটাকে চ্যালেঞ্জ করেনি বা করতে পারেনি। তারা যখন সত্যটি বুঝতে পারল, তখন জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। নানাবিধ বিবেচনায়, রাষ্ট্র অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতা পছন্দ করে না। মালিকরাও বাগড়া দেন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়। নানা কারণেই সেই বাগড়া। ফলে অনুসন্ধানী সংবাদ সংগ্রহে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থাকে মনে রেখেই একজন সাংবাদিক এগিয়ে যান। কিন্তু অনুসন্ধান থামিয়ে দেন না।

অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সাংবাদিকের দরকার হবে খুব নির্ভরযোগ্য এক বা একাধিক 'সোর্স'। এই 'সোর্স' তাকে নানাভাবে সহায়তা করবে নানান তথ্য ও ডকুমেন্ট দিয়ে। অর্থাৎ এই পর্যায়ে একজন সাংবাদিকের হয়তো তথাকথিত 'চৌর্যবৃত্তির' সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে হয়। এটি আসলে মোটেই তথ্য চুরি নয়, বরং কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোনো অন্যায়ের সঙ্গে কীভাবে জড়িত, এর একটি সাক্ষ্য তার হাতে রাখা। নিজেকে নিরাপদে রাখার জন্যই তার দরকার ওই ডকুমেন্টের কপি। সাংবাদিকের কাছে 'তথ্য চুরি' বলতে কোনো শব্দ নেই। এটি কোনোক্রমেই তার ভাষ্য নয়। এগুলো বরং তার অনুসন্ধানের হাতিয়ার। এই 'চুরি' বন্ধ হয়ে গেলে, বন্ধ হবে সত্যিকারের সাংবাদিকতা। শেষ হয়ে যাবে সাংবাদিকতার প্রাণ; তখন সমাজে ক্ষমতাধর ও দুর্নীতিবাজ মানুষগুলো হয়ে উঠবে বেপরোয়া। সাংবাদিক যে সমাজে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করবেন, সেই ব্রত আর থাকবে না। আসলে অনুসন্ধানকে চিন্তা করে এবং নথি বা তথ্য 'চুরির' কথা হিসাবে ধরেই সাংবাদিকতায় একান্তভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়, অকারণে এবং সহজেই সোর্সের পরিচয় প্রকাশ না করার। সোর্সের পরিচয় যথাসাধ্য গোপন রাখার প্রধানত দুটি কারণ। প্রথমত, যিনি তথ্য সরবরাহ করবেন, তিনি বিপদে পড়বেন। দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য যারা সোর্স হিসাবে কাজ করতেন এবং করছেন তাদেরকে আর এ ব্যাপারে কাছে পাওয়া যাবে না। বিষয়টি চিন্তা করলে আমরা দেখব, সাংবাদিকতা যে কোনো মূল্যে এই তথ্য সরবরাহকারীদের বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তার মানে, 'তথ্য চুরি' বলতে কোনো কিছু সাংবাদিকতার জগতে নেই। একে বরং তথ্য বা ডকুমেন্ট সংগ্রহ বলা যেতে পারে। একই কারণে কোনো সাংবাদিক যদি কোনো ডকুমেন্ট হাতে পেয়ে যান, তাহলে 'এই তথ্য আপনি কোত্থেকে পেলেন', কিংবা 'কেন সংগ্রহ করলেন'–এ জাতীয় প্রশ্ন বৃথা। প্রশ্নটি কেবল হতে পারে, যে তথ্য তার হাতে এসেছে, সেটি সঠিক কি না। তথ্য কীভাবে তার হাতে এসেছে, সেটি বলার দায়িত্ব সাংবাদিকের নয়; বরং তার তথ্য সঠিক কি না, তার জবাবদিহিতাই সাংবাদিকের দায়িত্ব। অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহের এটি এক বিরাট কৌশল। এই কৌশলটি সবাই সব সময় কৌশলীর মতো করতে পারেন না। আসলে গণমাধ্যমের যে জবাবদিহিতা, এর পরিপূর্ণতা খুঁজে পাওয়া যাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায়। এ এক সাহসিকতার সাংবাদিকতা। এ বিষয়টি খেয়াল করেই আমার মনে হয়, ইউনেস্কো ২০০৯ সালে যে ম্যানুয়ালটি প্রকাশ করে (স্টোরি বেজড ইনকোয়ারি: এ ম্যানুয়াল ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম), এর উদ্দেশ্যই হলো বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতাকে উৎসাহ দেওয়া। ম্যানুয়ালটি শুরুতেই বলে দেয়, অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের জন্য দরকার গোপন ও প্রকাশিত তথ্য। তবে এটি কোনোভাবেই 'রুটিন' সংবাদ নয়। 'কেন ঘটছে'–এ এক কঠিন প্রশ্ন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের। মনে রাখা দরকার, সব তথ্যের জন্যই যে লিখিত ডকুমেন্ট পাওয়া যাবে, তা নয়। বহু ঘটনা রয়েছে, যার কোনো লিখিত ডকুমেন্ট না-ও থাকতে পারে। যদিও বহুক্ষেত্রেই থাকে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বাংলাদেশে বহু গুরুত্বপূর্ণ খাল এখন আর নেই। ভরাট হয়ে গেছে। এখন নদী ভরাট হচ্ছে। নদী ভরাট করে কেউ স্থাপনা করছে। ধরা যাক, এসব ভরাটের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা সব সময়ই যে এমনি এমনি নিজের উদ্যোগে করে ফেললেন তা নয়; বরং তাদের খুঁটির দৈর্ঘ্য বেশ বড়ো এবং জোরও বেশ। এটি অনুসন্ধানের বিষয় হতেই পারে। তবে এক্ষেত্রে কোনো লিখিত নথি বা ডকুমেন্ট কারও হাতে না থাকারই কথা। বাংলাদেশে পাহাড় কেটে কীভাবে শেষ করা হচ্ছে, তা এক বিশাল বিস্ময়। আমাদের গণমাধ্যমগুলো এসব বিষয়ে কদাচিৎ দু-একটি 'রুটিন' রিপোর্ট করেই শান্ত হয়ে যায়। 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' জাতীয় এসব রিপোর্ট পড়ে পাঠক কী বোঝেন, বলা মুশকিল।

নানাবিধ কারণে শাসক কিংবা ক্ষমতাধরদের সবচেয়ে অপছন্দের সাংবাদিকতা হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। কারণ, এটি সাক্ষ্যপ্রমাণসহ হাঁড়ির খবর বলে দেয়। প্রতিবাদলিপি লিখেও তারা সুবিধা করতে পারেন না। রাজনীতিক, সরকার, আমলা থেকে শুরু করে যাবতীয় অসৎ বা দুষ্টুলোকের পেছনে লেগে থাকেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। তবে সাংবাদিক যেমন এসব দুর্নীতিগ্রস্ত লোকের পেছনে লেগে থাকেন, সাংবাদিকের পেছনেও লেগে থাকে এসব দুর্নীতিবাজ। দুপক্ষে তাই সাপে-নেউলে সম্পর্ক। এটাই স্বাভাবিক।

অনুসন্ধানমূলক সাংবাদিকতার ভিত বাংলাদেশে খুব শক্ত অবস্থান লাভ করেনি কখনো। এদেশে সাংবাদিকদের নৈতিকতা এক বিশাল প্রশ্নের সম্মুখীন। তারা সহজেই রণে ভঙ্গ দেন। কোনো কোনো বিষয়ে একটি-দুটি সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর তারা আর ওই সংবাদে মন দেন না। কখনো কখনো এমনও আছে যে, মালিকপক্ষ সংবাদ প্রকাশের মাধ্যমে কাউকে চটাতে বা অসন্তুষ্ট করতে চায় না। এই চটাতে না চাওয়ার পেছনের কারণ আমাদের কারও অজানা নেই। আবার একটি প্রতিবেদনের পেছনে ধাবিত হওয়ার জন্য যে শ্রম, ধৈর্য ও সময় দরকার, তাও অনেকেই দিতে চান না। আর সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হলো, সাংবাদিকরা ভেতরের ঘটনা জানার পরও তা নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করেন না। তারা নানাভাবে, নানা কারণে 'ম্যানেজড' হয়ে যান কিংবা 'ম্যানেজড' হয়েই থাকেন, যা আগেই উল্লেখ করেছি। এদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার আরেকটি বড়ো সমস্যা হলো, সাংবাদিকরা ওই অর্থে জোটবদ্ধ নন। একজনের বিপদ 'সবার বিপদ' এখন আর খুব হয়ে ওঠে না। যেহেতু অনুসন্ধানমূলক সংবাদ করায় ঝুঁকি বেশি, একজন সাংবাদিক বিপদে পড়লে বাকিরা যে তার হয়ে কথা বলবেন, তার পক্ষে দাঁড়াবেন, তেমন নিশ্চয়তা খুব বেশি নেই। ফলে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা খুব একটা ভিত্তি লাভ করতে পারেনি। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যে একেবারেই হচ্ছে না, তা নয়। হচ্ছে। কিন্তু এই হওয়াটা বহু বিষয়ে ছাড় দিয়ে, সামান্য উঁকি দেওয়ার মতো। ঠিক গর্জে ওঠার মতো নয় কখনোই।

---

১. *জামাল আহমেদ খাসোগি। তিনি ২০১৮ সালে তুরস্কের ইস্তানবুলে সৌদি কনসুলেট অফিসে নিহত হন। তিনি আল-আরব নিউজ চ্যানেলের এডিটর-ইন-চিফ ছিলেন। ওয়াশিংটন পোস্টের নিয়মিত কলামিস্ট*

লেখক: বিভাগীয় প্রধান, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

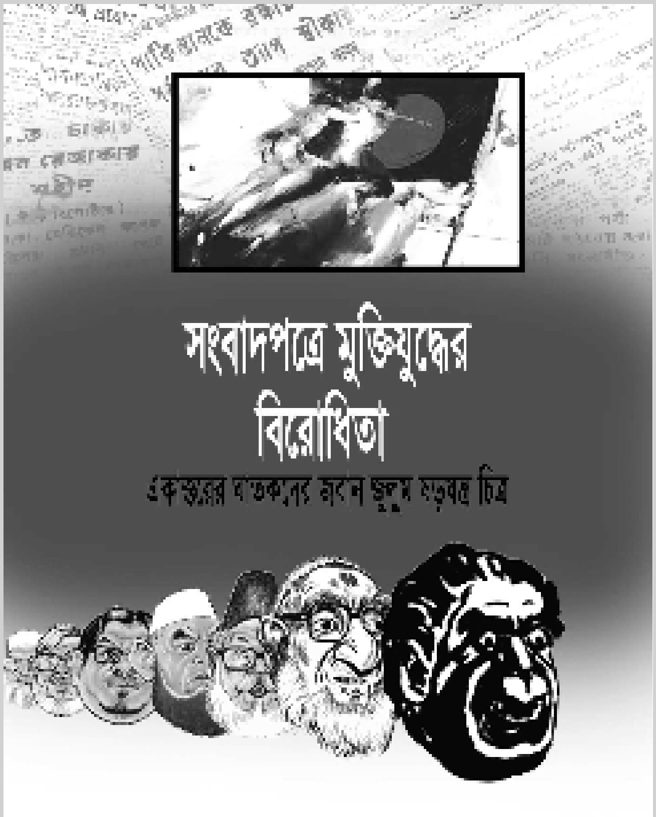

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

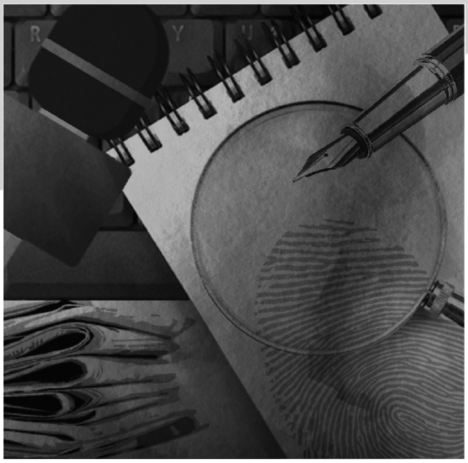

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ইতিহাসের চোখে

তানভীর আহমদ

'সাংবাদিকতাকে প্রায়ই ইতিহাসের প্রথম খসড়া হিসাবে অভিহিত করা হয়; পক্ষান্তরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে আইন প্রণয়নের প্রথম খসড়া।' (Burgh, 2000, p. 4)

তথ্যের জন্য চাহিদা মানুষের চিরন্তন। সমাজভুক্ত জনগোষ্ঠীর কাছে নিরবচ্ছিন্ন তথ্য সরবরাহের ধারাবাহিক প্রচেষ্টার ফসল আধুনিক সাংবাদিকতা। কোনো বিষয়ে জেনে-বুঝে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যেসব তথ্যের প্রয়োজন, সাংবাদিকতা এর বৃহদাংশের জোগানদাতা। প্রাচীন ভারতীয়, মিসরীয়, গ্রিক বা রোমান সভ্যতায় আনুষ্ঠানিক তথ্য আহরণ ও বিতরণের কিছু খণ্ড নজির থাকলেও পেশাদার সাংবাদিকতা ও সাংবাদিকের জন্ম খুব বেশিদিন আগে নয়। ক্যারি'র (Carey, 1997, PP. 128-129) মতে, পশ্চিমা দেশগুলোয় অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের পাশাপাশি 'যোগাযোগ ও জনপ্রিয় সংস্কৃতির বিপ্লব'-এর অভিজ্ঞতাও ঘটেছিল। আধুনিক সাংবাদিকতা এই বিপ্লবেরই একটি দিক। শালাবী-ও (Chalaby, 1998) সাংবাদিকতাকে উনবিংশ শতাব্দীর উদ্ভাবন হিসাবে বর্ণনা করেছেন। এর আগের প্রকাশনাগুলো তার ভাষায় সংবাদপত্র নয়, প্রচারপত্র ছিল। রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী বা ধর্মপ্রচারকের প্রভাববিস্তারের উপকরণ থেকে জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার পথে সংবাদপত্রের যে পরিক্রমা, তার ফসল পেশাজীবী হিসাবে রিপোর্টার এবং কর্মকৌশল হিসাবে রিপোর্টিংয়ের জন্ম। ব্যক্তিগত মতামত ও আবেগমুক্ত হয়ে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার দক্ষতা সাধারণ মানুষের কাছে রিপোর্টারকে তথ্য

সরবরাহকারী হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে। পরিপার্শ্বের নির্মোহ পর্যবেক্ষক হিসাবে সাংবাদিকদের মর্যাদা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, ঊনবিংশ শতকের ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ এডমন্ড বার্ক রাজা, যাজক ও সাধারণ জনগণ–তৎকালীন রাষ্ট্রের এই তিনটি স্তম্ভের পাশাপাশি সাংবাদিকদের রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে আখ্যা দেন। রাষ্ট্র ও সমাজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর নজরদারিলব্ধ তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশ, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার উন্মোচন করার মাধ্যমে সংবাদমাধ্যম প্রহরীর ভূমিকা পালন করে। ঘটনার সাদামাটা বিবরণকেন্দ্রিক প্রতিবেদন এ দায়িত্ব পালনে পুরোপুরি সক্ষম না হওয়ায় সাংবাদিকদের প্রয়োজন হয়ে পড়ে নয়া কৌশল উদ্ভাবনের। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সে ধরনেরই একটি কৌশল।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় রিপোর্টার প্রকৃত সত্য কেবল বর্ণনা করা নয়, প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেন। গবেষকদের কাজের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। সাংবাদিক এখানে গবেষকদের মতোই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন, সংগৃহীত উপাত্ত পদ্ধতিগতভাবে বিশ্লেষণ করেন, বিশ্লেষিত উপাত্ত সমজাতীয় তথ্য-উপাত্তের সঙ্গে তুলনা করেন এবং প্রয়োজনে কম্পিউটার সহায়ক পদ্ধতি কাজে লাগান।

বিল কোভ্যাক ও টম রোজেনস্টিয়েল মনে করেন, ক্ষমতাকে স্বাধীনভাবে নজরদারিতে রাখা এবং প্রকৃত সত্য তুলে ধরাই হচ্ছে সমাজের প্রতি সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড়ো অবদান (Kovach and Rosenstiel, 2007)। এটেমা ও গ্লাসেরের মতে, 'অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে আমরা এমন রিপোর্ট পাই, যা কোনো অন্যায়-অবিচারের ঘটনার সযত্নে যাচাইকৃত ও দক্ষভাবে বর্ণিত বিবরণ...যেখানে ঘটনাটি কেবল বিবরণের চেয়ে বেশি অর্থ বহন করে। অন্যায়-অবিচারগুলো সামাজিক ব্যবস্থার যে ব্যর্থতা, জনপ্রতিষ্ঠানগুলোর যে অরাজকতার কারণে সৃষ্টি হয়, সেগুলোর দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে; প্রকারান্তরে এ ধরনের রিপোর্ট ব্যর্থতা ও অরাজকতাগুলোর ব্যাপারে সরকারি কর্মকর্তা ও জনগণের প্রতিক্রিয়া দাবি করে' (Ehema and Glasser, 1998, p. 3)।

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তাই সুস্থ সাংবাদিকতা তথা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দৃঢ় উপস্থিতিকে সহায়ক বলে মনে করা হয়।

উন্মেষ-পর্ব

আজকের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে এই ধারাটিকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রাচীন মিসরে প্যাপিরাসে লিখিত সংবাদ প্রতিবেদনের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যেখানে বলা হচ্ছে–কসাইরা বাজার পরিদর্শককের অনুমতিবিহীন মাংস বিক্রি করছে। চীনে ২৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি এবং সে সম্পর্কে জনগণের ভাবনা নিয়ে রিপোর্ট করার জন্য অনুসন্ধানকারী নিয়োগের উদাহরণ রয়েছে। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সাম্প্রতিক ধারাটির জন্মভূমি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম সুবিদিত।

আমেরিকার ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম সংবাদপত্র, ১৬৯০ সালে প্রকাশিত পাবলিক অকারেন্সেসে সম্পাদক বেঞ্জামিন হ্যারিস ফরাসি রাজপরিবারের সদস্যদের অনৈতিক সম্পর্ক এবং ফরাসি যুদ্ধবন্দিদের প্রতি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর বর্বর আচরণ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। আপত্তিকর বিষয়বস্তু এবং বিনা অনুমতিতে সংবাদপত্র প্রকাশের দায়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম সংবাদপত্রটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পরই কর্তৃপক্ষের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক সময়ের মার্কিন পত্রপত্রিকায় সংক্ষিপ্ত সাদামাটা খবরের বাইরে তেমন কিছু ছাপা হতো না। ১৭৩৪ সালে জন পিটার জেনগার, দ্য নিউইয়র্ক উইকলি জার্নালে নিউইয়র্কের গভর্নর উইলিয়াম কসবির দুর্নীতি বিষয়ে রিপোর্ট করেন। জেনগারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করা হলেও 'সত্য বলা ও লেখার মাধ্যমে...স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতার উন্মোচন ও বিরোধিতার স্বাধীনতা' স্বীকার করার মাধ্যমে আদালত তাকে মুক্তি দেন। জেনগার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার একটি প্রতীকে পরিণত হন (Alexander, 1972, p. 99)।

১৭ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকে মার্কিন সরকার ফেডারেলপন্থি ও রিপাবলিকান দুটি অংশে বিভক্ত হয় এবং উভয় পক্ষই সংবাদপত্রকে নিজেদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত এসব সংবাদপত্রের অন্যতম প্রধান উপজীব্য ছিল বিরোধীপক্ষের ত্রুটি-বিচ্যুতিমূলক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। কিন্তু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, গির্জা, সামরিক বাহিনী ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধানের আওতার বাইরে থেকে যায়।

১৮ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে মুদ্রণ প্রযুক্তির অগ্রগতি, কাগজের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার প্রসার সংবাদপত্রকে জনগণের কাছে আর্থিকভাবে সহজলভ্য করে তোলে। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত বেঞ্জামিন ডের নিউইয়র্ক সান এক পেনি বিক্রয়মূল্যে বাজারে যেতে শুরু করে। আরও অনেক সংবাদপত্র একই পথ অনুসরণ করে।

> অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় রিপোর্টার প্রকৃত সত্য কেবল বর্ণনা করা নয়, প্রকৃত সত্য উন্মোচন করেন। গবেষকদের কাজের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়। সাংবাদিক এখানে গবেষকদের মতোই তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন

সংবাদপত্রের সার্কুলেশন বৃদ্ধি পায়, একই সঙ্গে যা বিজ্ঞাপন থেকে প্রাপ্ত আয়েও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। এ দুইয়ের সম্মিলনে সংবাদপত্র রাজনৈতিক দলগুলোর প্রভাবমুক্ত হওয়ার মতো স্বনির্ভরতা অর্জন করে। পেশাদার সম্পাদক-সাংবাদিকরা নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী খবর প্রকাশের সুযোগ পান। উইলিয়াম র‍্যান্ডলফ হার্স্ট, ই ডব্লিউ স্ক্রিপস এবং জোসেফ পুলিৎজারের মতো সম্পাদক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে বিবেচনা করেছিলেন পত্রিকার সার্কুলেশন এবং নিজস্ব প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির উপায় হিসাবে। ফলে এ সময়ে বেশকিছু উচ্চমানের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নজির পাওয়া যায়। ১৮৭০ সালে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা নিউইয়র্কের ডেমোক্র্যাট নেতা উইলিয়াম টুইডের আর্থিক কেলেঙ্কারির তথ্য উন্মোচন করে। পুলিৎজারের নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ড পত্রিকার রিপোর্টার নেলি ব্লাই ১৮৮৭ সালে আত্মপরিচয় গোপন করে এক উন্মাদ আশ্রমে ভর্তি হন এবং সেখানকার ভয়াবহ পরিস্থিতি তুলে ধরে প্রতিবেদন লিখেন। এ সময়কার আরেকজন বিখ্যাত অনুসন্ধানী সাংবাদিক ইডা. বি ওয়েলস ১৮৯২ সালে তিনজন কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিন ব্যবসায়ীকে গণপিটুনি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যার ঘটনা উদ্‌ঘাটন করেন। শ্বেতাঙ্গ মার্কিনিদের বর্ণবাদী সহিংস আচরণ নিয়ে তিনি বেশকিছু সাহসী প্রতিবেদন লেখেন বর্ণবাদী শক্তির আক্রোশের শিকার হওয়ার পরও। এ সময়ের সাংবাদিকরা

মানবাধিকার লঙ্ঘন, পতিতাবৃত্তি, বস্তিবাসীদের অবস্থা, আর্থিক দুর্নীতি, আদালতকর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার, ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের বিবাহ, অতিরিক্ত সম্পর্কের মতো বিষয় জনগণের কাছে উন্মোচন করেন।

উইলিয়াম টমাস স্টিড ১৮৮৫ সালে কম বয়সি মেয়েদের পাচার বিষয়ে গোপন অনুসন্ধান চালিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। এই প্রতিবেদনের কারণে তাকে কারাবাস করতে হলেও এ সংক্রান্ত আইন পরিবর্তনে প্রতিবেদনটি ভূমিকা রেখেছিল। তাকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

মাকরেকারদের যুগ

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পরিমাণ, পরিধি ও ব্যাপ্তির দিক থেকে আরও বেশি বিস্তৃত হয়। যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন, বিশেষত আন্তঃমহাদেশীয় রেলপথ নির্মাণের ফলে সংবাদপত্রের বিতরণ, সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপনী আয়ে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। ১৯০২ থেকে ১৯১২–এই দশকটিকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার 'সোনালি সময়' বলা হয়। সর্বোচ্চ মানের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অনেক উদাহরণ আমরা এ সময়ে দেখতে পাই। লিংকন স্টেফেনস ১৯০৪ সালে পৌর কর্তৃপক্ষের সীমাহীন দুর্নীতি উন্মোচন করে ম্যাক ক্লুরিস ম্যাগাজিনে 'দ্য শেম অব দ্য সিটিস' শিরোনামে প্রতিবেদন লেখেন। একই বছর ওই ম্যাগাজিনে ইডা টারবেল মার্কিন ধনকুবের জন ডি. রকফেলারের মালিকানাধীন স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। রেলপথ অবকাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কীভাবে যুক্তরাষ্ট্রের অশোধিত তেল উৎপাদন, খনন ও বিতরণের পুরো প্রক্রিয়াটিতে অন্যায়ভাবে একচ্ছত্র আধিপত্য করছে, তিনি তা উদ্‌ঘাটন বরেন। আপটন সিনক্লেয়ার ১৯০৬ সালে শিকাগোর মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানাগুলো অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং সেখানে অভিবাসী শ্রমিকদের প্রতি অমানবিক আচরণ ও শ্রমশোষণের বিষয়টি উন্মোচন করেন।

এ সময় অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের 'মাকরেকার' এবং তাদের রিপোর্টিং পদ্ধতিকে 'মাকরেকিং' নামেও ডাকা হতো। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট ১৯০৬ সালে এসব সাংবাদিকের সমালোচনা করে দেওয়া এক বক্তৃতায় শব্দটি চয়ন করেছিলেন। লেখক জন বানিয়ানের পিলগ্রিমস প্রগ্রেস নামক বিখ্যাত উপন্যাসের চরিত্র মাকরেক। নোংরা আবর্জনা ঘাঁটা এই চরিত্রটিকে রুজভেল্ট দুর্নীতি সন্ধানী এবং সাংবাদিকদের উপযুক্ত রূপক হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন।

ভাটার টান

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক দশক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বেগবান স্রোতটিতে ভাটার টান লাগে। ষাটের দশকের আগ পর্যন্ত এই ম্রিয়মাণতা লক্ষ করা যায়। ইতিহাসজ্ঞরা এই প্রবণতার নানামুখী কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদকদের অনবরত লেখালেখির কারণে শিল্পবিপ্লবের উপজাত শোষণ ও বঞ্চনা অনেকাংশে হ্রাস পায়। ফলে এ ধরনের প্রতিবেদনের চাহিদাও কমে যায়। বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে সরকারের প্রতি জনগণের আস্থা ও নির্ভরতা বৃদ্ধি পায় এবং প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলন জনপ্রিয়তা হারায়। এ কারণে সরকারের দুর্নীতি উন্মোচনকারী উদারপন্থি সাংবাদিকতার বাজারে মন্দা পরিলক্ষিত হয়। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলোর পুঞ্জীভূত হওয়ার প্রবণতা অনুসন্ধানী সাংবাকিতার মূল প্ল্যাটফরম স্বাধীন সাময়িকীগুলোর অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়। এসব কারণে অর্থনৈতিক মহামন্দা বা মহাযুদ্ধ কোনোটিই জনগণকে ওই সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। বরং 'বস্তুনিষ্ঠতা এবং কর্তৃপক্ষের প্রতি অতিশ্রদ্ধা সাংবাদিকতার প্রধান রীতিতে পরিণত হয়' (Protess etal , 1991, p. 45)।

পূর্ণোদ্যমে পুনরাবির্ভাব

ষাটের দশকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পূর্ণোদ্যমে পুনরাবির্ভাব ঘটে। নয়া প্রজন্মের একদল মাকরেকার বর্ণবাদী বিভাজন, ভিয়েতনাম যুদ্ধ, রাজনৈতিক দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, করপোরেট অপকর্ম প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে শুরু করে। Burgh (2000)-এর মতে, ষাটের দশকের পরিবেশটাই ছিল কর্তৃপক্ষকে বিনা প্রশ্নে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে না রাখার অনুকূল। তাছাড়া জনপ্রিয় মাধ্যম টেলিভিশনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অস্তিত্ব সংকটে ভোগা মুদ্রণ সাংবাদিকতার কাছে খবরের গভীর কাভারেজ ছিল পরিস্থিতি উত্তরণের একটি উপায়। ষাটের দশকে দুটি অনুসন্ধানী রচনা বই আকারে প্রকাশিত হলেও ব্যাপক প্রভাববিস্তার করেছিল। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সব বৈশিষ্ট্যই বই দুটিতে ছিল। সালে প্রকাশিত সাইলেন্ট স্প্রিং বইয়ে র‍্যাচেল কার্সন কীটনাশক ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেন। বিশ্বব্যাপী পরিবেশগত আন্দোলনের সূচনার কৃতিত্ব দেওয়া হয় এই প্রকাশনাটিকে। ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত আনসেইফ এট অ্যানি স্পিড বইয়ে রালফ নাদের গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানিগুলোর সমালোচনা করেন ত্রুটিপূর্ণ নকশাযুক্ত গাড়ি বাজারজাত করে দুর্ঘটনার কারণ হওয়ার জন্য। এই অনুসন্ধানকর্ম ভোক্তা আন্দোলন শক্তিশালী করার পেছনে ভূমিকা রেখেছিল।

সাংবাদিক সিমরহার্স ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনী কর্তৃক মাইলাই নামের এক গ্রামে ৫০৪ নিরস্ত্র ভিয়েতনামী বেসামরিক নাগরিককে হত্যার ঘটনা ১৯৬৯ সালে তুলে ধরেন। মাইলাই হত্যাকাণ্ড নামে পরিচিত এই বর্বর ঘটনাটি মার্কিন সেনাবাহিনী প্রাথমিকভাবে অস্বীকার করেছিল। ব্রিটিশ সানডে টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক ফিলিপ নাইটলি ১৯৬৮ সালে গর্ভবতী মায়েদের জন্য ব্যবহৃত একটি ওষুধ থ্যালিডোমাইডের ভয়াবহ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে বিকলাঙ্গ শিশু জন্ম নেওয়ার বিষয়টি উদ্‌ঘাটন করেন। অভিযুক্ত ওষুধ কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্তদের মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়। নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার প্রতিবেদক নেইল শিহান ১৯৭১ সালে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক ডেনিয়েল এলসবার্গের কাছ থেকে ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাস বিষয়ে যে গোপন সরকারি দলিল পান, তাতে দেখা যায় মার্কিন সরকার ভিয়েতনামে সামরিক হস্তক্ষেপের যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে নিরাপত্তা হুমকিকে অতিরঞ্জিতভাবে উপস্থাপন করেছিল। পেন্টাগন পেপারস নামে পরিচিত এসব দলিলভিত্তিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় সিরিজ আকারে ছাপা হয়।

তবে খ্যাতি, গুরুত্ব, প্রভাবের দিক থেকে সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ওয়াটারগেট স্ক্যান্ডাল নামে পরিচিত ঘটনাটি। ১৯৭২ সালে ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকার দুইজন উদ্যমী রিপোর্টার বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টেইন ডেমোক্রেটিক পার্টির রাজনৈতিক সদর দপ্তরে একটি ছিঁচকে চুরির ঘটনার সূত্র ধরে মার্কিন রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়ো কেলেঙ্কারিটি উন্মোচন করেন। পুনর্নির্বাচিত হওয়ার জন্য মরিয়া তৎকালীন রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের অনুসারীরা তার জ্ঞাতসারে প্রতিপক্ষের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অবৈধভাবে প্রবেশ করে গোপন দলিলপত্রের ছবি তুলে আনে এবং আড়িপাতার যন্ত্র বসায়। ডিপ থ্রোট নামের অজ্ঞাতপরিচয় এক সূত্র ওই রিপোর্টারদের ঘটনাটির সঙ্গে প্রেসিডেন্টের সংশ্লিষ্টতার তথ্য সরবরাহ করে। এর ভিত্তিতে তারা অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক অসততার প্রমাণ তুলে ধরেন। পুনর্নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও অভিশংসনের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে প্রেসিডেন্ট মেয়াদপূর্তির আগে ১৯৭৪ সালে পদত্যাগে বাধ্য হন।

আশির দশকে ব্যক্তি-সাংবাদিকের বদলে সংবাদ প্রতিষ্ঠানগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিচিত নাম হয়ে ওঠে। বিশেষত ইউজিন রবার্টসের সম্পাদনায় ফেলাডেলফিয়া ইনকুয়ারার এবং বিল কোভাকের সম্পাদনায় আটলান্টা জার্নাল-কনস্টিটিউশন বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল। দুজন সম্পাদকই তাদের পত্রিকায় দক্ষ রিপোর্টারদের সমন্বয়ে অনুসন্ধানী টিম গঠন করেছিলেন।

করপোরেট-আধিপত্য ও সহযোগিতামূলক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

নব্বইয়ের দশকে সংবাদপত্রগুলো বেশিমাত্রায় করপোরেট রীতিনীতি অনুসরণ আর বিষয়বস্তুর চেয়ে মুনাফাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রবণতা দেখাতে শুরু করে। ফলে ব্যয়বহুল অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য বিনিয়োগ করার সদিচ্ছা হ্রাস পায়। একই সঙ্গে যোগাযোগ প্রযুক্তির অকল্পনীয় অগ্রগতি সনাতনী সংবাদমাধ্যমকে অর্থনৈতিকভাবে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছিল। বর্তমান সময়ের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তাই নেটওয়ার্ক যোগাযোগ ও প্রাযুক্তিক উদ্ভাবনকে পুঁজি করে এবং স্থান-কাল ভেদে সম্মিলিত উদ্যোগ নেওয়ার সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সহযোগিতামূলক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আজকের অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজের ক্ষেত্র আর ভৌগোলিক সীমানার বাঁধনে সংকুচিত নয়। বিভিন্ন দেশের একাধিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে অথবা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের অলাভজনক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে অসাধারণ সব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে।

গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক, ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম (আইসিআইজে), ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টারস অ্যান্ড এডিটরস ইনকরপোরেটেড, সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিংয়ের মতো সংগঠন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে খ্যাতিমান। ২০১৬ সালে আইসিআইজে এবং জার্মান সংবাদপত্র সাডডয়েচ জেইটাঙ্গ পানামাভিত্তিক আইনি প্রতিষ্ঠান মোসাক ফনসেকার প্রায় সোয়া কোটি গোপন দলিল বিশ্লেষণ করে ২০০ বিভিন্ন দেশের বর্তমান ও সাবেক রাষ্ট্রনায়ক, রাজনীতিবিদ, বিনোদন তারকা, ব্যবসায়ীর নানা ধরনের কর ফাঁকি ও অর্থ পাচারের ঘটনা উন্মোচন করে, যা পানামা পেপারস নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

২০০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উইকিলিকস মার্কিন সরকারের অতি গোপন নথি, ই-মেইলসহ বিভিন্ন ধরনের সংবেদনশীল তথ্য বিশ্বজুড়ে গণমাধ্যমের কাছে ফাঁস করে। স্পেনের এল পেইস, ফ্রান্সের লে মন্ড, জার্মানির ডার স্পিজেল, যুক্তরাজ্যের দ্য গার্ডিয়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকা এসব তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসাবে একযোগে প্রচার করে। জাতিসংঘের কর্মকর্তাদের ওপর নজরদারি, ইরাক ও আফগানিস্তানে বেসামরিক নাগরিক হত্যার সংখ্যা কমিয়ে দেখানো, কিউবার গুয়ানতেনামো বে কারাগারে বন্দি নির্যাতনের পদ্ধতি, সৌদি ও সিরীয় কূটনৈতিক কেবল, মার্কিন নিরাপত্তা সংস্থার ফরাসি প্রেসিডেন্টদের ওপর নজরদারি ইত্যাদি বিষয় এসব দলিলপত্র থেকে উঠে আসে। বিপুল পরিমাণ তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমগুলোর সহযোগিতামূলক রিপোর্টিংকে উৎসাহিত করার মধ্য দিয়ে উইকিলিকস অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: ইউরোপে

শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নয়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারাটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য ও স্ক্যান্ডিনেভিয়ার মতো দেশগুলোয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই বিক্ষিপ্তভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা শুরু হয়েছে, ষাটের দশকে এসে যা আরও জনপ্রিয় ও উৎকর্ষময় হয়ে উঠেছে। ব্রিটেনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস মধ্য ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু। আধুনিক সাংবাদিকতার মানদণ্ডে পলমল গেজেটের সম্পাদক ডব্লিউ টি স্টিড ব্রিটেনের প্রথম অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসাবে বিবেচিত হন। তিনি ১৮৮৫ সালে লন্ডনে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালিকাদের পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করার বিষয়টি তুলে ধরে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটেনে অফিশিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্টের কারণে জাতীয় নিরাপত্তা ইস্যু সংক্রান্ত অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে বিধিনিষেধ থাকলেও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়াদি নিয়ে প্রায়ই অনুসন্ধান হয়। ডেনমার্কেও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের উপস্থিতি দৃঢ়। ড্যানিশ অর্গানাইজেশন ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম এবং ড্যানিশ ইনস্টিটিউট ফর কম্পিউটার অ্যাসিসটেড রিপোর্টিং ১৯৯৯ সাল থেকে সাংবাদিক প্রশিক্ষণের কাজটি করে আসছে। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্রায়ণের পর সেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রতি উৎসাহ বৃদ্ধি পেলেও সংবাদপত্রের সীমিত স্বাধীনতার কারণে তা ততটা গতি লাভ করেনি। রাশিয়া ও সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের দেশগুলোয় সরকার এবং অপরাধীচক্র সাংবাদিকদের ওপর সমপরিমাণ বৈরী আচরণ করে থাকে। যদিও রাশিয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে শুরু হয়েছিল। কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস-এর বিচারে রাশিয়া সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ।

> “আজকের অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজের ক্ষেত্র আর ভৌগোলিক সীমানার বাঁধনে সংকুচিত নয়। বিভিন্ন দেশের একাধিক সংবাদ প্রতিষ্ঠানের যৌথ উদ্যোগে অথবা অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের অলাভজনক আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংগঠনের প্ল্যাটফরম ব্যবহার করে অসাধারণ সব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত হয়েছে”

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: আফ্রিকায়

আফ্রিকা মহাদেশে পঞ্চাশের দশক থেকে, বিশেষত দক্ষিণ আফ্রিকার ড্রাম ম্যাগাজিনে রাজনৈতিক ও সামাজিক অবিচার উন্মোচনকারী অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উপস্থিতি লক্ষণীয় হলেও সাধারণভাবে মনে করা হয়, ষাটের দশকে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে উত্তরণ এবং নব্বইয়ের দশকে কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানকালে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিকশিত হয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে আফ্রিকায় উদারীকরণের যে হাওয়া বইছিল, তাতে পুরো মহাদেশেই বেসরকারি মালিকানায় সংবাদপত্র গড়ে ওঠে, যেগুলো স্বাধীন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সহায়ক শক্তি হিসাবে ভূমিকা রেখেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবাদের অবসান; ঘানা, মোজাম্বিক ও নাইজেরিয়ার কর্তৃত্ববাদী শাসন থেকে মুক্তি ওই দেশগুলোয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পথ সুগম করেছিল। তবে প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নাইজেরীয় গণমাধ্যম সামরিক জান্তার রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে ভালোমানের অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দক্ষিণ আফ্রিকায়

'বিকল্প সংবাদপত্র'গুলো বর্ণবাদী সরকারের নৃশংসতার চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরেছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: লাতিন আমেরিকায়

লাতিন আমেরিকায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা সত্তরের দশক থেকে শুরু হয়েছে। স্বৈরতান্ত্রিক শাসনামলে আন্ডারগ্রাউন্ড গোপন সংবাদপত্রের মাধ্যমে এবং গণতান্ত্রিক শাসনামলে প্রান্তিক, মূলধারার বাইরের সংবাদপত্রগুলোয় এ ধরনের প্রতিবেদন স্থান পেত। তবে সাম্প্রতিক সময়ে মূলধারার সংবাদপত্র (যেগুলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার স্বার্থে সরকারের ভুল কাজকেও সচরাচর সমালোচনা করে না) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দিকে ঝুঁকছে। ব্রাজিলের প্রভাবশালী পত্রিকা ফোলহা দে সাওপাওলো, আর্জেন্টিনার ক্ল্যারিন, কলম্বিয়ার এল টিয়েমপো, পেরুর এল কমার্সিও এবং লা রিপাবলিকা এর উদাহরণ। মেক্সিকোর ইন্টার আমেরিকান প্রেস অ্যাসোসিয়েশন ও পিরিওডিস্টাস দি ইনভেস্টিগেশন এ অঞ্চলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিকাশে ভূমিকা রেখেছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: এশিয়ায়

এশিয়ার দেশগুলোয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস বিশ্বজনীন প্রবণতার অনুসারী। শাসনব্যবস্থার গণতন্ত্রায়ণের মাত্রাভেদে ভারত, ফিলিপাইন, চীন, বাংলাদেশের মতো দেশগুলোয় এ ধরনের সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত বা নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। ফিলিপাইনে নানা রকম দমন-নিপীড়নের পরও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি দৃঢ় ধারা বিদ্যমান। ফিলিপাইন সেন্টার ফর ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম এ অঞ্চলে উচ্চমানসম্পন্ন সাংবাদিকতার রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। সাবেক প্রেসিডেন্ট জোসেফ এস্ট্রাডার গোপন সম্পদ নিয়ে অন্বেষণমূলক সংবাদ প্রতিবেদনের কারণে তাকে অভিশংসনের সম্মুখীন হয়ে পদত্যাগ করতে হয়। চীন, জাপান, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়ার সরকার অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রতি যে মাত্রার সহিষ্ণুতাই দেখাক না কেন, উদ্যমী সাংবাদিকদের কলম তাতে বন্ধ হয়ে যায়নি। ২০১৬ সালে গণমাধ্যমে দুর্নীতির তথ্য উদ্ঘাটনের পর দক্ষিণ কোরীয় রাষ্ট্রপতি অভিশংসিত হন।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বৃহদায়তন গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ভারতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অবস্থা আগ্রহের বিষয়। সংবাদমাধ্যমের মালিকানার ধরন এবং বিজ্ঞাপনী আয়ের ওপর নির্ভরশীলতা স্ব-আরোপিত সেন্সরশিপকে উৎসাহিত করলেও ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে উল্লেখযোগ্য কিছু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নজির পাওয়া যায়। ১৯৮৭ সালে সুইডেনের বোফর্স কোম্পানির কাছ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র কেনার সময় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দলের নেতারা ঘুস গ্রহণ করেছেন–দ্য হিন্দু পত্রিকা অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই তথ্য উদ্ঘাটন করে আলোড়ন সৃষ্টি করে। পরবর্তী নির্বাচনে ভারতীয় কংগ্রেসের পরাজয়ের পেছনে এই ঘটনা ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করা হয়। তেহেলকা ম্যাগাজিন ২০০১ সালে প্রতিরক্ষা চুক্তিকালে ঘুস বিনিময়, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পত্রিকা ১৯৮১-তে সিমেন্টের কোটা বরাদ্দে অনিয়ম বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপে।

স্বাধীনতাপূর্ব সময়ে পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার শুরু। পাকিস্তানি আমলে সামাজিক অনাচার, প্রশাসনিক অনিয়ম, অর্থনৈতিক দুর্নীতি নিয়ে একক অথবা সিরিজ প্রতিবেদনের যথেষ্ট উদাহরণ রয়েছে। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলাদেশের প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার কৃতিত্ব দেওয়া হয় সাংবাদিক আবেদ খানকে। 'ওপেন সিক্রেট' শিরোনামে দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত এই সিরিজ প্রতিবেদনকে আমলে নিয়ে সরকার ইতিবাচক পদক্ষেপও নিয়েছিল (Rahman, 2014)। পরবর্তী দশকগুলোয় শাসনব্যবস্থার ধরন পরিবর্তনের সঙ্গে সংগতি রেখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারাটি কখনো বেগবান, কখনো ম্রিয়মাণ হয়েছে। সামরিক ও ছদ্মগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অবরুদ্ধ সংবাদপত্র গণতান্ত্রিক শাসনের খোলা হাওয়ায় বিকশিত হওয়ার চেষ্টা করেছে। গণমাধ্যম মালিকানার রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের ধারাবাহিক গণতন্ত্র চর্চার অনভিজ্ঞতার কারণে এই বিকাশের পথটি কুসুমাস্তীর্ণ হয়নি। ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন অনুমোদন ও স্বাধীন তথ্য কমিশন গঠন বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চর্চায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

দীর্ঘসময়ের পথপরিক্রমায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিশ্বের নানান দেশে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে উৎসাহিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করা, অপরাধজগতের চেহারা উন্মোচন, সুশীলসমাজকে শক্তিশালী করা, ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং সমাজ সংস্কারের পক্ষে জনসমর্থন তৈরিতে ভূমিকা রেখেছে। সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, সাধারণভাবে মূলধারার গণমাধ্যমে যাদের প্রবেশাধিকার সীমিত, তাদের কণ্ঠস্বর ছড়িয়ে দিয়েছে জনপরিসরে। বার্গের ভাষায়, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সাহায্য করেছে সরকারের পতন ঘটাতে, রাজনীতিবিদদের কারাগারে পাঠাতে, আইন প্রণয়ন, বিচারব্যবস্থার ব্যর্থতা উন্মোচন এবং করপোরেশনগুলোকে লজ্জা দিতে। এমনকি বর্তমান সময়েও গণমাধ্যমের একটি বড়ো অংশ যখন ক্ষমতাকেন্দ্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে এবং বিদ্বেষপূর্ণ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য আগেকার উঁচুমানের সংবাদমাধ্যমেরও মূল উপজীব্যে পরিণত হয়েছে, তখনো অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা ক্ষমতাহীন, বঞ্চিত, সত্যের পক্ষে দাঁড়াচ্ছে।' (Burgh, 2008, p. ii)

তথ্যসূত্র

1. Alexander, J., & Katz, S. N. (1972). *A Brief Narrative on the Case and Trial of John Peter Zenger, Printer of the New York Weekly Journal*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
2. Burgh, H. de. (2000). *Investigative Journalism: Context and Practice*. London, New York: Routledge.
3. Burgh, H. de. (2008). *Investigative Journalism*. Oxon: Routledge.
4. Carey, J. W. (2009). *Communication as Culture: Essays on Media and Society*. London, New York: Rouledge.
5. Chalaby, J. K. (1998). *The Invention of Journalism*. Houndsmills: Palgrave Macmillan.
6. Ettema, J. S., & Glasser, T. L. (1998). *Custodians of Conscience: Investigative Journalism and Public Virtue*. New York: Columbia University Press.
7. Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2014). *The Elements of Journalism: What News People Should Know and the Public Should Expect.* New York: Three Rivers Press.
8. Protess, D. L., Cook, D., Jack C. , Ettema, J. S. , Gordon, M. T. , Leff, D. R. , & Miller, P. (1991). *The Journalism of Outrage: Investigative Reporting and Agenda Building in America*. New York: The Guilford Press.
9. Rahman, G. M. (2014). Investigative Journalism in Bangladesh: Its Growth and Role in Social Responsibility, *DIU Journal of Humanities and Social Science*, Vol 2.

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

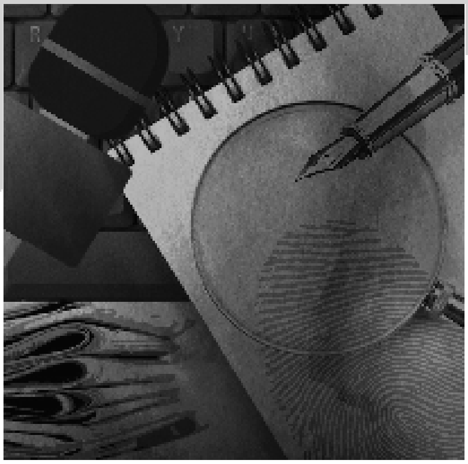

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস ও ধারণাগত ‘অপপ্রয়োগ’ অন্বেষণ

মাহামুদুল হক

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পঠনপাঠন ষাটের দশকে শুরু হলেও এর চর্চা বহু পুরোনো। তবে এখনো শ্রেণিকক্ষ, সংবাদকক্ষ, প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপ এমনকি গ্রন্থরাজিতেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারণা নিয়ে অপব্যাখ্যা ও অপপ্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে প্রশিক্ষণে এমনকি সংবাদক্ষেত্রেও ভ্রান্ত ধারণা লক্ষ করেছি। বেশকিছু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর প্রশিক্ষণ দিতে গিয়েও দেখেছি প্রশিক্ষক নিজেই প্রশিক্ষণ ওয়ার্কশপে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও ব্যাখ্যামূলক সাংবাদিকতাকে গুলিয়ে ফেলছেন। এমনকি বইপত্রেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে ভুলভাবে ধারণায়ন করতে দেখা যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারণাটি নিয়ে সাংবাদিকদের মধ্যে সংবাদক্ষেত্রে ধোঁয়াশা লক্ষ করেছি। এক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের পৃথক ‘অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইউনিট’ দেখেছি। ওই ইউনিটের মাধ্যমে যা প্রকাশিত হতো, আসলে তা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নয়–ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানের চর্চা ও ধারণার মধ্যে যে বিশাল গ্যাপ রয়েছে, তা লিনিয়াস বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুজো মিডিয়া ইনস্টিটিউটের এক পর্যবেক্ষণে প্রমাণ পাওয়া যায়। ফুজো মিডিয়া ইনস্টিটিউট বলেঃ ‘Investigative Journalism is poorly practiced in Bangladeshi media. Within our baseline, many example-reports provided to us from the media houses simply did not measure up to internationally accepted standards.’ বাংলাদেশের গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো যেসব

অনুসন্ধানী রিপোর্ট ফুজো মিডিয়া ইনস্টিটিউটকে পাঠিয়েছে তা বিশ্লেষণ করে ওই প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, প্রতিবেদনগুলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী হয়নি। বাংলাদেশে অনেক সাংবাদিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কার পান, অনুসন্ধানী অনেক হাতিয়ার ব্যবহার করেন; কিন্তু তা পরিপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। সব অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন হতে পারে; কিন্তু ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন কখনোই অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন নয়। দীর্ঘসময় ধরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারণা ও প্রয়োগ নিয়ে যে গ্যাপ তৈরি হয়েছে, এর সুরাহা প্রয়োজন–প্রয়োজন গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। তাই আলোচ্য নিবন্ধে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস বর্ণনার সঙ্গে এর ধারণাগত প্রয়োগ-অপপ্রয়োগের বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছি। কারণ ধারণাগত সমস্যা থাকলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পঠনপাঠন ও চর্চায় মান অর্জন অসম্ভব হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস

বাংলাদেশ নামক এ ভূখণ্ডে কখন-কোথায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শুরু হয়েছিল, তা নিয়ে কোনো গবেষণা বা ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ সেভাবে পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে তেমন কোনো আলোচনা বা লেখা-প্রকাশনা

“

বাংলাদেশে অনেক সাংবাদিক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কার পান, অনুসন্ধানী অনেক হাতিয়ার ব্যবহার করেন; কিন্তু তা পরিপূর্ণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়ে ওঠে না। অনেক ক্ষেত্রে তা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন

”

পাওয়া যায় না। ১৮৪৭ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা রংপুর (বর্তমান বদরগঞ্জ উপজেলার গোপালপুর) থেকে, যার নাম 'রঙ্গপুরবার্তাবহ'। তৎকালীন রংপুরের কুন্ডি পরগনার জমিদার কালীচরণ রায় চৌধুরীর অর্থায়নে প্রকাশিত হতো। গুরুচরণ রায় এর সম্পাদক ছিলেন। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় পরে পত্রিকাটির স্বত্ব কিনে নেন এবং তা 'বার্তাবহ যন্ত্রালয়' থেকে প্রতি মঙ্গলবার প্রকাশ করেন।

বাংলাপিডিয়ায় রঙ্গপুরবার্তাবহ পত্রিকাটির আধেয় সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'প্রাথমিক অবস্থায় রঙ্গপুরবার্তাবহ কলকাতার সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত সংবাদই বেশির ভাগ পরিবেশন করত। পরবর্তীকালে এটি স্থানীয় সংবাদ প্রকাশও শুরু করে। এ পত্রিকার এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগজুড়ে থাকত বাংলা গদ্যরীতি নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা। প্রাথমিক পর্যায়ে পত্রিকাটি ছিল সরকারঘেঁষা এবং ভূস্বামীদের প্রশংসা করা ছিল এর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে পত্রিকাটি বিদেশি শাসন এবং জনগণের ওপর এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সমালোচনামুখর হয়ে ওঠে।' মূলত পত্রিকাটি ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনাসহ জনগণের ইস্যু নিয়ে ব্যাখ্যামূলক ও অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে থাকে। এভাবেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রায়োগিক ক্ষেত্রটির বীজ রোপিত হয় রংপুরে, এই বাংলাদেশে।

অনুসন্ধানী ও বিশ্লেষণী লেখালেখির জন্য রঙ্গপুরবার্তাবহ ব্রিটিশ সরকারের কোপানলে পড়ে। ১৮৫৭ সালের ১৩ জুন গভর্নর লর্ড ক্যানিং ১৫নং আইন জারি করে পাঠান। এই আইন প্রয়োগের ফলে প্রথম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মৃত্যু হয়। ১৮৫৯ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয় 'রঙ্গপুরবার্তাবহ'। বাংলাদেশ অংশের দ্বিতীয় বাংলা সংবাদপত্রটিও রংপুর থেকে ১৮৬০ সালে প্রকাশিত হয় 'রঙ্গপুর দিক প্রকাশ' নামে। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্মই হয় রংপুরে। যদিও গণমাধ্যম বিশেষজ্ঞ ড. গোলাম রহমান অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস তুলে ধরতে গিয়ে পঞ্চাশের দশককে এর শুরু বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু রঙ্গপুরবার্তাবহ পত্রিকার আধেয় বিবেচনায় নিলে ড. গোলাম রহমানের এ তথ্য সঠিক বলে সিদ্ধান্ত দেওয়া যায় না। তিনি বলেছেন, '১৯৭১ সালে স্বাধীনতার অনেক আগে পঞ্চাশের দশক থেকে বাংলাদেশের এই অঞ্চলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শুরু হয়।' (Rahman, 2014)। তিনি এই তথ্যের সমর্থনে বলেন, দৈনিক আজাদের মোজাম্মেল হক, অবজারভারের ওয়াহেদুল হক, দৈনিক ইত্তেফাকের আবদুল মান্নান, শহিদুল আলম, সিরাজুদ্দীন হোসেন, সংবাদের তোয়াব খান, এসএমএম আলী পাকিস্তানের লাহোরে অনুষ্ঠিত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাবিষয়ক একটি সেমিনারে অংশ নেন। এ জাতীয় সেমিনারে অংশগ্রহণ করার আগ্রহ ও উদ্দীপনা সম্ভবত অনুসন্ধানমূলক রিপোর্টিংকে ত্বরান্বিত করে (Rahman, 2014)। ১৯৬০-৬২-এ সলিমুল্লাহর যৌনকর্মীদের নিয়ে 'নিষিদ্ধ পল্লীর কাহিনী', শহীদুল হকের কমিশন রিপোর্ট নিয়ে 'কমিশন অন কমিশন', আক্তার উদ্দিনের 'গম চুরি' প্রভৃতি সিরিজ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের উল্লেখ করেন তিনি। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর প্রথম অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসাবে আবেদ খানের 'ওপেন সিক্রেট'-এর উল্লেখ করেন ড. গোলাম রহমান। প্রকাশিত হতো তখনকার সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক ইত্তেফাকে। এ প্রসঙ্গে আবেদ খান বলেন, 'ওই সময়ের অনিয়ম-দুর্নীতি, চোরাচালান প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধানী রিপোর্ট ইত্তেফাকের প্রথম পৃষ্ঠায় প্রতিদিন প্রকাশিত হতো ১৯৭২ সাল থেকে; কিন্তু ১৯৭৫-এর পর দুইবার 'ওপেন সিক্রেট' প্রকাশ বন্ধ করে দেওয়া হয়। একবার বন্ধ করা হয় মেজর ডালিমের বাসায় বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রবিষয়ক রিপোর্ট করার জন্য।'

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী রিপোর্ট যে হয় না তা নয়। প্রতিবছর বিভিন্ন সংগঠন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর সাংবাদিকদের অ্যাওয়ার্ড দেয়। তবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কারপ্রাপ্ত এসব রিপোর্টের অনেকগুলো 'বিশেষ রিপোর্ট' বা ব্যাখ্যামূলক রিপোর্ট–মানদণ্ড অনুযায়ী অনুসন্ধানী রিপোর্ট নয়। খান ও রাজী (১৯৯৬) অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর এক গবেষণায় দেখিয়েছেন এক মাসে ৫৮টি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাদের গবেষণার অধীনে নির্বাচিত সংবাদপত্র থেকে। এর মধ্যে ৪০টি জাতীয় বা নগরের বিষয়ে এবং ১৮টি স্থানীয় বা গ্রামীণ এলাকার বিষয়ে। এখন কথা হলো–এক মাসেই যদি ৫৮টি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তা অবশ্যই আশ্চর্য হওয়ার কথা, ভালো কথা। কেননা, বাংলাদেশে এখন সংবাদপত্রে সংখ্যাধিক্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও সারা বছরে ৫৮টি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রকাশিত হয় বলে আমার মনে হয় না। বিষয়টি গভীরতর অনুসন্ধান বা পর্যালোচনার দাবি রাখে। আসলে অনুসন্ধানী রিপোর্ট ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টের মধ্যে ধারণাগত পার্থক্য বিবেচনায় না নেওয়ার কারণেই এমনটি ঘটেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

অনুসন্ধানের ধরন নিয়েও ধোঁয়াশা!

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার অনুসন্ধান, গবেষকের অনুসন্ধান ও সরকারের বিভিন্ন সংস্থার অনুসন্ধান বা তদন্তকে ধারণাগতভাবে অনেক সময় এক করে গুলিয়ে ফেলা হয়। উদ্দেশ্য, পরিস্থিতি ও কর্মক্ষেত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানের মধ্যে রকমফের রয়েছে। আবার সাংবাদিকতার সব অনুসন্ধানই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়।

কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার অনুসন্ধান হচ্ছে তদন্ত (Probe)। যেমন, কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করে ওই ঘটনার অনুসন্ধান করা হচ্ছে তদন্ত। তদন্ত হচ্ছে কোনো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান। এসব তদন্ত নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে হতে পারে বা অভিযোগ ছাড়াও কোনো ক্লুর ভিত্তিতে বা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হতে পারে। আবার কোনো সমস্যা সমাধানে বা কোনো বিষয়ে কোনো সন্দেহের উদ্রেক হলে ওই বিষয়ে আন্তঃবিভাগীয় অনুসন্ধানও হচ্ছে তদন্ত, যার ইংরেজি Inquiry। সাধারণত সরকারের কোনো বিভাগ বা কমিটি এ ধরনের তদন্ত করে থাকে আন্তঃবিভাগীয় বিষয়ের বা ঘটনার ক্ষেত্রে। এসব তদন্তই অনুসন্ধান। আবার পুলিশ কোনো অপরাধ সংঘটিত হলে তা অনুসন্ধান বা তদন্ত করে।

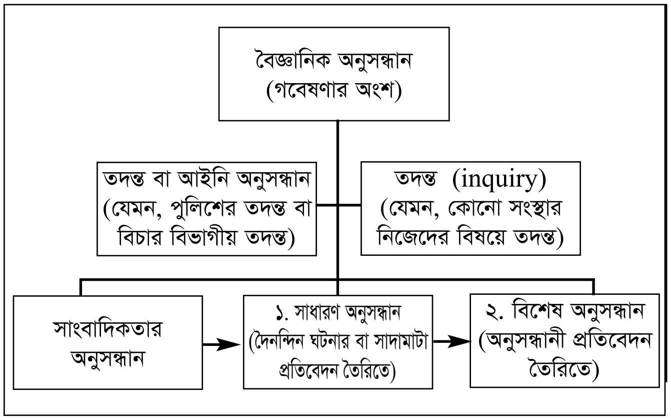

চিত্র: অনুসন্ধানের রকমফের

একজন গবেষকও অনুসন্ধান করেন। গবেষকের বা গবেষণার জন্য অনুসন্ধান পদ্ধতিগত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। এখানে গবেষক তার গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে পদ্ধতিগত অনুসন্ধানকর্ম পরিচালনা করেন।

সাংবাদিকতায় বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধান করে তথ্য সংগ্রহ করে সংবাদ লেখা হয়; কিন্তু সব অনুসন্ধানই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়। যেমন- সড়ক দুর্ঘটনা ঘটল। একজন সাংবাদিকের জন্য তথ্য অনুসন্ধান করে ঘটনার পুরো বিবরণী লিখে প্রতিবেদন করলে তা সাধারণ অনুসন্ধান, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বুঝতে হলে কোনটা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয় তা বুঝতে হবে। কারণ সব রিপোর্টিংয়ের জন্যই অনুসন্ধান করা হয়। এ প্রসঙ্গে Coronel (2009) বলেন, "It is said that all reporting is investigative. After all, journalists routinely dig for facts. They ask questions. They get information. They 'investigate'." প্রতিদিনই একজন সাংবাদিক তথ্য অনুসন্ধান করেন; কিন্তু তা সব সময় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পরিকল্পনামাফিক এক বিশেষ ধরনের অনুসন্ধান। 'অনুসন্ধান' শব্দের আভিধানিক অর্থই হলো পদ্ধতিগত অনুসন্ধান, যা একদিন বা দুইদিনে করা যায় না; একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের জন্য সময় দরকার হয় (কাপালান, ২০১৩)।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারণাগত বিশ্লেষণ

এই অংশে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারণাগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বিশ্লেষণের একক হিসাবে একটি গ্রন্থের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধারণাকে কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে, তা উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, পুরো গ্রন্থ আলোচনা করা হয়নি।

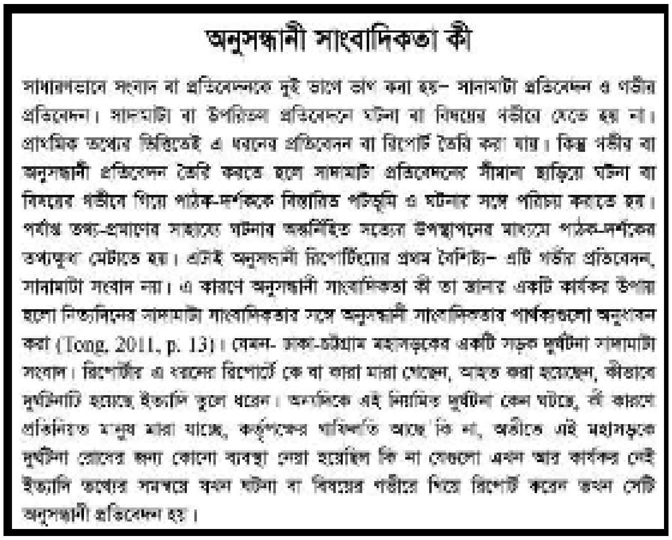

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী

সাধারণভাবে সংবাদ বা প্রতিবেদনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়– সাদামাটা প্রতিবেদন ও গভীর প্রতিবেদন। সাদামাটা বা উপরিতল প্রতিবেদনে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে যেতে হয় না। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই এ ধরনের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করা যায়। কিন্তু গভীর বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে সাদামাটা প্রতিবেদনের সীমানা ছাড়িয়ে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে পাঠক-দর্শককে বিস্তারিত পটভূমি ও ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়। পর্যাপ্ত তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যের উপস্থাপনের মাধ্যমে পাঠক-দর্শকের তথ্যক্ষুধা মেটাতে হয়। এটিই অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের প্রধান বৈশিষ্ট্য– এটি গভীর প্রতিবেদন, সাদামাটা সংবাদ নয়। এ কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী তা জানার একটি কার্যকর উপায় হলো নিত্যদিনের সাদামাটা সাংবাদিকতার সঙ্গে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পার্থক্যগুলো অনুধাবন করা (Tong, 2011, p. 13)। যেমন- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একটি সড়ক দুর্ঘটনা সাদামাটা সংবাদ। রিপোর্টার এ ধরনের রিপোর্টে কে বা কারা মারা গেছেন, আহত করা হয়েছেন, কীভাবে দুর্ঘটনাটি হয়েছে ইত্যাদি তুলে ধরেন। অন্যদিকে এই নিয়মিত দুর্ঘটনা কেন ঘটছে, কী কারণে প্রতিনিয়ত মানুষ মারা যাচ্ছে, কর্তৃপক্ষের গাফিলতি আছে কি না, অতীতে এই মহাসড়কে দুর্ঘটনা রোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল কি না সেগুলো এখন আর কার্যকর নেই ইত্যাদি তথ্যের সমন্বয়ে যখন ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে রিপোর্ট করেন তখন সেটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হয়।

চিত্র: চৌধুরী (২০১৯)-এর গ্রন্থ থেকে বিশ্লেষণের জন্য হুবহু ইমেজ নেওয়া হয়েছে। এই অংশটি কোনোভাবেই লেখকের নয়। শুধু বিশ্লেষণের জন্য ওই গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১০ থেকে এ অংশটি নেওয়া হয়েছে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণায়ন বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মূলত গভীরতর প্রতিবেদনের আরেক ধরন 'ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন'-এর ধারণায়নের ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

উপরের চিত্রটি একটি গ্রন্থের পৃষ্ঠার (চৌধুরী, ২০১৯)। গ্রন্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিতার ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একক ও সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা পাওয়া না গেলেও এর ধারণাগত স্পষ্টতা রয়েছে। ওই গ্রন্থে প্রতিবেদনকে সাদামাটা প্রতিবেদন এবং গভীরতর প্রতিবেদন–এই দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু গভীরতর প্রতিবেদন যে দুই প্রকার–অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন, সেটি উল্লেখ করা হয়নি। সমস্যা এখানেই। কারণ, এ দুই প্রতিবেদনকে একসঙ্গে গুলিয়ে ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসাবে চালিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে: 'সাধারণভাবে সংবাদ বা প্রতিবেদনকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়–সাদামাটা প্রতিবেদন ও গভীর প্রতিবেদন। সাদামাটা বা উপরিতল প্রতিবেদনে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে যেতে হয় না। প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতেই এ ধরনের প্রতিবেদন বা রিপোর্ট তৈরি করা যায়। কিন্তু গভীর বা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে হলে সাদামাটা প্রতিবেদনের সীমানা ছাড়িয়ে ঘটনা বা বিষয়ের গভীরে গিয়ে পাঠক-দর্শককে বিস্তারিত পটভূমি ও ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়।' 'বিস্তারিত পটভূমি ও ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করাতে হয়'–এই বর্ণনা যায় গভীরতর প্রতিবেদনের আরেকটি ধরন ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন ধারণায়নের ক্ষেত্রে। গ্রন্থটিতে যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হিসাবে সড়ক দুর্ঘটনার রোধের ব্যাপারে পটভূমিগত তথ্যের সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে, তা-ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা অনুসন্ধানী

প্রতিবেদনের উদাহরণ হতে পারে না। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও পটভূমিগত তথ্য থাকতে পারে; কিন্তু তা অনুসন্ধানের মূল তথ্য হিসাবে নয়। কারণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত তথ্য (যা লুক্কায়িত ছিল) নিয়ে প্রতিবেদনই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। ব্যাখ্যা বা বিশ্লেষণের জন্য যখন ঘটনা ও তার পটভূমিকে তলিয়ে দেখা হয়, তখন তা ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন। যখন নির্দিষ্ট ক্লু (Clue)-এর ওপর নির্ভর করে পরিকল্পিতভাবে বিষয়টি আরও গভীরতর তলিয়ে দেখে ওই ক্লুর ভিত্তিতে লুক্কায়িত তথ্য উদ্‌ঘাটন করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়, তখন তা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। আমি মনে করি, Clue is the heart and the start of an investigative report. ক্লু-এর ভিত্তিতে লুক্কায়িত তথ্য উদ্‌ঘাটন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মূলমন্ত্র। ইউনেস্কোর অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংজ্ঞায় লুক্কায়িত তথ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'Investigative Journalism means the unveiling of matters that are concealed either deliberately by someone in a position of power, or accidentally, behind a chaotic mass of facts and circumstances - and the analysis and exposure of all relevant facts to the public.' আসলে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের মধ্যে পার্থক্যটা না বোঝার কারণেই ধারণাগত অস্পষ্টতা তৈরি হয়েছে সব ক্ষেত্রে। এজন্য নিচে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

অনুসন্ধানী রিপোর্টিং	ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং
ক্লু বা অনুমিতির (clue or hypothesis) মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত গভীরতর অনুসন্ধানমূলক তথ্যের সন্নিবেশ থাকে	গভীরতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক তথ্যের সন্নিবেশ থাকে, ক্লু বা অনুমিতির মাধ্যমে শুরু হয় না
পটভূমি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সহায়ক, মুখ্য নয়	ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণই মুখ্য
অতিমাত্রায় পরিকল্পনানির্ভর, পদ্ধতিগত ও লক্ষ্যাভিমুখী	অতিমাত্রায় পরিকল্পনানির্ভর, পদ্ধতিগত ও লক্ষ্যাভিমুখী নয়
লুক্কায়িত ও অজানা তথ্য বা ঘটনা উদ্‌ঘাটন	জানা-অজানা তথ্যের সন্নিবেশ
সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও বাধাসংকুল	সময়সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল ও বাধাসংকুল নয়
অনুসন্ধানই মূল চাবি	অনুসন্ধান সহায়ক মাত্র, ব্যাখ্যাই চাবি
অনুসন্ধানকৃত তথ্য সুনির্দিষ্ট	তথ্য সুনির্দিষ্ট নয়, অনেক তথ্য সন্নিবেশিত
বক্তব্যনির্ভর নয়, অনুসন্ধানকৃত তথ্যনির্ভর	ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে সংশ্লিষ্ট সূত্রের বক্তব্যনির্ভর
ঝুঁকিপূর্ণ ও প্রতিপক্ষকেন্দ্রিক	সাধারণত ঝুঁকিহীন ও প্রতিপক্ষহীন
ঘটনা, পরিস্থিতি ও বিষয়কে গভীরতরভাবে অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটন করা হয়	ঘটনা, পরিস্থিতি ও বিষয়কে গভীরতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়
বুদ্ধিবৃত্তিক, কৌশলগত ও দক্ষতানির্ভর প্রক্রিয়া	ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণমূলক প্রক্রিয়া
লুক্কায়িত তথ্য উদ্‌ঘাটন করে যৌক্তিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক	ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণগত তথ্যের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণমূলক
আবেগের স্থান নেই	ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে আবেগ থাকতে পারে
বিশেষ অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া	সাধারণ অনুসন্ধানমূলক প্রক্রিয়া
লিক জার্নালিজম বা পাপারাজ্জি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়, তবে ফাঁসকৃত নথিপত্র দিয়ে অনুসন্ধান শুরু হতে পারে। 'An investigation can begin from a leak, but journalists must do their own digging, verify information and provide context (Cononel, 2009).'	লিক জার্নালিজমও ব্যাখ্যামূলক হতে পারে, তবে অবশ্যই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ যুক্ত করতে হবে
দৈনন্দিন রিপোর্টিং নয় বরং ওয়াচডগ সাংবাদিকতা, জনস্বার্থে অনিয়ম-দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন এবং ক্ষমতাবানদের জবাবদিহিতা তৈরির হাতিয়ার (Cononel, 2009).	দৈনন্দিন রিপোর্টিংয়ের চেয়ে গভীরতর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা হয়
ঘটনার পুরো প্রক্রিয়া খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গভীরে তলিয়ে দেখা হয়	ঘটনার গভীরে প্রবেশ করা হয়; কিন্তু খুঁটিয়ে না দেখে বরং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়
প্রতিবেদন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, লক্ষ্য অর্জনের একটা উদ্দেশ্য থাকে। কোনো একটা বিষয় ভুল বা সত্য প্রমাণ করার জন্যই অনুসন্ধান করা হয়	তথ্য জানানোর জন্য প্রতিবেদন করাই উদ্দেশ্য থাকে
অনুসন্ধানকৃত তথ্যের পরিবেশন অতি সতর্কতার সঙ্গে করতে হয়	যে কোনো প্রতিবেদন রচনায় ন্যূনতম সতর্কতার প্রয়োজন পড়ে, ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও তাই
অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত চূড়ান্ত তথ্য দিয়েই প্রতিবেদন সূচনা করা যায়	গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে কোনো তথ্য দিয়ে যে কোনো দৃষ্টিকোণ (অ্যাঙ্গেল) থেকে সূচনা করা যায়

পরিশেষে বলা যায়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ইতিহাস রচনায় যে ধরনের তথ্য যাচাই-বাছাই ও গবেষণা করার প্রয়োজন হয়, সেই কাজটি হয়নি বলেই আজও এই বিশেষ ধরনের সাংবাদিকতার ইতিহাস রচিত হয়নি। এজন্য গবেষণা ও যথাযথভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা দরকার। বাংলাদেশে প্রায় দুই ডজন উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাংবাদিকতার পঠনপাঠন হচ্ছে; কিন্তু তা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তত্ত্বগত। আবার দেশে অনেক প্রতিষ্ঠিত গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান রয়েছে; কিন্তু ধারণাগত দিক দিয়ে এখনো পিছিয়ে রয়েছে। এজন্য একাডেমি-ইন্ডাস্ট্রি সমন্বয় প্রয়োজন। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এক্ষেত্রে সেতুবন্ধ তৈরির কাজটি করতে পারে। প্রতিষ্ঠানটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ আরও নিবিড়ভাবে পরিচালনা করতে পারে যাতে বিশেষ এ সাংবাদিকতার বিদ্যমান ধারণাগত গ্যাপ মেরামত করা সম্ভব হয়।

তথ্যসূত্র

১. Kaplan, David E (2013). Global Investigative Journalism: Strategies, Center for International Media Assistance.

২. Coronel, Sheila S. (2009). *Digging Deeper: A Guide for Investigative Journalists in the Balkans,Balkan Investigative Reporting Network, Kesovo.*

৩. Rahman, Golam (2014). Investigative Journalism in Bangladesh: Its Growth and Role in Social Responsibility, DIU Journal of Humanities and Social Science, Vol 2.

৪. Khan, Nayeemul Islam and Kh. Ali Ar Raji, (1996) Investigative Journalism (Bengali), Dhaka,

৫. চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম (২০১৯). অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন, এমআরডিআই, ঢাকা।

৬. খান, নাঈমুল ইসলাম ও রাজী, আলী আর (১৯৯৬). অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ঢাকা।

লেখক: শিক্ষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

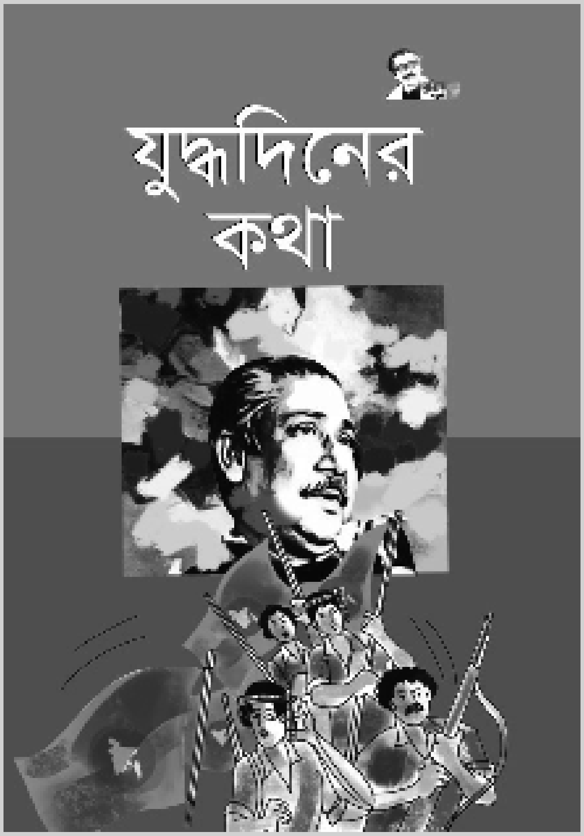

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

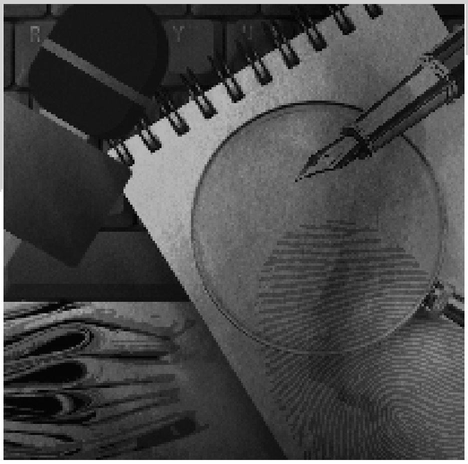

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কলাকৌশল ও স্বরূপ

মামুন অর রশিদ

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে পদ্ধতিগত গবেষণার মাধ্যমে সম্পূর্ণ নতুন তথ্য খুঁজে বের করাই (যা জনসাধারণের কাছে অজানা/গোপন ছিল) মূলত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সাধারণত রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা ব্যক্তিপর্যায়ে বিভিন্ন অন্যায়-অবৈধ-অনৈতিক কর্মকাণ্ড ও দুর্নীতিকে কেন্দ্র করেই করা হয়। অর্থাৎ, এর মাধ্যমে দেশ-সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করা ঘটে যাওয়া গোপন অপরাধের অনুসন্ধান করা হয়। ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কোনো একক ও সর্বসম্মত সংজ্ঞা পাওয়া মুশকিল। তবে পেশাদার সাংবাদিকরা এর মূল উপাদান নিয়ে মোটামুটি একমত–ইউরোপের পদ্ধতি বা পরিকল্পনামাফিক (সিস্টেম্যাটিক) অনুসন্ধান, গভীর (ইন-ডেপথ) ও মৌলিক গবেষণা এবং গোপন তথ্য উন্মোচন। অনেকে আবার মনে করেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ব্যাপকভাবে উন্মুক্ত তথ্য (পাবলিক ডেটা) ও নথিপত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং এ ধরনের প্রতিবেদনের মূল বিবেচ্য থাকে সামাজিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Investigative Reporting’। এই Investigative শব্দটি ইতালীয় শব্দ ‘Investigare’ শব্দ থেকে এসেছে, যার মূল হলো লাতিন শব্দ Vestigium। ‘Vestigium’-এর অর্থ হলো পদচিহ্ন (Footprint) আর Reporting শব্দটি লাতিন শব্দ

Reportare থেকে উৎপত্তি, যার অর্থ কোথাও থেকে কিছু বের করে আনা। অর্থাৎ, ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলতে পদচিহ্ন অনুসরণ করে গোপন কোনো কিছু উদ্‌ঘাটন করাকেই বোঝায়। অনুশীলনকারীরা একে প্রায়ই 'ওয়াচডগ রিপোর্টিং' বা 'অ্যাকাউন্টিবিলিটি রিপোর্টিং' বলে থাকেন। সোর্সের ওপর নির্ভর করা, একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে তাকে পরখ করে দেখা এবং সবশেষে নিখুঁতভাবে সত্যতা যাচাই করা। এটি এমন এক ধরনের শিল্প, যা মুঠোয় আনতে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর চেষ্টা বা গবেষণা করে যেতে হয়।

ইউনেস্কোর সংজ্ঞাটিও অনেকেই উল্লেখ করে থাকেন। ইউনেস্কো তার প্রকাশনা 'স্টোরি বেজড ইনকোয়ারি' নামের এক হ্যান্ডবুকে বলছে, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে; কখনো হয়তো বা বিপুল ও বিশৃঙ্খলভাবে ছড়িয়ে থাকা তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্য ও গোপনে নানা উৎস (সোর্স) ব্যবহার করতে হয়, ঘাঁটতে হয় নানা ধরনের নথিপত্র।' আবার ডাচ-ফ্লেমিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সংঘ ভিভিওজের সংজ্ঞায়, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বলতে সেসব প্রতিবেদনকে বোঝায়, যেগুলো 'বিশ্লেষণাত্মক এবং কোনো একটি বিষয়কে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে।'

কোনো কোনো সাংবাদিক আবার মনে করেন, সব রিপোর্টিংই অনুসন্ধানমূলক। এই দাবির পেছনে খানিকটা সত্য রয়েছে। বিট সাংবাদিকরা, যারা বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে কাজ করেন অথবা অনুসন্ধানী টিমের সদস্যরা, যারা কয়েক সপ্তাহ ধরে একটা স্টোরি করেন, উভয় পক্ষই অনেকাংশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কৌশল ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এর চেয়ে ব্যাপক। এতে সুনির্দিষ্ট কিছু প্রণালি অনুসরণ করতে হয়। এটি এমন এক ধরনের শিল্প, যা মুঠোয় আনতে বছরের পর বছর চেষ্টা করে যেতে হয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পাওয়া প্রতিবেদনগুলো দেখলেই বোঝা যায়, কত ব্যাপক গবেষণা আর কঠোর শ্রম এর পেছনে ব্যয় করা হয়েছে। কঠিন একাগ্রতা আর বিষয়ের গভীরে যাওয়ার নিষ্ঠা আছে বলেই এই স্টোরিগুলো জনগণের সম্পদ লুট, পরিবেশ বিপর্যয়, ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বাস্থ্যসেবার করুণ দশা প্রভৃতি বিষয় এত জোরালোভাবে তুলে ধরা যায়।

সাধারণত অনুসন্ধানী সংবাদের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখি, তা হলো:

১. **বেআইনি তথ্য ফাঁস ও তুলে ধরা:** সাধারণত একটি ঘটনার কারণগুলো তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায় না। অনুসন্ধানী সংবাদ সেই কারণগুলো তুলে ধরে।

২. **জনস্বার্থ সংরক্ষণ:** এ ধরনের সংবাদ সাধারণত জনস্বার্থে তৈরি করা হয়। কারণ এর ফলে ক্ষমতাশালী ব্যক্তি, সর্বোত্তম ব্যবহারের বাধাগুলো স্পষ্ট হয় এবং এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয়। ফলে বিরাট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৩. **প্রমাণনির্ভর:** অনুসন্ধানী সংবাদ তৈরির প্রয়োজনে একজন সাংবাদিককে বিভিন্ন তথ্যসূত্রের কাছে যেতে হয় এবং বিভিন্নভাবে তথ্য ও প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়। ফলে অনুমাননির্ভর কোনো আলোচনা বা মতামত এতে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ নেই।

৪. **ঝুঁকিপূর্ণ:** এ ধরনের সংবাদে বিভিন্ন দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, অপরাধ বিষয়ে নানা তথ্যপ্রমাণ সংগৃহীত ও পরিবেশিত হয়। ফলে যাদের বিরুদ্ধে লেখা হয়, তারা সাংবাদিককে বিভিন্ন ধরনের হুমকি ও নির্যাতন করতে পারে। ফলে সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যম উভয়ই একটি ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকে।

৫. **ব্যয়বহুল ও পরিশ্রমসাধ্য:** এ ধরনের সংবাদ তৈরি করতে বেশ সময় লাগতে পারে। এ কারণে এতে ব্যয় যেমন বাড়ে, অন্যদিকে প্রতিটি বিষয় যাচাই করার জন্য বেশ দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করতে হয়।

৬. **গণমাধ্যমের প্রতি আস্থা বাড়ায়:** এ ধরনের সংবাদ যে গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়, সেই গণমাধ্যমের প্রতি জনগণ আস্থা প্রকাশ করে বা বিশ্বাস স্থাপন করে। ফলে গণমাধ্যমটির কর্মকাণ্ডের প্রতি জনগণের সমর্থন প্রকাশিত হয়।

৭. অনুসন্ধানী সংবাদ সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামী ভূমিকা পালন করে থাকে।

সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

সংবাদপত্র তথা ছাপামাধ্যমে অনুসন্ধানী সংবাদ উপস্থাপনের কিছু নির্দিষ্ট প্রথা আছে। নির্দিষ্ট সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিক নির্ধারিত কাজ হিসাবে অথবা ঘটনাক্রমে কোনো গোপন তথ্যের অনুমান করেন এবং অনুসন্ধানের পরিকল্পনা তৈরি করেন। সেই অনুযায়ী তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ-সমন্বয় করতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে সেখান থেকে যদি নতুন কোনো তথ্য বেরিয়ে আসে তবে তা পত্রিকা অফিসে রিপোর্ট হিসাবে পাঠানো হয়। পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও সম্পাদক পরবর্তী কাজ করে এটিকে প্রকাশযোগ্য করেন। অনুসন্ধানী সংবাদের ক্ষেত্রে রিপোর্টারের সংগৃহীত ফুটেজ, রেকর্ড প্রমাণস্বরূপ সংগ্রহে রাখা হয়, তবে ছাপামাধ্যমে তা প্রকাশের সুযোগ নেই। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কার্যপ্রক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মূলত প্রয়োজন কারিগরি দক্ষতা, ভালো যোগাযোগ, গভীর গবেষণা ও সাহস। এ ধরনের স্টোরির জন্য রিপোর্টারকে তার সূত্র সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে এবং যতটা সম্ভব বিস্তারিত তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে এগোতে হবে।

গবেষণা

কোনো অনুসন্ধানের প্রথম পদক্ষেপ হচ্ছে গভীর গবেষণার মাধ্যমে শক্ত ভিত্তি তৈরি করা। যতজন লোকের সঙ্গে যত বিস্তারিতভাবে কথা বলা সম্ভব, আপনাকে সেটা করতে হবে। কাজটা কঠিন, অনেক পরিশ্রম করতে হয়, অনেক সময় ব্যয় করতে হয়, অনেক অর্থ-সরঞ্জামের প্রয়োজন; কিন্তু স্টোরিটা ঠিকমতো করার জন্য আর অন্য কোনো পথ নেই। এভাবেই আপনি সবদিকের মতামত, দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসতে পারবেন।

গোপনীয়তা

যারা গল্পের মূল কেন্দ্রের সবচেয়ে কাছে, তারা খোলাখুলি কথা বলতে সবচেয়ে কম আগ্রহ দেখান। তবে সেটাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাহলে আপনি কীভাবে এরকম দোদুল্যমান সূত্রের সঙ্গে কাজ করা যায়, যারা শুধু অফ দ্য রেকর্ড কথা বলতে চায়? এ ধরনের আলোচনার শুরুতেই শর্তাবলি পরীক্ষা করে দেওয়া উচিত, যাতে সূত্র সম্পূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়। আর অফ দ্য রেকর্ড আলোচনার আসল অর্থ কী? এর মানে, আপনি আপনার প্রতিবেদনে তাদের নাম উল্লেখ করবেন না। অর্থাৎ আপনি তাদের পরিচয় অন্য লোকের কাছে প্রকাশ করবেন না। আরও দু-একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রচুর নোট নেবেন এবং নিশ্চিত

করবেন যে আপনার কাছে সব সূত্রের ই-মেইল, বাসার ঠিকানা এবং মোবাইল ফোন নম্বর রয়েছে।

পিচিং

কোনো কোনো সম্পাদকের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে কম আগ্রহ থাকে। এ ধরনের কাজ সময় নেয় এবং প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। আদৌ কোনো স্টোরি বের হবে কি না, তা নিয়ে কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর মানহানির মামলার আশঙ্কা থাকলে সম্পাদক অন্য কোনো স্টোরি কমিশন করতে পারেন, যেটা নিয়ে বিতর্কের আশঙ্কা কম। সেক্ষেত্রে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। যত তথ্যপ্রমাণ এবং বিস্তারিত তথ্য জোগাড় করা সম্ভব, তা জোগাড় করতে হবে। আপনাকে তথ্যের একটি দলিল তৈরি করতে হবে–শুধু এখানে কিছু একটা ঘটছে বা বিষয়টির মধ্যে কোনো গণ্ডগোল আছে বললেই চলবে না। বিশ্বাসযোগ্য করার জন্য অনেক ক্ষেত্রেই বাংলাদেশে সোর্সকে প্রকাশ্যে দেখতে পাই, যা পরবর্তী সময়ে তার জন্য সমস্যা বয়ে আনে। যদিও কিছু অনুষ্ঠান পরিচালক সোর্সকে পর্যাপ্ত গোপন রাখেন। কিন্তু পলিসি ভিন্নতার কারণে অনেকেই গোপনীয়তা বজায় রাখেন না। রাজনৈতিক যোগসাজশ ও সেন্সরের কারণে অনেক সময়ই সঠিক তথ্য মানুষের কাছে পৌঁছায় না। তাছাড়া অনুষ্ঠানের দায়িত্বে থাকা টিম ও সম্পাদক কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিদের চাপ থাকতে পারে।

> “অর্থাৎ, ব্যুৎপত্তিগত দিক থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বলতে পদচিহ্ন অনুসরণ করে গোপন কোনো কিছু উদ্‌ঘাটন করাকেই বোঝায়। অনুশীলনকারীরা একে প্রায়ই ‘ওয়াচডগ রিপোর্টিং’ বা ‘অ্যাকাউন্টিবিলিটি রিপোর্টিং’ বলে থাকেন”

অনুসন্ধানী সংবাদ লেখার কৌশল

একজন সাংবাদিককে একটি অনুসন্ধানী সংবাদ তৈরি করার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় অনুসরণ করা প্রয়োজন।

১. রিপোর্টটি উলটা পিরামিড কাঠামোয় লিখতে হবে অর্থাৎ, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মূল তথ্যকে সংবাদসূচনায় ব্যবহার করতে হবে। এরপর পর্যায়ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও অন্যান্য তথ্য দিতে হবে।
২. রিপোর্টে কোনো প্রকার অতিকথন বা অতিরঞ্জনের সুযোগ নেই। তাই ইনিয়ে-বিনিয়ে না লিখে সোজাসুজি যেসব তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে, তা উপস্থাপন করতে হবে।
৩. তথ্য উপস্থাপনের জন্য সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে। পাশাপাশি তথ্য বেশি সংগৃহীত হলে তা একটি মাত্র সংবাদকাহিনিতে তা প্রকাশ না করে কয়েকটি ভাগে প্রকাশ করা যেতে পারে।
৪. অনুসন্ধানে প্রাপ্ত যথাযথ প্রমাণাদি, যথা: ছবি, গ্রাফ, চার্ট ও পরিসংখ্যান উপস্থাপন করতে হবে।
৫. রিপোর্টে কখনোই কোনো মন্তব্য বা মতামত উপস্থাপন করা যাবে না। বরং প্রাপ্ত তথ্য সাজিয়ে উপস্থাপন করবেন, যাতে কে বা কারা দায়ী, তা স্পষ্ট হয়।
৬. সংবাদ/তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে না চাইলে তা রক্ষা করতে হবে। তবে সাংবাদিককে নিজের প্রয়োজনে সূত্রের পরিচয় নিজের কাছে সংরক্ষণ করতে হবে।
৭. রিপোর্ট উপস্থাপনের পরই সাংবাদিকের কাজ শেষ হয় না। কখনো কখনো এর ফলোআপও করতে হয়। পাশাপাশি প্রকাশিত কোনো তথ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আসতে পারে, তখন এসব প্রতিবাদ প্রকাশ ও যথাযথ উত্তর উপস্থাপন করতে হবে।
৮. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মতো সংবাদপত্রে ফুটেজ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং লেখনশৈলী ও ছবির মাধ্যমেই পুরো সংবাদটিকে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়।
৯. নির্ধারিত কলামে সুসংঘবদ্ধভাবে প্রতিবেদনটি লিখতে হয়। পত্রিকায় পেজ মেকআপ অনুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতিবেদনের জন্য নির্দিষ্ট জায়গা বরাদ্দ থাকে। সুতরাং অনুসন্ধানী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নির্দিষ্টভাবে গুছিয়ে লিখতে হয়।
১০. পত্রিকার ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে অনুসন্ধানী সংবাদের ক্ষেত্রে শিরোনাম নাটকীয় করতে গিয়ে যেন অপ্রাসঙ্গিক হয়ে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হয়।
১১. সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী সংবাদ পরিবেশনে সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো গোপন সোর্সকে দেখানোর চাপ থাকে না। ‘নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ব্যক্তি’–এভাবে লেখা যায়।
১২. সংবাদপত্র আসলে শিক্ষিত শ্রেণির জন্য বোধগম্য। নিরক্ষর বা অন্ধ মানুষ সংবাদপত্রে প্রকাশিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের স্বাদ পাবে না ।
১৩. সংবাদপত্র ২৪ ঘণ্টায় একবার প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে অনুসন্ধানকৃত আপডেট প্রকাশের সুযোগ নেই।

অনুসন্ধানী সংবাদের আরও কিছু প্রক্রিয়া

কীভাবে তৈরি হয় অনুসন্ধানী সংবাদ। সাংবাদিক সব সময়ই অনুসন্ধানী সংবাদের জন্য সূত্র খোঁজেন। যখন কোনো সাংবাদিক কোনো ঘটনার মধ্যে বড়ো কোনো অনিয়মের গন্ধ পান, তখনই তিনি তা সূত্র হিসাবে গণ্য করেন এবং তৎপরবর্তী অনুসন্ধান চালাতে থাকেন। বিভিন্নভাবে এ সূত্র পাওয়া যেতে পারে, যেমন:

১. (ক) কোনো ঘটনার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লে।
(খ) ভুক্তভোগী তথ্য সরবরাহ করতে পারে।
২. প্রকাশিত বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের মধ্যে।
৩. ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের আচরণের মধ্য দিয়ে সূত্র পাওয়া যায়। যেমন, কোনো বিষয়ে জানতে গেলে তথ্য না দেওয়া বা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা।

অনুসন্ধানী সংবাদ তৈরির ক্ষেত্রে সাংবাদিককে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয়:

১. বিষয়টি ব্যাপক জনস্বার্থের সঙ্গে কতটুকু জড়িত বা আদৌ জড়িত কি না, তা নিশ্চিত হওয়া।
২. বিষয়টির গভীরতা বা গুরুত্ব কতখানি তা জানা।
৩. বিষয়টির প্রতি পাঠক বা দর্শক-শ্রোতার আগ্রহ কতখানি থাকতে পারে তা নিশ্চিত হওয়া।
৪. এ ঘটনার ক্লু কী এবং প্রকৃত উৎস কোথায়, কে বা কারা চিহ্নিত হবে, কখন কোথায় বা কার কাছে যেতে হবে, এর একটি পরিকল্পনা করা।

৫. কোন ধরনের দলিলাদি বা প্রমাণপত্র সংগ্রহ করতে হবে, তার ধরন এবং কোথায় এগুলো পাওয়া যাবে, জড়িতদের কোথায় কীভাবে পাওয়া যাবে, সেই সম্পর্কে ধারণা বা পরিকল্পনা করা।

সাধারণ প্রতিবেদন তৈরির ধাপসমূহ	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ধাপসমূহ
গবেষণা	
তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন রচনা করা হয় একটি ধারাবাহিক ছন্দ অনুসরণ করে (দৈনিক, সাপ্তাহিক কিংবা মাসিক)।	তথ্যের প্রাসঙ্গিকতা ও সম্পূর্ণতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হওয়ার আগ পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ করা হয় না।
এক্ষেত্রে দ্রুত প্রাথমিক গবেষণার কাজ শেষ করা হয় এবং প্রতিবেদন প্রকাশ বা প্রচারের পর প্রায় ক্ষেত্রেই পরবর্তী সময়ে কোনো গবেষণা হয় না।	প্রতিবেদন প্রস্তুতের অন্তিম পর্যায় পর্যন্ত গবেষণা চলমান থাকে; এমনকি প্রতিবেদন প্রকাশের পরও ক্ষেত্রবিশেষে তা চলতে পারে।
প্রয়োজনীয় ন্যূনতম তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ প্রতিবেদন রচনা করা হয় এবং এর আকার হয় তুলনামূলক ছোটো।	প্রতিবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সর্বোচ্চ তথ্যের সন্নিবেশ ঘটে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এবং এর আকার দীর্ঘ হতে পারে।
প্রতিবেদনে সূত্রের উল্লেখ নথির প্রতিস্থাপক হিসাবে।	অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে সূত্রকে সমর্থন বা কাজ করে। নাকচ করার জন্য পর্যাপ্ত নথি থাকতে হয়।
সূত্রের সঙ্গে সম্পর্ক	
সূত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে অনেক ক্ষেত্রে সূত্র প্রদত্ত তথ্যের যাচাই-বাছাই করা হয় না।	সূত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই গভীর হোক না কেন, যাচাই-বাছাই না করে কোনো তথ্যই প্রকাশের সুযোগ নেই। কেননা সূত্র ইচ্ছাকৃতভাবে যেমন ভুল তথ্য দিতে পারে, তেমনই তার অজ্ঞতার কারণেও তথ্য ভুল হতে পারে।
দাপ্তরিক সূত্রগুলো তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য অনায়াসে তথ্য সরবরাহ করে থাকে।	দাপ্তরিক তথ্যগুলো সংবাদকর্মীর কাছে গোপন রাখা হয়। কেননা তা প্রকাশ পেলে কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান বিপদে পড়তে পারে।
সাংবাদিককে প্রতিবেদনসংশ্লিষ্ট পক্ষের মত বা বক্তব্য গ্রহণ করতে হয় যদিও অন্য সূত্রের মতামত বা ব্যাখ্যার সন্নিবেশ ঘটিয়ে তিনি তাতে ভারসাম্য আনতে পারেন।	প্রতিবেদকের কাছে যদি পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকে, সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনসংশ্লিষ্ট পক্ষের যে কোনো বক্তব্যকে তিনি চ্যালেঞ্জ বা নাকচ করতে পারেন।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সংবাদসূত্র শনাক্ত করা যায় বা প্রতিবেদনে সংবাদসূত্রের উল্লেখ থাকে।	অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সূত্রের নিরাপত্তার স্বার্থেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে সূত্র প্রকাশ করা হয় না।

সাধারণ প্রতিবেদন তৈরির ধাপসমূহ	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির ধাপসমূহ
ফলাফল	
ঘটনার হুবহু প্রতিফলনকেই সংবাদ প্রতিবেদন হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং জনগণকে তথ্য জ্ঞাপনের মধ্যেই প্রতিবেদকের প্রত্যাশা সীমাবদ্ধ থাকে।	ঘটনার হুবহু উপস্থাপনের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রতিবেদনের অনুসন্ধান এবং যার মধ্য দিয়ে একটি উন্নততর পরিস্থিতির দিকে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়।
সংবাদ প্রতিবেদনে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা না থাকলেও চলে। ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা বলতে ঘটনার সঙ্গে নিজেকে জড়ানোকে বোঝানো হচ্ছে না। বরং প্রতিবেদক এক্ষেত্রে শুধু তার দৈনিক কঠিন ওয়ার্কের মতো কাজ করেন।	সাংবাদিকের ব্যক্তিগত সম্পৃক্ততা না থাকলে প্রতিবেদন কখনো সম্পূর্ণতা পায় না। এ ধরনের প্রতিবেদন তৈরির জন্য পর্যাপ্ত সময় ও শ্রম দিতে হয় বলে প্রতিবেদককে মানসিকভাবে ঘটনার মধ্যে সম্পৃক্ত হতে হয়।
প্রতিবেদনসংশ্লিষ্ট সব পক্ষের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের কাজটি করে থাকেন। অর্থাৎ প্রতিবেদক অভিযোগকারী ও অভিযুক্ত–এই দুই পক্ষের বক্তব্য উপস্থাপন করে দায় সারেন।	অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তথ্যপ্রমাণের ধারাবাহিকতার ফলে একটি অনিবার্য পরিণতি গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে প্রতিবেদনের মধ্যেই প্রমাণসাপেক্ষে একটি মত সন্নিবেশিত থাকতে পারে। তবে এটি কোনোভাবেই প্রতিবেদকের নিজস্ব মতামত নয়।
সংবাদ লিখনশৈলীতে নাটকীয়তা থাকে না বললেই চলে। কারণ এ ধরনের প্রতিবেদন চূড়ান্ত সমাপ্তির দিকে না গিয়ে একটি চলমান প্রক্রিয়ার অংশে রূপ নেয়।	সংবাদের তাৎপর্যতা তৈরির জন্য প্রতিবেদনের কাঠামোতে নাটকীয়তা অনিবার্য।
যদিও সাংবাদিকতায় যে কোনো ভুল ত্যাজ্য। কিন্তু সাদামাটা সংবাদের ক্ষেত্রে ভুল হলে সাংবাদিক বা সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমে ওই ভুলের জন্য ব্যাপক মাশুল দিতে হয় না।	এক্ষেত্রে প্রতিবেদকের কোনোরূপ ত্রুটি বা বিচ্যুতি প্রতিবেদকের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের বিশ্বস্ততাকে প্রশ্নের মুখোমুখি করে।

বিশ্বসেরা ১১টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ও পুলিৎজার

২০০৬ সাল

যুক্তরাষ্ট্রের পত্রিকা ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’-এর সাংবাদিক সুজান স্মিত, জেমস ভি গ্রিমাল্ডি এবং আর. জেফরি স্মিথ ২০০৬ সালে পেয়েছিলেন এই পুরস্কার। সংস্কারের নামে মার্কিন কংগ্রেসে ওয়াশিংটন লবিস্ট জ্যাক আব্রামোফের দুর্নীতির বিষয়ে প্রতিবেদন করেছিলেন তারা।

২০০৭ সাল

‘দ্য বার্মিংহ্যাম নিউজ’-এর ব্রেট বা কলেজ পেয়েছিলেন এই পুরস্কার। একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের দুর্নীতির তথ্য ফাঁস করে দেন তিনি। ফলে ওই চ্যান্সেলরকে বরখাস্ত করা হয়েছিল এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

২০০৮ সাল
এ বছর দুটি পত্রিকা এ পুরস্কার পায়। 'নিউইয়র্ক টাইমস' পত্রিকার ওয়াল্ট বোগদানিচ এবং জেক হুকার পেয়েছিলেন এ পুরস্কার। চীন থেকে আমদানি করা ওষুধ ও নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের উপস্থিতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছিলেন তারা। এছাড়া 'শিকাগো ট্রিবিউন'-এর এক প্রতিনিধি জিতেছিলেন এই পুরস্কার।

২০০৯ সাল
'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর ডেভিড বার্সতো পেয়েছিলেন এ পুরস্কার। কিছু অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা রেডিয়ো ও টেলিভিশনে বিশ্লেষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পেন্টাগনের সমর্থনে ইরাক যুদ্ধকে প্রভাবিত করছে। তাদের এসব বক্তব্যের কারণে কত কোম্পানি সুবিধা ভোগ করছে, তা-ও তুলে ধরা হয় প্রতিবেদনে।

২০১০ সাল
'দ্য ফিলাডেলফিয়া ডেইলি নিউজ'-এর বারবারা ল্যাকার ও ওয়েনডি রডারম্যান এবং 'নিউইয়র্ক টাইম ম্যাগাজিন'-এর শেরি ফিঙ্ক যৌথভাবে এ পুরস্কার জিতেছিলেন। একটি অসৎ পুলিশ দলের মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার ঘটনাটি উদ্‌ঘাটন করেন ল্যাকার ও রডারম্যান। ঘটনাটি নিয়ে ব্যাপক হইচই হয়েছিল। ফিঙ্ক ঘূর্ণিঝড় ক্যাটরিনা আঘাত হানার পর রোগীদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকদের মানসিক অবস্থা নিয়ে একটি প্রতিবেদন করেছিলেন।

২০১১ সাল
'সারাসোতা হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর পেইজি সেন্ট জন এ বছর পুলিৎজার পেয়েছিলেন। ফ্লোরিডার বাড়ি মালিকদের সম্পদের ইনসিওরেন্সে দুর্বলতা সংক্রান্ত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তাকে এ পুরস্কার এনে দিয়েছিল।

২০১২ সাল
'অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস'-এর ম্যাট অ্যাপুৎসো, অ্যাডাম গোল্ডম্যান, এইলিন সুলিভান ও ক্রিস হাওলি এ বছর এই পুরস্কার জিতেছিলেন। নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগের 'ক্ল্যানডেস্টাইন গুপ্তচর কর্মসূচির' আওতায় শহরের মুসলিম সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতি নজর রাখা হচ্ছিল, যা প্রকাশ পায় এপির ওই প্রতিবেদনে। প্রতিবেদন প্রকাশের পর কংগ্রেস থেকে কেন্দ্রীয় তদন্ত দাবি করা হয়।

২০১৩ সাল
'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর ডেভিড বার্সতো এবং আলেহান্দ্রা ইয়ানিক ফন বেরত্রাব এই বছর পুরস্কারটি পান। মেক্সিকোয় নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে কীভাবে ওয়াল-মার্ট ঘুস দেয়, সেটা নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করেছিলেন তারা।

২০১৪ সাল
ওয়াশিংটন ডিসির 'দ্য সেন্টার ফর পাবলিক ইনটিগ্রিটির' ক্রিস হামবি জেতেন এই পুরস্কার। কয়লাখনির শ্রমিকদের ফুসফুসের রোগ নিয়ে কয়েকজন আইনজীবী ও চিকিৎসকের প্রতারণার চিত্র তুলে ধরেছিলেন তার প্রতিবেদনে। ফলে ওই আইনজীবী ও চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল।

২০১৫ সাল
এ বছর দুজন জিতেছেন এই পুরস্কার। 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর এরিক লিপটন কংগ্রেস নেতা ও অ্যাটর্নি জেনারেলদের লবিস্টরা তাদের কতটা প্রভাবিত করে এসংক্রান্ত প্রতিবেদনের জন্য এবং 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'-এর এক প্রতিনিধির স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের জন্য।

২০১৬ সাল
ফ্লোরিডা মানসিক হাসপাতালের অবহেলার অমানবিক চিত্র ফুটিয়ে তুলে ২০১৬ সালে 'ট্যাম্পা বে টাইমস'-এর লিওনোরা লাপিটার ও অ্যান্থনি কর্মিয়ার এবং 'সারাসোতা হেরাল্ড ট্রিবিউন'-এর মাইকেল ব্রাগা জিতে নেন এই পুরস্কার।

তথ্যসূত্র

১. https://www.dw.com/bn/যে তিন অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বিশ্বে আলোড়ন তুলেছে
২. https://www.dw.com/bn/ সাংবাদিকতার পরিধি বেড়েছে কিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বাড়েনি
৩. https://www.dw.com/bn/ অনুসন্ধানী-সাংবাদিকতা যা হয় যা হয় না
৪. https://www.dw.com/bn/ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বাধা কোথায় কোথায় গলদ
৫. https://gijn.org/ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কী
৬. রোবায়েত ফেরদৌস, মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ও সাইফুল হক (২০১৫), দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, টিআইবি, ঢাকা।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

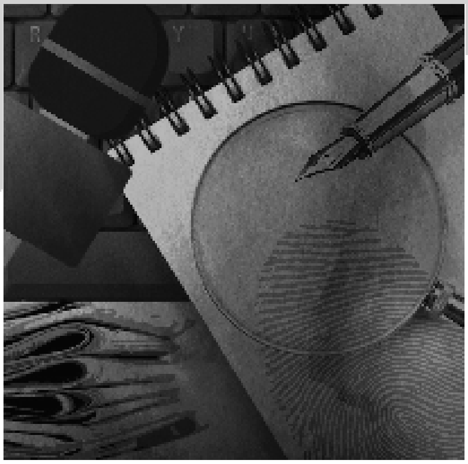

ডিজিটাল যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

শুভ কর্মকার

মানুষ ইন্দ্রিয় সংযোগে প্রাপ্ত তথ্যের বাইরেও আরও তথ্য জানতে চায়। ঘরের দরজার বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনা, অনুঘটনা, মানুষের গল্প, ঘটনার ভেতরের গল্প এবং নতুন নতুন ধারণা সম্পর্কে জানতে চাওয়া যেন মানবজাতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মূলত বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচার তাগিদেই এই জানতে চাওয়া। গণমানুষের জানার এই ক্ষুধা মেটানোর চেষ্টা করে গণমাধ্যম। সময়ের স্রোতে গণমাধ্যমের কার্যক্রমে ও তথ্য সংগ্রহে ভিন্নতা এসেছে। কিন্তু বদলায়নি তথ্য জানানোর অভিপ্রায়। বরং বহমান নদীর মতো সময়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে গণমাধ্যম। এক্ষেত্রে সময় নিয়ে হাসান আজিজুল হকের বক্তব্য উদ্ধৃত করা যেতেই পারে। হাসান আজিজুল হক বলেছেন, ‘সময় তো কোনো বস্তু নয় যে তার ত্রিমাত্রিক বাস্তবতা আছে। বলা হয়ে থাকে, সময়ের মাত্রা একটাই। তা হচ্ছে সময় পেছন থেকে সামনের দিকে যাচ্ছে।’ (হক, ২০১৯; পৃ. ১৭)। গণমাধ্যমও তেমনই পেছন থেকে সামনের দিকে এগিয়েছে। দেওয়ালে সাঁটানো অ্যাক্টা-ডায়ারনা থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে এসেছে গণমাধ্যম। সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে গণমাধ্যম তাল মিলিয়েই এগিয়েছে। মেকানিক্যাল যুগ, ইলেকট্রোমেকানিক্যাল যুগ পেরিয়ে ইলেকট্রনিক যুগের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেট বর্তমান সভ্যতার উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আধুনিক যুগের পর এসেছে উত্তরাধুনিক বা পোস্টমডার্নিজম। সভ্যতার এই বিবর্তন সম্পর্কে রুদ্র কিংশুক বলেছেন, ‘কম্পিউটার প্রযুক্তিই আধুনিকতাকে সরিয়ে দিয়ে নিয়ে এসেছে পোস্টমডার্নিজম। যেমন, শিল্পবিপ্লব এনেছিল

মডার্নিজমকে। আধুনিক যুগের মানুষ রেডিয়ো পেয়েছিল আর আমরা পেয়েছিলাম টেলিভিশন। টেলিভিশনের সঙ্গে পেলাম রিমোট কন্ট্রোল। আরও পেলাম এসটিডি, আইএসডি, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল–এসব উপকরণই কম্পিউটার প্রযুক্তির ফসল।' (কিংশুক, ২০১৯; পৃ. ২৪-২৫)। উত্তরাধুনিকতা বা পোস্টমডার্নিজমকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে সভ্যতা। পোস্টমডার্নিজম-পরবর্তী ধারণা পাওয়া যায় রবার্ট স্যামুয়েলসের অটোমডার্নিটি বা স্বয়ম-আধুনিকতায়। যেখানে প্রযুক্তি আর ইন্টারনেটের কল্যাণে মানুষ হয়ে ওঠবে স্বয়ম্ভু। করোনা বাস্তবতায় স্যামুয়েলসের অটোমডার্নিটি উপলব্ধি করা যাচ্ছে। একুশ শতকের প্রারম্ভে ব্যক্তিগত কম্পিউটার, মোবাইল ফোন, আইপড, ইন্টারনেট, ব্লগ, রিমোট কন্ট্রোল টেলিভিশন, কম্পিউটার গেমস ইত্যাদি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সৃষ্ট যান্ত্রিক-স্বয়ংক্রিয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি স্বায়ত্তশাসনের যুগকেই অটোমডার্নিটি বা স্বয়ম-আধুনিকতা বলা হচ্ছে (বিস্তারিত দেখুন Samuels, 2008)। কম্পিউটার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ইন্টারনেটের ডিজিটনির্ভর এই যুগকে বলছি ডিজিটাল যুগ।

ডিজিটাল যুগে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নতুন নতুন উদ্ভাবন সাংবাদিকতার গতিপ্রকৃতিতেও এনেছে পরিবর্তন। সম্প্রতি দেখেছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কাছে গণমাধ্যমের নীরব আত্মসমর্পণ। ডিজিটাল যুগের ব্যক্তি স্বায়ত্তশাসনের ফলস্বরূপ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ছে অনেক অডিয়ো বা ভিডিয়ো ক্লিপস কিংবা ছবি। ছড়িয়ে পড়া এসব তথ্য কখনো কখনো বদলে দিচ্ছে গণমাধ্যমের সংবাদ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা ডিজিটাল প্ল্যাটফরমের এই বদলে দেওয়ার ক্ষমতা গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। চ্যালেঞ্জের বিপরীতে প্রয়োজন সাংবাদিকদের ডিজিটাল প্রস্তুতি। ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে তথ্য ব্যবস্থাপনা ও তথ্যের নিরাপত্তা সম্পর্কে জানতে হবে একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সঙ্গে জড়িত সাংবাদিককে। ডিজিটাল যুগে একজন সাংবাদিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের তথ্য কীভাবে ডিজিটাল প্ল্যাটফরম থেকে সংগ্রহ করবেন, কীভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি দিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করবেন, সংগৃহীত তথ্যের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত করবেন এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কীভাবে তথ্য উপস্থাপন করতে পারবেন–এসব বিষয় নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।

ডিজিটাল যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হলো প্রমাণ সংগ্রহের সাংবাদিকতা। আর এখানে প্রমাণ হলো তথ্য। এই তথ্য হতে পারে জনগণের তথ্য, অফিসের বক্তব্য, অফ দ্য রেকর্ড বক্তব্য, দুর্নীতির খবর এবং কখনো কখনো গুজবও সাংবাদিক সংগ্রহ করে থাকেন। তবে সেখান থেকে সত্য সংবাদ জনগণের সামনে উপস্থাপন করাই অনুসন্ধানী প্রতিবেদকের দায়িত্ব। সাংবাদিককে তথ্য সংগ্রহের পর যাচাই-বাছাই, বিশ্লেষণ এবং ঘটনার পেছনের ঘটনা অনুসন্ধানে ঘটনাটি নিয়ে গ্রাউন্ডওয়ার্ক করতে হয়। সাদামাটা সংবাদ প্রতিবেদনে এত কিছু করতে হয় না। সাধারণ প্রতিবেদনে তথ্য সংগ্রহের পর সেই তথ্য জনগণের সামনে তুলে ধরেন সাংবাদিক। আর এখানেই গভীর প্রতিবেদন শুরু হয়। অন্যান্য প্রতিবেদনের সঙ্গে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পার্থক্য তুলে ধরতে গিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস *রিপোর্টিং গাইড* গ্রন্থে বলেছেন, 'অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ঘটনাকে গভীরে তলিয়ে দেখতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করার সময় প্রতিবেদক ঘটনার ভুল অথবা সত্যি প্রমাণ করার জন্যই রিপোর্টের তথ্য অনুসন্ধান করেন। এই ধরনের প্রতিবেদন কোনো সিরিয়াস বিষয় নিয়ে হয়ে থাকে। রিপোর্টার এই ধরনের প্রতিবেদন করতে গিয়ে ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারেন। এছাড়া প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনে যেমনঃ ছবি, গ্রাফ ইত্যাদি ব্যবহারে সতর্ক থাকতে হয়।' (বিশ্বাস, ২০০5)। অর্থাৎ একজন অনুসন্ধানী সংবাদের প্রতিবেদক খবরের পেছনের ঘটনাটি পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। ডিজিটাল যুগে ঘটনার গভীরের খবরটি বের করে আনতে প্রযুক্তি সাহায্য করে। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে তুলেছে সহজতর। এজন্য অবশ্য সাংবাদিককে ডিজিটাল টুলসগুলো সম্পর্কে জানতে হবে। তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ভিজুয়ালাইজেশনে গ্রাফিক্স, চার্ট, বার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির মাধ্যমে খুব সহজেই ভিজুয়ালাইজেশনের কাজ করতে পারেন অনুসন্ধানী প্রতিবেদক। তবে ডিজিটাল যুগে তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য হুমকিও রয়েছে। এই হুমকি হলো তথ্যের নিরাপত্তা। অনুসন্ধানী সংবাদের গোপনীয় ও স্পর্শকাতর তথ্য ডিজিটাল প্ল্যাটফরমে বিনিময় ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে প্রতিবেদককে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা এসব অনুষঙ্গ নিয়েই। প্রতিবেদন তৈরির ধাপ অনুসারে

> “ডিজিটাল যুগে ঘটনার গভীরের খবরটি বের করে আনতে প্রযুক্তি সাহায্য করে। সেই সঙ্গে প্রযুক্তি তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে তুলেছে সহজতর। এজন্য অবশ্য সাংবাদিককে ডিজিটাল টুলসগুলো সম্পর্কে জানতে হবে”

ডিজিটাল যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা শীর্ষক আলোচনা তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম পর্বে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ, দ্বিতীয় পর্বে তথ্যের নিরাপত্তা এবং তৃতীয় পর্বে তথ্য উপস্থাপন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একজন সাংবাদিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে কী কী ডিজিটাল টুলস ব্যবহার করতে পারেন, সেগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম পর্ব: তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে ডিজিটাল সুবিধা কীভাবে একজন সাংবাদিককে সাহায্য করতে পারে, সেটা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনা তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগে উন্মুক্ত উৎসে তথ্য খোঁজা, দ্বিতীয় ভাগে সার্চ এপিআই এবং তৃতীয় ভাগে তথ্য বিশ্লেষণ। তিন ভাগের বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

ক. উন্মুক্ত উৎসে তথ্য খোঁজা: উন্মুক্ত উৎসে তথ্য খোঁজার ইংরেজি ওপেন সোর্স সার্চ টুল (Open source search tool)। ওপেন সোর্স সার্চ টুলের মাধ্যমে অনুসন্ধানী সংবাদের প্রতিবেদক প্রয়োজনীয়

তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। এক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজন প্রযুক্তিজ্ঞানের পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তা। ঘটনার পেছনের খবর বের করে আনতে সাংবাদিকের তিনটি বিষয় জানা প্রয়োজন, যথা: কার্যকর ওয়েব সার্চ, অনলাইনে মানুষ খোঁজা, ডোমেইনের মালিকানা বের করা। (মায়ার্স, ২০১৫)।

কার্যকর ওয়েব সার্চ: তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে কার্যকর ওয়েব সার্চ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সার্চ ইঞ্জিন শুধু জানে কোন পেজে কী শব্দ আছে। দ্রুত কিছু খুঁজে বের করতে হলে সার্চ ইঞ্জিনকে চেনাতে হবে আপনার টার্গেট পেজে কী ধরনের শব্দ আছে। যে কারণে এখানে সাংবাদিকের বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। এই বিষয়টি সহজ করার জন্য সাংবাদিক 'কিওয়ার্ড' ব্যবহার করতে পারেন। ইউরোপিয়ান জার্নালিজম সেন্টার 'ভেরিফিকেশন হ্যান্ডবুক ফর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং' শীর্ষক একটি নির্দেশিকা প্রকাশ করেছে। এই নির্দেশিকার তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্টারনেটে অনুসন্ধান বিশেষজ্ঞ পল মায়ার্সের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ করেছে গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক (জিআইজেএন)। সেখানে মায়ার্স ওপেন সোর্স এ তথ্য অনুসন্ধানের বিষয়ে বলেছেন। মায়ার্সের আলোচনা থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাওয়া যায়। যে বিষয়গুলো তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে অধিক কার্যকরী। বিষয় তিনটি হলো: 'OR', 'site:', 'filetype:'। (মায়ার্স, ২০১৫)

তথ্য খোঁজার ক্ষেত্রে এই তিনটির ব্যবহার এবার আলোচনা করা যাক। ধরুন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করার সময় প্রতিবেদক কোনো ব্যক্তি অথবা কোনো স্থান সম্পর্কে জানতে চাইছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রতিবেদক নির্দিষ্ট করে কিছু জানেন না। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক 'OR'-এর ব্যবহার করতে পারেন। মনে করুন, সিলেট বিভাগে শিশু নির্যাতন নিয়ে আপনি প্রতিবেদন তৈরি করতে চাইছেন। এখন প্রতিবেদকের প্রয়োজন সিলেট বিভাগের প্রত্যেকটি জেলার শিশু নির্যাতনবিষয়ক তথ্য। এক্ষেত্রে 'সিলেটে শিশু নির্যাতন' লিখে সার্চ দিলে সিলেট বিভাগের অন্য জেলাগুলো বাদ পড়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক 'শিশু নির্যাতন সিলেট OR সুনামগঞ্জ OR হবিগঞ্জ OR মৌলভীবাজার' লিখে সার্চ দিতে পারেন। এর ফলে প্রতিটি জেলার তথ্য আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। আবার অনুসন্ধান করতে গিয়ে আপনি ব্যক্তি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে চাইছেন। কিন্তু সেই ব্যক্তির নামের সঠিক বানান জানেন না। এক্ষেত্রেও প্রতিবেদক এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।

কোনো নির্দিষ্ট ওয়েবসাইটের ভেতরের তথ্য অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে মায়ার্স (২০১৫) প্রদত্ত 'site:' পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। কোনো নির্দিষ্ট ওয়েবসাইট থেকে অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধানের বিষয় প্রথমে দিতে হবে তারপর site: লিখে ওয়েবসাইটের নাম দিতে হবে। মনে করেন, ফেসবুকে মি. আব্দুর রহমানকে খুঁজে বের করতে চান। সেক্ষেত্রে আপনার সার্চিং পদ্ধতি হবে *'আব্দুর রহমান' site:facebook.com*।

নির্দিষ্ট গবেষণা, বার্ষিক প্রতিবেদন, পরিসংখ্যান ইত্যাদি তথ্য সাধারণত ফাইলে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। ওয়ার্ড, পিডিএফ, এক্সেল, পাওয়ার পয়েন্ট প্রভৃতি ফরম্যাটের ফাইলে এই তথ্যগুলো থাকতে পারে। এই কারণে প্রতিবেদক ফাইলের ফরম্যাট দিয়ে সার্চ দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) প্রতিবেদন দেখতে চান প্রতিবেদক। সেক্ষেত্রে তিনি কীভাবে সার্চ দিবেন? ধরুন, প্রতিবেদক পিআইবির ওয়েবসাইটের ঠিকানা জানেন। এক্ষেত্রে তিনি দ্রুত তথ্য খুঁজে বের করার জন্য প্রতিবেদক এভাবে *'প্রতিবেদন' site:facebook.com filetype:pdf* লিখে সার্চ দিতে পারেন। তাহলে তিনি পিআইবিবিষয়ক সব প্রতিবেদন যেমন: বার্ষিক প্রতিবেদন, ত্রৈমাসিক এপিএ প্রতিবেদন ইত্যাদি দ্রুত খুঁজে পাবেন।

অনলাইনে মানুষ খোঁজার ক্ষেত্রে মায়ার্স (২০১৫) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনুসন্ধান এবং ছবি দিয়ে মানুষ খোঁজার বিষয়ে বলেছেন। তবে সাধারণ ওপেন সার্চ ইঞ্জিনের (গুগল, ইয়াহু ইত্যাদি) মাধ্যমেও মানুষ খুঁজে বের করা যায়। সেক্ষেত্রে উল্লিখিত 'site:' পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। তবে মায়ার্স (২০১৫) মানুষ খোঁজার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে বলেছেন। যে ব্যক্তিকে খোঁজা হচ্ছে সেই ব্যক্তিকে কত নামে ডাকা হতে পারে, সেটার সম্ভাব্য একটা তালিকা তৈরি করা। ওই ব্যক্তির নামের বানান কতভাবে হতে পারে, সেটার একটা তালিকা তৈরি করা। এছাড়া ব্যক্তির বিয়ের পর নামে কোনো পরিবর্তন এসেছে কি না, নামের শেষাংশ বা মধ্যাংশ জানেন কি না, তার জন্ম কোথায় হতে পারে, কী ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত, তার কোনো ছবি আছে কি না ইত্যাদি বিষয় জানা থাকলে দ্রুত ব্যক্তিটিকে খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। এছাড়া সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিশেষত ফেসবুক, টুইটার ও লিঙ্কডইন-এ গিয়ে ব্যক্তির খোঁজ করা যেতে পারে। ফেসবুকে সার্চ করার অ্যাডভান্সড অপশন নেই। তবে সেখানে মানুষ, স্থান, গ্রুপ, পেজ, ছবি, ইভেন্ট ইত্যাদি আলাদা আলাদা উপায়ে খোঁজ করা যায়। ফেসবুকে আরেকটি সুবিধা পাওয়া যায়–কোনো ব্যক্তিকে খোঁজার সময় তার পেশা, জেলার নাম, স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ইত্যাদি পাশে জুড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট মানুষটিকে খুঁজে বের করা যায়। টুইটারে ব্যক্তির পাশাপাশি ইউজারদের মধ্যে বার্তা বিনিময়ও অনুসন্ধান করা যায়। টুইটারের সার্চ অপশনে ব্যক্তি ও স্থান আলাদা করে নির্ধারণ করে দেওয়া যায়। টুইটারে আপনার নিকটবর্তী অথবা যে কোনো স্থানের কোনো বিষয় বা ব্যক্তি অনুসন্ধান করা যায়। এছাড়া সাম্প্রতিক পোস্ট, ছবি, ভিডিয়ো অনুসন্ধান করা যায়। লিঙ্কডইন পেশাজীবীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। এখানে ব্যক্তির অবস্থান, পেশা, বর্তমান ও সাবেক কর্মরত প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি 'কিওয়ার্ড' দিয়ে অনুসন্ধান করা যায়।

আবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একজন ব্যক্তি কোন ভৌগোলিক অবস্থান থেকে পোস্ট দিচ্ছেন, সেই বিষয়টিও অনুসন্ধান করা যায় ডিজিটাল মাধ্যমে। জিওফিডিয়া (https://geofeedia.com/) ও ইকোসেক (https://www.echosec.net/)-এর মাধ্যমে টুইট, ফেসবুক পোস্ট, ইউটিউব ভিডিয়ো, ফ্লিকার ও ইনস্টাগ্রামের ছবি কোন ভৌগোলিক অবস্থান থেকে দেওয়া হয়েছে, সেটা অনুসন্ধান করা যায়। আবার জিওসোস্যালফুটপ্রিন্ট (http://geosocialfootprint.com/) নামের ওয়েবসাইটে টুইটার ব্যবহারকারীর কর্মকাণ্ড মানচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হয়। তবে এই বিষয়টি অনুসন্ধান করা যাবে তখনই, যখন ব্যবহারকারী সেই অ্যাকাউন্টের লোকেশন সচল রাখেন। এছাড়া পিপল (https://pipl.com/) ও স্পোকিও (http://www.spokeo.com/)-এর মতো টুলগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, ডেটিং সাইটসহ বিভিন্ন ডেটাবেজ থেকে ব্যক্তির পরিচয় অনুসন্ধান করে দেয়। ব্যক্তি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ব্যক্তির নাম, ই-মেইল ঠিকানা, মোবাইল বা টেলিফোন নম্বর, ঠিকানা ইত্যাদি দিয়ে ব্যক্তিপরিচয় অনুসন্ধান করা যায়। তবে এর জন্য গ্রাহককে অনেক ক্ষেত্রে মূল্য পরিশোধ করতে হয়। এর বাইরে ছবি দিয়ে ব্যক্তি পরিচয়ও অনুসন্ধান করা যায়। এক্ষেত্রে টিনআই (https://tineye.com/) ও গুগল ইমেজ (https://www.google.com/imghp) ব্যবহার করা যেতে পারে।

ডোমেইনের মালিকানা অনুসন্ধানের মধ্য দিয়েও ব্যক্তির আসল পরিচয় অনুসন্ধান করা যায়। কারণ যে কোনো ব্যক্তি ডটকম, ডটঅর্গ, ডটনেট দিয়ে ওয়েবসাইট তৈরি করতে পারেন। ফলে পরিচয় গোপন করে আপনার অনুসন্ধিৎসু ওয়েবসাইটটি খোলা হয়েছে কি না, সেটা খুঁজে দেখা দরকার। এজন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিক ডোমেইনের মালিকানা খুঁজে বের করবেন। এক্ষেত্রে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক হু-ইজ (https://www.whois.com/) এবং ডোমেইন টুলস (https://www.domaintools.com/)-এর সাহায্য নিতে পারে। এই দুইটি সাইট অনুসন্ধানী সাংবাদিককে ডোমেইন মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করবে।

তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিক কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের ই-মেইল ঠিকানার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে খুব সহজেই অনুসন্ধানী সাংবাদিক ই-মেইল ঠিকানা খুঁজে বের করতে পারেন। হান্টার (https://hunter.io/) এই সুবিধাটি প্রদান করে থাকে। হান্টার থেকে কোনো কোম্পানির কর্মরতদের ই-মেইল ঠিকানা, পেশাজীবীদের ই-মেইল ঠিকানা, লেখকের ই-মেইল ঠিকানা এবং ই-মেইল ঠিকানা যাচাই করে থাকে। হান্টার প্রতিমাসে ২৫টি সার্চ এবং ৫০টি যাচাই বিনামূল্যে দিয়ে থাকে। এর চেয়ে বেশি সার্চ কিংবা যাচাই করলে এর জন্য মূল্য দিতে হয়। আমেরিকায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য স্কুপ (https://sqoop.com/) নামে ওয়েবসাইট রয়েছে। যেখান থেকে সাংবাদিকরা বিনামূল্যে কোর্ট রেকর্ড, বিজনেস ফাইল এবং জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ডকুমেন্ট সংগ্রহ করে থাকে। তবে সাংবাদিক নন–এমন কেউ এ ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে চাইলে এজন্য তাকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে। বাংলাদেশে এ ধরনের তথ্য (কোর্ট রেকর্ড, বিজনেস ফাইল প্রভৃতি) সরবরাহের সুবিধা সংবলিত কোনো ওয়েবসাইট নেই।

“ অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। আর এই তথ্যের জন্য তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি করতে হয়। তথ্যভান্ডারে অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করে থাকেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। প্রয়োজনে সেসব তথ্য থেকে তিনি রিপোর্টের সহায়ক তথ্য খুঁজে বের করেন ”

খ. সার্চ এপিআই: এপিআই (API)-এর পূর্ণরূপ হলো Application Programming Interface। এপিআই কম্পিউটার ও কম্পিউটার প্রোগ্রামের মধ্যে সংযোগ ঘটিয়ে থাকে। (Reddy, 2011)। এটি মূলত সফটওয়্যার ইন্টারফেসের একটি ধরন। ওয়েব এপিআই কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট এর মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকে। একই প্রোগ্রামিং ইন্টারফেসের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের গ্রন্থাগারের তথ্য ভাগাভাগি করার বহুমুখী প্রয়োগ ঘটায় এপিআই। সার্চ এপিআই হলো এক্সকোয়েরি (XQuery) লাইব্রেরি। এটা হলো সার্চিং, সার্চ পার্সিং (Search parsing), ব্যাকরণ অনুসন্ধান (ইংরেজি ভাষার জন্য), ফ্যাসেটিং (Faceting), স্নিপেটিং (Snippeting), সার্চ টার্ম কমপ্লিশন (Search term completion) এবং অন্যান্য সার্চ অ্যাপ্লিকেশনের সমন্বিত রূপ (Understanding the Search API, 2021)। এপিআই তথ্য সংযুক্তকরণ, যোগাযোগ তথ্যাদি আপলোড করাসহ ড্যাশবোর্ডে তথ্য বিশ্লেষণ, তথ্য খোঁজা, তথ্য নিরাপত্তা সুবিধা প্রদান করে থাকে। সার্চ এপিআই-এর টুলগুলোর মধ্যে অন্যতম ইলাস্টিক (https://www.elastic.co/elasticsearch/) এবং সোলর (https://solr.apache.org/)।

গ. তথ্য বিশ্লেষণ: অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অনেক তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। আর এই তথ্যের জন্য তথ্যভান্ডার (Database) তৈরি করতে হয়। তথ্যভান্ডারে অসংখ্য তথ্য সংরক্ষণ করে থাকেন অনুসন্ধানী সাংবাদিক। প্রয়োজনে সেসব তথ্য থেকে তিনি রিপোর্টের সহায়ক তথ্য খুঁজে বের করেন। এজন্য অনুসন্ধানী সংবাদিককে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (Data management systems) সম্পর্কে জানতে হয়। তথ্য ব্যবস্থাপনার মধ্যে একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক ডকুমেন্ট ব্যবস্থাপনা (Document management systems) এবং কন্টেন্ট ব্যবস্থাপনা (Content management systems) করে থাকেন। কারণ সঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য বের করতে না পারলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকের গুরুত্বপূর্ণ সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে প্রতিবেদক টেক্সট, ছবি, ভিডিয়োচিত্রের মতো কন্টেন্ট ব্যবস্থাপনার কাজ করে থাকেন। তথ্য ব্যবস্থাপনা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিক অনলাইনে কিছু সুবিধা ব্যবহার করতে পারেন। তবে অনেক ক্ষেত্রেই সাংবাদিককে এর জন্য অর্থ দিতে হতে পারে। কারণ এ ধরনের সেবা প্রদানকারী সাইটগুলো সাধারণত বিনামূল্যে সেবা দেয় না। তথ্য ব্যবস্থাপনা সেবাদানকারী এ রকম সাইটগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য জোতেরো (https://www.zotero.org/), ডোসিয়ার (https://docear.org/), ডকুমেন্ট ক্লাউড (https://www.documentcloud.org/), লিবরেঅফিস (https://www.libreoffice.org/), সিমানটিক মিডিয়াউইকি (https://www.semantic-mediawiki.org/) ইত্যাদি। এই সাইটগুলোর মাধ্যমে তথ্য ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি ট্যাগিং (Tagging) এবং অ্যানোটেশন (Annotation)-এর কাজও করা যায়।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে তথ্য বিশ্লেষণ করা। বিশাল তথ্য ভাণ্ডার বিশ্লেষণ করা এতটা সহজ নয়। এজন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রতিবেদককে প্রাপ্ত তথ্যগুলোর শব্দ, বাক্য ও ভাষাগত বিশ্লেষণ করতে হয়। এরকম বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলোকে ইংরেজিতে টেক্সট মাইনিং (Text mining), টেক্সট অ্যানালাইসিস (Text analysis), ডকুমেন্ট মাইনিং (Document mining) বা এনএলপি (Natural Language Processing-NLP) বলা হয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, ভাষা বিশ্লেষণ করা এতটা সহজ নয়। তবে বেশকিছু সফটওয়্যার ভাষা বিশ্লেষণের কাজ করে থাকে। এ ধরনের সফটওয়্যারের সবই বিনামূল্যে দেওয়া হয় না। কিছু কিছু সেবার জন্য গ্রহীতাকে অর্থ দিতে হয়। তথ্য বিশ্লেষণের জন্য অ্যাপাচি টিকা (Apache Tika) টুলকিট (Toolkit) ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সাধারণত তথ্য লিখিতরূপে বা টেক্সট আকারে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে। যে লিখিত তথ্যগুলো ফাইলে সংরক্ষিত হয়, অ্যাপাচি টিকা এই তথ্যগুলোকে সাধারণ ফরম্যাট থেকে ভেঙে ফেলে।

তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আবার লক্ষ করা যায়, অনেক তথ্য ছবি হিসাবে বা ছবির মধ্যে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদককে ছবি থেকে

টেক্সটে রূপান্তরিত করতে হয়। এজন্য প্রতিবেদক ওসিআর (OCR-Optical Character Recognition) ব্যবহার করতে পারেন। ওসিআর ছবিকে টেক্সটে রূপ দিতে পারে। যখন পিডিএফ ফাইলে কোনো তথ্য থাকে, তখন সেখানে টেক্সট ছবি আকারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ওসিআর এই ছবিকে খুব সহজেই টেক্সটে রূপান্তর করতে পারে। অর্থাৎ লিখিত শব্দের রূপান্তরিত ছবি (লিখিত ডকুমেন্টের ছবি), মুদ্রিত লেখা, হস্তলিখন, কোনো ছবির মধ্যে থাকা টেক্সট (হতে পারে সেটা বিলবোর্ড, সাইনবোর্ড কিংবা অন্য কিছু) খুব সহজেই ওসিআর লিখিত রূপ বা টেক্সটে রূপান্তরিত করতে পারে। এছাড়া টেসেরাক্ট (Tesseract) এক্ষেত্রে ভালো কাজ করতে পারে। ছবিকে টেক্সটে রূপান্তরিত করার মতো অডিয়ো (শব্দ) টেক্সটে রূপান্তরিত করতে হয়। সেক্ষেত্রে সিএমইউ-স্ফিঙ্কস (CMU Sphinx) ব্যবহার করা যেতে পারে। (Entopix, 2021)

দ্বিতীয় পর্ব: তথ্যের নিরাপত্তা

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যুগে যুগে ছিল, আছে, থাকবে। 'ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ম্যানুয়াল' জার্মানির কোনার্ড অ্যাডেনুয়ার স্টিফটাং (Konrad Adenauer Stiftung- KAS)-এর একটি প্রকল্প। কোনার্ড অ্যাডেনুয়ার স্টিফটাং মূলত জার্মান রাজনৈতিক ফাউন্ডেশন। গণতন্ত্রের বিকাশ ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব পরামর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে এই প্রতিষ্ঠান। সেই সঙ্গে মানবাধিকার নিয়েও কাজ করে থাকে। ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ম্যানুয়ালটি সাজানো হয়েছে মূলত অনুসন্ধানী রিপোর্টিং দক্ষতা এবং ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে গণমাধ্যমের ওয়াচডগ ভূমিকা পালনে সহযোগিতা করার জন্য। মোট আটটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে এই ম্যানুয়াল। প্রথম অধ্যায়ে কীভাবে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট হওয়া যায়, সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংবাদ খুঁজে বের করার উপায় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে সংবাদ পরিকল্পনা, চতুর্থ অধ্যায়ে ডেটা নিরাপত্তার কৌশল, পঞ্চম অধ্যায়ে গবেষণা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইনসাইড স্কুপ, সপ্তম অধ্যায়ে সঠিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং অষ্টম অধ্যায়ে সংবাদ লেখার নিয়ম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ভূমিকাতেই বলা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধের মূল আলোচ্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ডিজিটাল কৌশল। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এই ম্যানুয়াল থেকে তথ্য নিরাপত্তার কৌশলগুলো এখানে আলোচনা করা হলো (Investigative Journalism Manual, 2021):

* তথ্যের নিরাপত্তা প্রদান করা খুবই জটিল। বিশেষ করে যদি স্পর্শকাতর ও গোপনীয় বিষয় নিয়ে রিপোর্ট করা হয়, তাহলে তো অবশ্যই তথ্যের নিরাপত্তা প্রয়োজন। এজন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে অবশ্যই মোবাইল ফোন, ট্যাব, কম্পিউটার, ই-মেইল, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ সব ডিজিটাল মাধ্যমে জটিল পাসওয়ার্ড দিতে হবে। কিছুদিন পরপর এই পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে। একটি পাসওয়ার্ড দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে না। কমপক্ষে প্রতি তিন মাস অন্তর পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে। ওয়াই-ফাই রাউটারের পাসওয়ার্ড বছরে কমপক্ষে দুইবার পরিবর্তন করা উচিত। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি ডিভাইস ও প্রতিটি অ্যাকাউন্টের জন্য আলাদা আলাদা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে হবে। যে ধরনের শব্দ সহজেই ডিকশনারিতে পাওয়া যায়, সেই ধরনের ওয়ার্ড ব্যবহার না করাই উচিত। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে নাম, জন্মতারিখ ও সাল, পরিবারের সদস্য, বন্ধুবান্ধব, পোষা প্রাণীর নামে পাসওয়ার্ড দেওয়া যাবে না। পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় অবশ্যই ছোটো অক্ষর, বড়ো অক্ষর, বিশেষ চিহ্ন, সংখ্যা দিয়ে তৈরি করতে হবে। যতটা সম্ভব পাসওয়ার্ডের আকার বড়ো রাখতে হবে।
* অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অনেক তথ্য সংরক্ষণ করতে হয়। এ ধরনের তথ্য সাধারণত হার্ড ড্রাইভ, ক্লাউড সার্ভার, অথবা ব্যক্তিগত সার্ভারে সংরক্ষণ করা থাকে। এই ধরনের তথ্যকে সাধারণত 'সংরক্ষিত তথ্য' বলা হয়ে থাকে। এই তথ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রথমেই পাসওয়ার্ড দিয়ে সুরক্ষা দিয়ে থাকে। এর পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে এনক্রিপশন (Encrytion) করা। এনক্রিপশনের অর্থ হচ্ছে তথ্যগুলো সংকেতাবদ্ধ করা। যে সংকেতাবদ্ধ তথ্য শুধু অথরাইজড ব্যক্তি ব্যবহার করতে পারবে। এভাবে এনক্রিপশন করলে ডিভাইস কিছুটা ধীরগতিসম্পন্ন হয়ে পড়তে পারে। ডিভাইস, হার্ড ড্রাইভ, ইউএসবি ড্রাইভ, আলাদা আলাদা তথ্যের ফাইলগুলো এনক্রিপশন করা যায়।
* আগেই বলা হয়েছে, বছরে অন্তত দুবার ওয়াই-ফাই পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করতে হবে। এরপরও হ্যাকার কর্তৃক তথ্য চুরি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। এজন্য প্রতিবেদক অজ্ঞাতনামা হিসাবে তথ্য অনুসন্ধান করতে পারেন। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরিতে রিপোর্টার দুই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। এক. ভিপিএন (VPN) এবং দুই. টর (TOR)। ভিপিএন (Virtual Private Network) মূলত অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে মাস্ক পরিয়ে দেয়। প্রতিবেদক অনুসন্ধান করার সময় নিজের পরিচয় ও অবস্থান গোপন রাখতে পারেন ভিপিএন ব্যবহার করার সময়। ফলে গোপন কোনো তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে খুবই নিরাপদে তিনি তথ্য ব্যবহার করতে পারেন। দ্বিতীয়টি হলো খুবই পরিচিত প্রক্সি নেটওয়ার্ক টর (Tor)। টর ব্রাউজারের মাধ্যমে ব্যবহারকারী আলাদা আইপি ঠিকানা পেয়ে থাকেন। কারণ টর এনক্রিপটেড কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সুবিধা দিয়ে থাকে। তবে এর অর্থ এই নয় যে ব্যবহারকারীকে খুঁজে বের করা যাবে না। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ২০১৪ সালের নভেম্বরে এফবিআই এবং ইউরোপের কিছু প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে ১৭ জন টর অপব্যবহারকারীকে খুঁজে বের করা হয়। যারা টর ব্যবহার করে অপরাধকার্য সম্পাদন করছিলেন। তবে গড়পড়তা সাধারণ জনগণ

> “প্রযুক্তিবান্ধব হতে না পারলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অনেক কঠিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেখানে সংবাদ পরিবেশনকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, সেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ”

এবং সাংবাদিকের জন্য এমন অভিযান হওয়ার আশঙ্কা কম। কারণ তারা তো আর অপরাধকার্য যেমন: অস্ত্র, মাদক কিংবা পর্নোগ্রাফির মতো বিষয়ের সঙ্গে জড়িত নন।

* অনুসন্ধানী সাংবাদিককে ক্লাউড সার্ভার ব্যবহার করার সময় অবশ্যই লক্ষ রাখতে হবে স্পর্শকাতর তথ্যাদি গুগল ড্রাইভ, ড্রপবক্স, ওয়ানড্রাইভ ব্যবহার করে যেন স্থানান্তর না করা হয়। এ ধরনের উন্মুক্ত ক্লাউড সার্ভারের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তৃতীয় পক্ষ যেন প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করতে না পারে সেজন্য ল্যাপটপ, কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনের ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন বন্ধ রাখতে হবে। আপনার কম্পিউটার থেকে তথ্য মুছে ফেলে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই তথ্য অন্য কেউ আবার রিস্টোর করতে পারেন। এজন্য উইন্ডোজ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইরেজার (সফটওয়্যারটি খুঁজে পাবেন http://eraser.heidi.ie) বা সিকিউর ইরেজার (সফটওয়্যারটি খুঁজে পাবেন http://www.secure-eraser.com) সফটওয়্যার ব্যবহার করতে পারেন। ম্যাক ব্যবহারকারীরা সুপার ইরেজার (http://www.doyourdata.com/data-erase-software/ super-eraser.html) ব্যবহার করতে পারেন।
* ই-মেইল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিককে নিরাপদ থাকতে হবে। জিমেইল, ইয়াহুর মতো মেইলগুলো ব্যবহার করলে অনুসন্ধানী সাংবাদিক হ্যাকারের আক্রমণের শিকার হতে পারেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদক সেই ই-মেইল ব্যবহার করবেন, যে ই-মেইলে এসএসএল (SSL-Secure Sockets Layer) অথবা টিএলএস (TLS-Transport Layer Security) রয়েছে। এসএসএল ও টিএলএস ই-মেইলের এনক্রিপশন নিশ্চিত করে থাকে। ই-মেইলের কন্টেন্ট এনক্রিপশনের জন্য পিজিপি (PGP-Pretty Good Privacy) নিরাপত্তার সমাধান দিয়ে থাকে। পিজিপি এর মাধ্যমে ই-মেইল এনক্রিপ্ট করা হলে প্রাপক ছাড়া আর কেউ এই ই-মেইলে প্রবেশ করতে পারবে না। মাইক্রোসফট আউটলুক অ্যাড-অনসের মাধ্যমে পিজিপি অফার করে থাকে।
* ই-মেইলের মতো টেক্সটিংয়ের ক্ষেত্রেও নিরাপত্তার বিষয়টি মনে রাখতে হবে। বাংলাদেশে সাধারণত মেসেঞ্জার ব্যবহার করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। মেসেঞ্জারের বাইরেও হোয়াটসঅ্যাপ, স্ন্যাপচ্যাট ব্যবহার করা হয়। এগুলোর মাধ্যমে খুব সহজেই তথ্য, ছবি, ভিডিয়ো আমরা অন্যত্র পাঠাতে পারি। কিন্তু বার্তার নিরাপত্তা নিয়ে কখনোই ভাবা হয় না। হোয়াটসঅ্যাপ এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের ঘোষণা দিয়ে থাকে। মনে রাখতে হবে, এগুলো সম্পূর্ণ নিরাপত্তা দিতে সক্ষম নয়। এ কারণে এগুলোর মাধ্যমে গোপনীয়, স্পর্শকাতর তথ্য বিনিময় না করাই উত্তম। বরং এগুলোর চেয়ে সিগন্যাল, ওয়্যার, টেলিগ্রাম অনেক বেশি নিরাপদ। তথ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে পাবলিক ডিভাইস ও পাবলিক নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।
* ফোনে কল করার সময়ও সাবধান থাকতে হবে। ব্যক্তি থেকে ব্যক্তি কথা বলার সময় তৃতীয়পক্ষ ফোনালাপ ফাঁস করতে পারেন। এজন্য ফোনে কথা বলার সময় স্পর্শকাতর ও গোপনীয় বিষয়ে কথা না বলাই উত্তম। জনপ্রিয় সার্ভিস স্কাইপে এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের গ্যারান্টি দেয় না। অন্যদিকে ওয়্যার অথবা সিগন্যাল এন্ড টু এন্ড এনক্রিপশনের কথা বলে থাকে। কিন্তু এটিরও শতভাগ নিশ্চয়তা নেই।

তৃতীয় পর্ব: তথ্য উপস্থাপন

অনুসন্ধানী সাংবাদিক তথ্য উপস্থাপনের সময় ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করতে পারেন। এক্ষেত্রে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশন (Data visualization), চার্টস ও ডায়াগ্রামস (Charts and diagrams), ম্যাপিং (Mapping) ব্যবহার করতে পারেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে এমন উপস্থাপন পাঠকের কাছে সংবাদটি আরও সহজবোধ্য করে তুলবে। ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের ক্ষেত্রে সাইটোস্কেপ (https://js.cytoscape.org/) ব্যবহার করতে পারেন। সাইটোস্কেপের ওয়েবসাইটে গিয়ে ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের কিছু ডেমো দেখা যেতে পারে। এছাড়াও ইলাস্টিক, মিডিয়াউইকির মাধ্যমেও ডেটা ভিজুয়ালাইজেশনের কাজ করা যায়। চার্টস ও ডায়াগ্রামের মাধ্যমে তথ্য উপস্থাপন মাইক্রোসফট অফিসের এক্সেল ব্যবহার করেই তৈরি করা যায়। তবে আকর্ষণীয় চার্টস ও ডায়াগ্রাম তৈরির জন্য ডেটার‍্যাপার (https://www.datawrapper.de/) ব্যবহার করতে পারেন। ম্যাপিংয়ের জন্য কারটো (https://carto.com/) ব্যবহার করা যেতে পারে। তথ্য উপস্থাপনের জন্য এর বাইরেও আরও অনেক সাইট রয়েছে, আরও আছে বিভিন্ন গ্রাফিক্স সফটওয়্যার। গ্রাফিক্স সফটওয়্যারগুলোর মধ্যে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর, ফটোশপ, কোরেল ড্র ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে বলা যায়, প্রযুক্তিবান্ধব হতে না পারলে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা অনেক কঠিন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেখানে সংবাদ পরিবেশনকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, সেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হয়ে উঠেছে গুরুত্বপূর্ণ। ডিজিটাল সুবিধাদি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতিবেদক এক্সক্লুসিভ প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পারেন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির সময় একজন প্রতিবেদক কীভাবে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করতে পারেন, সেই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ থেকে শুরু করে তথ্য উপস্থাপন ও তথ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত টুলস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

তথ্যসূত্র

১. কিংশুক, রুদ্র (২০১৯)। ঘোষ, রতনতনু (সম্পাদিত)। *উত্তরাধুনিকতা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

২. বিশ্বাস, দুলাল চন্দ্র (২০০৫)। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। গাইন, ফিলিপ (সম্পাদিত)। *রিপোর্টিং গাইড*। ঢাকা: সেড।

৩. মায়ার্স, পল (২০১৫)। *অনলাইন গবেষণা ও অনুসন্ধানের যত কৌশল*। Retrieved from: https://gijn.org/2015/অনলাইনে-গবেষণা-ও-অনুসন্ধান, ৪ মে ২০২১।

৪. হক, হাসান আজিজুল (২০১৯)। ঘোষ, রতনতনু (সম্পাদিত)। *উত্তরাধুনিকতা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

৫. Reddy, Martin (2011). *API Design for C++*. USA: Morgan Kaufmann.

৬. Investigative Journalism Manual (2021). Retrieved from: https://www.investigativemanual.org/en/chapters/techniques-for-data-security/, on 30 May 2021.

৭. Understandng the Search API (2021). Retrieved from: https://docs.marklogic.com/guide/search-dev/search-api#:~:text=The%20Search%20API%20is%20an,through%20XQuery%2C%20REST%2C%20Node., on 29 May 2021.

লেখক: প্রভাষক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)

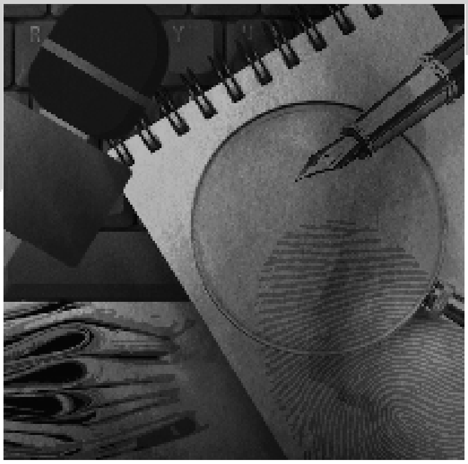

উপকূলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

রফিকুল ইসলাম মন্টু

বাংলাদেশের উপকূলে পড়ে আছে সংবাদের বৃহৎ ভান্ডার। যেদিকে চোখ যায়, যতদূর চোখ যায়, সংবাদের অসংখ্য উপাদান। একটু চোখ-কান খোলা রাখলে উপকূলের পথে পথে যে কোনো সাংবাদিক খুঁজে পেতে পারেন সেসব সংবাদসূত্র, যা সংবাদের সঙ্গে একজন সাংবাদিককেও এনে দিতে পারে পেশাগত মর্যাদা। এমন একটা সময় ছিল, যখন কেবল ঘূর্ণিঝড় এলেই খবরের শিরোনাম হতো উপকূল। ঘূর্ণিঝড়ের গতিপ্রকৃতি, কোনদিকে আঘাত হানতে পারে, কোথায় আঘাত হানল, কী ধরনের ক্ষতি হলো–এসবই একসময় মূলধারার সংবাদমাধ্যমে 'উপকূলের প্রধান খবর' হয়ে পাঠকের সামনে হাজির হতো। স্বাভাবিক সময়ের উপকূল যে কতটা অস্বাভাবিক, সেই খোঁজ কেউ রাখত না। একসময় উপকূল অঞ্চলে সাংবাদিকের সংখ্যা কম ছিল, সংবাদমাধ্যমের সংখ্যাও ছিল হাতেগোনা। উপকূল থেকে ঢাকায় বার্তাকক্ষে সংবাদ পাঠানোর সমস্যার কথা বলে শেষ করা যায় না। স্বাধীনতার আগে-পরের সময়কালে উপকূলের চলমান ঘটনার সংবাদ ঢাকায় পৌঁছানো ছিল অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আশি কিংবা নব্বইয়ের দশকেও উপকূলের সংবাদ পাঠাতে ঝক্কি কম ছিল না। সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানের সুযোগ তো ছিলই না, কোন কোন ক্ষেত্রে চলমান খবর কাভার করাই ছিল দুরূহ। সেই অবস্থা অনেকটাই কেটে গেছে। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে ১০–১৫ কিংবা ২০–২৫ বছর পেছনে ফিরে তাকালে উপকূলের সাংবাদিকতায় অনেক পরিবর্তনই চোখে পড়ে।

সেটা অন্তত আরও এক-দেড় দশকেরও আগের কথা। উপকূলের দুর্গম পথে, যেখানে খবরের জন্ম, সেখানে তখনও সেভাবে সাংবাদিকদের পা পড়েনি। ওই কেবল ঘূর্ণিঝড় কিংবা অন্য কোনো দুর্যোগের তথ্যগুলোই সংবাদমাধ্যমে খবর হয়ে আসত। কালে-ভদ্রে সাংবাদিকরা ছুটতেন উপকূলের পথে। সেসময়ে উপকূল ইস্যুতে সাংবাদিকদের আগ্রহের অভাব ছিল। ছিল দক্ষতার অভাব। প্রশিক্ষণের অভাব ছিল। তথ্যপ্রাপ্তি এবং পাঠানোর সমস্যা তো ছিলই। সবকিছুর উপরে কেন্দ্রীয় বার্তাকক্ষ প্রান্তিকের খবরে আগ্রহ দেখাত না। শীর্ষস্থানীয় সংবাদমাধ্যমের এক বার্তাপ্রধানকে একসময় বলতে শুনেছি, 'ও আচ্ছা, দ্বীপের মানুষ! ওরা নাগরিকসেবা পাবে না, নানা সংকটের মধ্যে জীবিকানির্বাহ করবে–এটাই তো স্বাভাবিক! এটা নিয়ে আবার খবর লিখতে হবে!' বাংলাদেশে 'উপকূল সাংবাদিকতার' গল্পের শুরুর সময়গুলো আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার ঝুলিতে জমেছে অনেক অভিজ্ঞতা। উপকূলের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে উপকূল সাংবাদিকতার পথ পরিষ্কারের চেষ্টা আমার জন্য অতটা সহজ ছিল না। কিন্তু এখন 'উপকূল' শব্দটা সবার কাছে বেশ পরিচিত। প্রায় সব সংবাদমাধ্যম শব্দটি ব্যবহার করে। দুর্যোগকালে শব্দটির ব্যবহার বেশি হয় এটা ঠিক; তবে অন্য সময়েও আজকাল উপকূল নিয়ে ভালো স্টোরি চোখে পড়ে। কখনো কখনো খবরের শিরোনামে 'উপকূল' শব্দটি ব্যবহার করা হয় খবরের গুরুত্ব বাড়াতে। পরিবর্তনের এই গল্প আমাদের মনে আশা জাগায়। উপকূল সাংবাদিকতায় আগ্রহ বাড়ায়। অনুপ্রাণিত হন অগণিত উদীয়মান তরুণ সাংবাদিক।

সময় বদলের ধারায় উপকূল ইস্যু নিয়ে সেই বন্ধ্যাত্ব অনেকখানি কেটেছে; প্রতিবন্ধকতার দেওয়াল ভাঙতে শুরু করেছে। কাগজ হোক, টিভি হোক অথবা অনলাইন–অনেক সংবাদমাধ্যমই এখন উপকূলকে সংবাদের বড়ো ক্ষেত্র হিসাবে ভাবতে শুরু করেছে। উপকূলের সংবাদের গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উপকূলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রসঙ্গটিও সামনে চলে আসে। আজকাল দেশের শীর্ষ সংবাদমাধ্যমগুলোও উপকূলের ইস্যুতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কথা ভাবছে। আর বহির্বিশ্বের সংবাদমাধ্যমে আরও আগে থেকেই উপকূল নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা অব্যাহত আছে। এই নিবন্ধের শিরোনাম থেকেই অনুমান করা যাচ্ছে, এই আলোচনা উপকূলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নিয়ে। তাহলে অনুসন্ধান বলতে আমরা কী বুঝি? এই প্রশ্নটাই সামনে আসে। প্রশ্নটির উত্তর পেলে অনায়াসে যে কোনো সাংবাদিক উপকূলে অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ে পা বাড়াতে পারবেন।

গল্পের গভীরে সন্ধান

যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান করতে হলে গল্পের গভীরে যেতে হবে। শুধু গভীরে নয়, আরও গভীরে এবং আরও গভীরে। মানে, যত গভীরে যাওয়া যায়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় একটি কথা আছে–পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে যত গভীরে যাওয়া যাবে, তত ভালো অনুসন্ধান হবে। তাই বলে বাজারের মুদি দোকান থেকে পেঁয়াজ কিনে খোসা ছাড়ালে কিন্তু হবে না। এখানে 'পেঁয়াজ' অর্থে বোঝানো হয়েছে বিষয় বা অনুসন্ধানের ইস্যুকে। অনুসন্ধানের জন্য ঘটনার আরও গভীরে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সাদা চোখে আমরা অনেক বিষয় দেখি। কিন্তু অনেক বিষয়ই আবার আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। বাইরে থেকে হয়তো অল্প কিছু দেখা যায় বা ধারণা করা যায়; কিন্তু পুরো বিষয়টি বোঝার জন্য যেতে হয় আরও গভীরে। বিষয়টি হয়তো এতকাল ধরে চাপা পড়ে ছিল; কখনোই প্রকাশের আলোয় আসেনি। অনুসন্ধানের জন্য বিষয় নির্বাচনের আগে অবশ্যই দেখতে হবে সে বিষয়ে পাঠকের আগ্রহ আছে কি না, কিংবা বিষয়টির জনগুরুত্ব আছে কি না! দেখা প্রয়োজন বিষয়টি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট কি না! এ ধরনের কয়েকটি চিন্তা সামনে রেখে যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধান শুরু করতে পারেন সাংবাদিক। কোনো একটি বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা মানে, একটি বিস্তৃত গবেষণাকর্ম। সাংবাদিককে গবেষণার জন্য পুরো প্রস্তুতি নিয়ে মাঠে নামতে হয়। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়ের গোপন তথ্য, যা ইতঃপূর্বে উন্মোচিত হয়নি অথবা যে তথ্য কেউ ইচ্ছা করে গোপন করে রেখেছিল, সেসব তথ্য পরিকল্পনামাফিক উন্মোচন করার নামই অনুসন্ধান।

অনুসন্ধানের সময় একজন সাংবাদিকের সামনে অসংখ্য প্রশ্ন জড়ো হয়। অনেক বেশি প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়া ভালো সাংবাদিকতার লক্ষণ। সাংবাদিক যত বেশি বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হবেন, তত বেশি তাকে প্রশ্নগুলো তাড়িত করবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিককে গবেষণার মাধ্যমে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনকে অন্য অর্থে বলা হয় মৌলিক গবেষণা। কখনো কখনো কোনো সাংবাদিককে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সম্পন্ন করার জন্য মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর লেগে থাকতে হয়। তবে সেজন্য অবশ্যই একটি সুপরিকল্পিত স্টোরি পরিকল্পনা প্রয়োজন। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রশ্ন উত্থাপন করে, প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করে পাঠকের সামনে হাজির করে এবং সমস্যাটি সমাধানের পথ দেখায়। আমেরিকান প্রেস ইনস্টিটিউট সাংবাদিকতার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে, সেই সংজ্ঞা কিন্তু অনুসন্ধানের কথাই বলে। সেখানে বলা হয়েছে, 'সাংবাদিকতা হলো সংবাদ এবং তথ্য সংগ্রহ, মূল্যায়ন, তৈরি এবং উপস্থাপনের কার্যকলাপ। একই সঙ্গে সংবাদ হলো ওই ক্রিয়াকলাপগুলোর ফসল।' এই সংজ্ঞা সাংবাদিকদের অনুসন্ধানেরই পথ দেখায়। আমরা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এসব মানদণ্ড বিবেচনায় রাখলে উপকূলে চোখ ফেরালে সেখানেও পাওয়া যাবে বহুমুখী অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র। ছোটো ছোটো অনেক গল্প। গল্পের অফুরন্ত ভান্ডার। গল্পগুলো জোড়া লাগান, খুঁজুন এক গল্পের সঙ্গে অন্য গল্পের সন্ধি। গল্পগুলোর আরও গভীরে যান, সেখানে আছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মালমসলা।

ভৌগোলিক অবস্থান

উপকূলের ভূগোল বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে প্রায় সবারই কমবেশি ধারণা আছে। তবে উপকূলের কোনো ইস্যুতে অনুসন্ধান করার আগে অবশ্যই উপকূলের ভূগোল বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা রাখা খুবই জরুরি। সংজ্ঞার সূত্রে বলা যায়, সমুদ্র এবং নদীর তীরবর্তী এলাকাকে উপকূল বলে। উপকূলকে বুঝতে হলে এই সংজ্ঞার আরও ভেতরে যেতে হবে। জোয়ারে ঘোলা জলে ডুবে যাওয়া উপকূল ভাটায় শুকিয়ে যায়। আর এই জোয়ার-ভাটা, দুর্যোগ, দুর্বিপাকের সঙ্গেই মিশে আছে উপকূল অঞ্চল। আরও একটু পরিষ্কার করে বলা যায়, তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের ওপর দাঁড়িয়ে আছে বাংলাদেশের উপকূল। এগুলো হলো জোয়ার-ভাটার বিস্তৃতি, লবণাক্ততার প্রভাব ও ঘূর্ণিঝড়ের বাতাস। এর ওপর ভিত্তি করেই আবার উপকূলের সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে। সংজ্ঞার নিরিখে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলের ১৯টি জেলাকে উপকূলীয় জেলা হিসাবে ধরা হয়। এই গোটা উপকূলকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। উপরে উল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তিনটিই যেখানে বিদ্যমান, সেই এলাকাকে প্রত্যক্ষ উপকূল এবং তিনটির মধ্যে দুটি যেখানে বিদ্যমান, সেই এলাকা পরোক্ষ উপকূল হিসাবে চিহ্নিত হয়।

সাংবাদিকতার চোখে উপকূলের এই ১৯টি জেলাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। পূর্ব উপকূলে আছে ছয়টি জেলা। এগুলো হচ্ছে:

চট্টগ্রাম, ফেনী, নোয়াখালী, কক্সবাজার, চাঁদপুর ও লক্ষ্মীপুর। গোটা উপকূলের মধ্যে এই পূর্ব অংশটি বেশ পুরোনো। এই অঞ্চলের অনেক এলাকা পাহাড় অধ্যুষিত। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ মহেশখালী এই পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো সমুদ্রসৈকতের অবস্থান পূর্ব উপকূলে। লবণ চাষের মতো একটি অর্থকরী সম্পদের উৎপাদন এই পূর্ব উপকূলে, যা বাংলাদেশের অন্য কোথাও দেখা যায় না। নদীভাঙন, পাহাড়ধস, পাহাড়ি ঢল, খাসজমি, বন ও বনায়ন প্রভৃতি নানা বিষয় আছে পূর্ব উপকূলে। মধ্য উপকূলের অবস্থান উপকূলের ঠিক মধ্যভাগে। এর অধিকাংশই মেঘনা অববাহিকায় অবস্থিত। এখানে আছে সাতটি জেলা। জেলাগুলো হচ্ছে: বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, ভোলা ও শরীয়তপুর। মধ্য উপকূলের বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভিন্ন। এই অঞ্চলে নদীভাঙনের প্রবণতা বেশি। মেঘনাসহ বিভিন্ন নদীর অনেক স্থান নিয়মিত ভাঙনের মুখে। এই ভাঙনের সঙ্গে আবার আছে গড়া। পলি জমে সৃষ্টি হয় অনেক নতুন চর। এ কারণে মধ্য উপকূলে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ-চরের সংখ্যা বেশি। এই দ্বীপগুলোর সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ সমস্যা অনেক প্রকট। আর এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতা আরও নতুন নতুন সংকটের জন্ম দেয়। কিছু মানুষ এসব সংকটের মধ্যেই বসবাস করেন যুগের পর যুগ। মধ্য উপকূলেও আছে বন ও বনায়ন সংক্রান্ত

> উপকূলে অনুসন্ধানের জন্য সাংবাদিকদের চোখ-কান খোলা রাখা খুব জরুরি। ইস্যু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে উপকূলের ভূগোল। এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নজর রাখলেই ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ইস্যু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে

অনেক বিষয়। রুপালি ইলিশ আহরণের জন্য বিখ্যাত মধ্য উপকূলের অনেক এলাকা। পশ্চিম উপকূল, যাকে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল হিসাবে অনেকে চিনে। সংজ্ঞার আলোকে এই অঞ্চলে আছে ছয়টি জেলা। এগুলো হচ্ছে: খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, নড়াইল ও গোপালগঞ্জ। শেষের তিনটি জেলা একেবারেই পরোক্ষ উপকূল হিসাবে চিহ্নিত। ওই জেলাগুলোয় উপকূলীয় বিষয়গুলো দৃশ্যমান নয়। অন্য তিনটি জেলায় আছে উপকূলীয় অনেক ইস্যু। গত কয়েক দশকে পশ্চিম উপকূলে লবণাক্ততা একটি বড়ো সমস্যা হিসাবে সামনে এসেছে। খাবার পানির সংকটও এই এলাকায় তীব্র আকার ধারণ করে। পশ্চিম উপকূলের জন্য বিশ্ব ঐতিহ্য সুন্দরবন একটি বড়ো ইস্যু বলে বিবেচিত। বহুমানুষ সুন্দরবনকেন্দ্রিক জীবিকানির্বাহ করে।

ইস্যু নির্বাচন

উপকূলে অনুসন্ধানের জন্য সাংবাদিকদের চোখ-কান খোলা রাখা খুব জরুরি। ইস্যু নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সহায়ক হতে পারে উপকূলের ভূগোল। এলাকার বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে নজর রাখলেই ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ইস্যু খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। উপকূলের ইস্যুগুলোকে আমরা এখানে কয়েকটি মোটা দাগে চিহ্নিত করতে পারি। যেমন: অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক, সম্ভাবনা বিকাশ সংক্রান্ত, পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তন, জীবন-জীবিকা, যোগাযোগ অবকাঠামো, নাগরিকসেবা, উন্নয়ন, অপ-উন্নয়ন, দুর্নীতি-অপরাধ সংক্রান্ত, দুর্যোগ সংক্রান্ত। এ বিষয়গুলোর মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার অনেক বিষয়। কোনো একটি বিষয়কে চারদিক থেকে, চার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে কোথাও না কোথাও অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সূত্র বের হবে। উপকূল অঞ্চলে বৃহৎ খবরের ভান্ডার থেকে এখানে মোটা দাগে সামগ্রিক প্রেক্ষাপট থেকে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

* **অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডভিত্তিক:** অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড উপকূল অঞ্চলের একটি বৃহৎ ক্ষেত্র। মৎস্য ও কৃষিক্ষেত্রে জাতীয় অর্থনীতিতে উপকূলের আছে বড়ো অবদান। এগুলোর মধ্যে ইলিশ আহরণ অন্যতম। কয়েক বছর ধরে ইলিশের উৎপাদন ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা ইলিশ আহরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত, সেই মৎস্যজীবীরা এর সুফল কতটা পাচ্ছেন, খতিয়ে দেখা দরকার। ইলিশ উৎপাদনের জন্য সরকারের দেওয়া ভর্তুকি মৎস্যজীবীদের কাছে কতটা পৌঁছাচ্ছে, তা নিয়ে অনুসন্ধানের যথেষ্ট সুযোগ আছে। উপকূল অঞ্চলে রয়েছে লবণ উৎপাদন। বহুমানুষ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে লবণ উৎপাদন করলেও তারা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। একইভাবে অন্যান্য কৃষিপণ্যের কথাও বলা যায়। পূর্ব উপকূলে লবণ উৎপাদনের সঙ্গে যোগ করা যায় পশ্চিম উপকূলের চিংড়ি চাষকে। এ ক্ষেত্রগুলোয় নজর রাখলে অনুসন্ধানের অনেক সূত্র বের হতে পারে।

* **সম্ভাবনা বিকাশ সংক্রান্ত:** বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে আছে বৃহৎ সম্ভাবনার ক্ষেত্র। পৃথিবীর বহুদেশেই এত বড়ো উপকূল নেই। অনেক দেশে উপকূলের একাংশও পায়নি। আবার যেসব দেশ উপকূলের সামান্যতম অংশ পেয়েছে, তারাও সেটুকুর সম্ভাবনা বিকাশের মধ্য দিয়ে দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে গেছে। উপকূল অঞ্চলে আছে পর্যটনের বিরাট এক সম্ভাবনা। প্রয়োজনীয় উদ্যোগের অভাবে পর্যটন সম্ভাবনা বিকাশের ক্ষেত্রে আমরা বহুমুখী প্রতিবন্ধকতা লক্ষ করছি। অন্যদিকে উপকূল অঞ্চলে সম্ভাবনা বিকাশে গৃহীত প্রকল্পগুলো ঘিরে রয়েছে নানা প্রশ্ন। এসব বিষয় অনুসন্ধানের দাবি রাখে। উপকূলের সম্ভাবনাগুলো বিকাশে কী করণীয়, এসব নিয়ে অনুসন্ধান হতে পারে।

* **পরিবেশ জলবায়ু পরিবর্তন:** এ বিষয়টি বাংলাদেশের উপকূলের জন্য খুবই প্রযোজ্য। পৃথিবীজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে প্রথম সারিতে আছে বাংলাদেশের নাম। আর বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্ষতির মুখে থাকা এলাকাটির নাম উপকূল অঞ্চল। এখানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এখন প্রায় দৃশ্যমান। ঘন ঘন সাইক্লোন, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস উপকূলের মানুষের জীবন বিপন্ন করে। অনেক স্থানে বেড়েছে লবণাক্ততা। বর্ষার কয়েক মাসে জোয়ারের পানির প্রবল চাপ উপকূলের মানুষের জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। কীভাবে টিকে আছে তারা, তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কী করণীয়–এসব বিষয়ে অনুসন্ধান হতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে অনেক প্রকল্প। সেই প্রকল্পগুলোর অবস্থা কী, তা থেকে মানুষ কতটা উপকৃত হচ্ছে, এসব নিয়ে হতে পারে অনুসন্ধান।

* **জীবন-জীবিকা:** উপকূল অঞ্চল নিয়ে কাজ করতে হলে মানুষের জীবন ও জীবিকার দিকে অবশ্যই নজর দিতে হবে। প্রতিটি

মানুষের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বড়ো বড়ো গল্প। আর এই গল্পগুলোর সঙ্গে কখনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক, আবার কখনো অনিয়ম-অব্যবস্থাপনা জড়িত আছে। এমনও হতে পারে, তার পাওয়ার কথা ছিল; কিন্তু পায়নি। অথবা তার জন্য বরাদ্দ ছিল, কিন্তু তার কাছে পৌঁছায়নি। এসব বিষয়ে খোঁজ পেতে মানুষের জীবনের গল্পগুলো নিবিড়ভাবে শুনতে হবে। উপকূলের বহুমানুষ একেকটি প্রাকৃতিক দুর্যোগে একেবারে নিঃস্ব হয়ে যায়। কিন্তু আবার তারা ঘুরে দাঁড়ায়। কোনো না কোনোভাবে এলাকায়ই বসবাস করে। আবার বহুমানুষ এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে প্রকল্পও নেওয়া হয় অনেক। সেগুলোর কী অবস্থা, সেসব প্রকল্পগুলো কি আদৌ তাদের জীবনমান উন্নত করতে পেরেছে–হতে পারে অনুসন্ধান। উপকূলের মানুষের জীবনের গল্পের বাঁকে বাঁকে আছে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সূত্র।

* **যোগাযোগ অবকাঠামো:** উপকূলের যোগাযোগ অবকাঠামোর দিকে চোখ ফেরালেও আমরা অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র পেতে পারি। সেখানকার অনেক এলাকা এখনো নদীপথনির্ভর। নৌপথ কিংবা জোয়ার-ভাটার ওপর ভর করে চলে সেখানকার মানুষের পথচলা। জেলা-উপজেলা কিংবা বিভাগীয় শহরের সঙ্গে উপকূলের প্রান্তিক এলাকার যাতায়াত, কিংবা কোনো দ্বীপের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতব্যবস্থার দিকে চোখ ফেরালে আমাদের সামনে উঠে আসে অন্য এক জগৎ, যেখানে আছে অনুসন্ধানী খবরের অনেক সূত্র। এই দুর্গম যোগাযোগ-যাতায়াতব্যবস্থা মানুষের জীবন নানাভাবে প্রভাবিত করছে। এর প্রভাব মানুষের আয়-রোজগারে, মানুষের স্বাস্থ্যব্যবস্থায়, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির ক্ষেত্রে। এসব ক্ষেত্র থেকে আমরা অনায়াসে অনুসন্ধানী খবরের সূত্র পেতে পারি।

* **নাগরিকসেবা:** অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার একটি বড়ো ক্ষেত্র নাগরিকসেবা ব্যবস্থা। প্রান্তিকের মানুষের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নাগরিকসেবা কার্যক্রম। কৃষক, জেলে থেকে শুরু করে সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের নাগরিকদের জন্য সরকারি অনেক ধরনের কর্মসূচি রয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন কিংবা নারীর উন্নয়ন-অগ্রগতির জন্য আছে কার্যক্রম। রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হয় ১০টি প্রকল্প। যথাযথ মানুষের এই সেবা পাওয়ার অধিকার আছে। কিন্তু দেখার বিষয় হচ্ছে, যথাযথ মানুষটির কাছে এ সেবাগুলো কতটা পৌঁছাচ্ছে। সাধারণ দৃষ্টিতে দেখা যায়, যতটা প্রান্তিকে চোখ রাখা যাবে, ততটাই সেবা প্রদানের অবস্থা খুবই খারাপ। প্রান্তিকের মানুষটি, পিছিয়ে পড়া মানুষটি কীভাবে বেঁচে আছে, কী তার জীবনের লড়াই–সেই খোঁজ কে রাখে! চোখ ফেরালে অসাধারণ স্টোরি আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে নাগরিকসেবার বিষয়গুলো থেকে।

* **উন্নয়ন ও অপ-উন্নয়ন:** উপকূল অঞ্চলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। আবার এরই বিপরীতে অপ-উন্নয়নের বার্তাও আছে। উন্নয়ন কাজগুলোর ঠিকঠাক বাস্তবায়িত হচ্ছে কি না, সেটা সাধারণ মানুষের উপকারে আসছে কি না, উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণের আগে মানুষের অভিমত নেওয়া হয়েছে কি না–আমরা খোঁজ নিতে পারি। এসব থেকে পাওয়া যেতে পারে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সূত্র। উপকূলের অনেক স্থানে দেখা গেছে, সড়কটি প্রয়োজন নেই, ব্রিজটির প্রয়োজন নেই, অথচ সেখানে সড়ক কিংবা ব্রিজ নির্মিত হচ্ছে বিপুল অর্থ ব্যয় করে। এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়। যেখানে খুব জরুরি একটা সড়ক বা ব্রিজের, সেখানে অর্থ বরাদ্দ হয় না। আমাদের অধিকাংশ প্রকল্পে উপকারভোগী মানুষের অভিমত নেওয়া হয় না। ভেড়িবাঁধটি হয়তো আর দুই ফুট উঁচু হওয়া দরকার ছিল; কিন্তু তা হয়নি। ফলে ভেড়িবাঁধ নির্মাণে অর্থব্যয় ঠিকই হয়; কিন্তু মানুষের ভোগান্তি কমে না। অধিকাংশ উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টান্ত আছে। আমরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সূত্র খুঁজতে গিয়ে এসব বিষয়ের দিকে নজর দিতে পারি।

* **দুর্নীতি-অপরাধ সংক্রান্ত:** এটা আমরা সবাই জানি, শুধু উপকূলে নয়, এ বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার বিষয় সারাদেশে বিরাজমান। কিন্তু উপকূল নিয়ে যারা অনুসন্ধান করতে চাই, তারা উপকূলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দুর্নীতি-অপরাধ সংক্রান্ত খবরের দিকে নজর দিতে পারি। উপরে উল্লেখ করেছি, নাগরিকসেবা খাতে নানা অনিয়ম-দুর্নীতি হয়। সেগুলো নিয়ে অবশ্যই অনুসন্ধানের সুযোগ আছে। এছাড়াও উপকূল অঞ্চলে নানা ধরনের অপরাধ গ্রুপ আছে, যাদের নিয়ে অনুসন্ধানী খবর তৈরি হতে পারে। এর মধ্যে কিছু বিষয় আমাদের জানা আছে আবার কিছু বিষয় আছে অন্তরালে। জলদস্যু অথবা সুন্দরবনের দস্যুবাহিনী, মানব পাচার, মাদক চোরাচালানের বিষয়গুলো আমরা প্রায় সবাই জানি। এগুলো সাংবাদিকদের বড়ো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় হতে পারে। অন্যদিকে ভূমিদস্যু, ভূমি দখল, বন কাটা, পাহাড় কাটা প্রভৃতি বিষয় নিয়েও অসাধারণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি হতে পারে। সেদিকে আমরা নজর দিতে পারি।

* **ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক বিপদ:** উপকূলের মানুষের জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবছর এক বা একাধিক ঘূর্ণিঝড় কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়েন উপকূলের মানুষ। এমন অনেক পরিবার আছেন প্রতিবছর একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মুখে পড়ে সর্বস্ব শেষ করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মানুষের জীবনের লড়াই বেড়ে যাচ্ছে। তাদের জীবনযাপনের ব্যয় বেড়ে যাচ্ছে। একজীবনে পাঁচ-সাতবার বাড়ি তৈরি করতে হয়। ঋণের ভার নিয়ে চলে তাদের জীবন। অনেকে এলাকা থেকে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হন। এসব মানুষের জীবনের গল্পগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক বিষয়। এখান থেকে আমরা পেতে পারি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার সূত্র। ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় বাংলাদেশ এখন বিশ্বের কাছে মডেল। কিন্তু আমরা কি ঘূর্ণিঝড় বা দুর্যোগব্যবস্থাপনায় সেই মডেল ধরে রাখতে পারছি। ঘূর্ণিঝড়ের আগে, ঘূর্ণিঝড়ের সময়ে এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরের সময়কালে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কী ত্রুটি আছে–আমরা খোঁজ নিতে পারি। দুর্দান্ত সব অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র বের হতে পারে এখান থেকে।

* **বন ও বনায়ন:** উপকূলীয় বন ও বনায়নের বিষয়টি প্রায় সবারই জানা। এখান থেকেও আমরা অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় বের করে আনতে পারি। আগেই উল্লেখ করেছি, জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে আছে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চল, তা সত্ত্বেও যথাযথ নিরাপত্তাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি উপকূলজুড়ে। বনের সবুজ দেওয়াল উপকূলকে সুরক্ষা দিতে পারে ঝড়ের ঝাপটা

থেকে। কিন্তু সেই দেওয়াল গড়ে ওঠছে কি! উপকূলে বনায়নের গল্প যেমন আমাদের কাছে আছে, তেমনই বনসম্পদ উজাড় হওয়ারও অনেক গল্প আছে। সংরক্ষণ উদ্যোগের চেয়ে ধ্বংসযজ্ঞ প্রক্রিয়া জোরদার থাকলে একসময় বন কমে যেতে বাধ্য। অন্যদিকে আমাদের এক অমূল্য সম্পদ দিয়ে রয়েছে, যার নাম সুন্দরবন। শুধু উপকূল নয়, গোটা বাংলাদেশ, এমনকি কখনো কখনো পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ অবধি ঝড়ের ঝাপটা থেকে নিরাপত্তা দেয় এই সুন্দরবন। কিন্তু সুন্দরবন সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও আছে নানা সমস্যা। বনের ওপর মানুষের অত্যাচারের শেষ নেই। অথচ সুন্দরবন এই মানুষেরই সুরক্ষা দেওয়াল হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এসব বিষয় থেকে আমরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন লেখার ইস্যু পেতে পারি নিঃসন্দেহে।

জরুরি সময়ের ধারণা

জরুরি সময়গুলো আপনার সামনে অসাধারণ সব অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ধারণা হাজির করতে পারে। উপকূলের ইস্যুর জন্য এই লাইনটি আরও বেশি প্রযোজ্য। উপকূল অঞ্চলের জন্য প্রচলিত একটি জরুরি সময় ঘূর্ণিঝড়। বার্তাকক্ষ থেকে শুরু করে মাঠপর্যায়ের সব সাংবাদিক এসময় খুব ব্যস্ত থাকেন। সংবাদ সংগ্রহ এবং সংবাদ পাঠানো তখন খুবই চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়ায়। এত কাজের ভিড়ে এই জরুরি সময়ে অন্য কোনো বিশেষ স্টোরির চিন্তা করার সময় থাকে না। ঘটনার পরেই আমরা সাধারণত এক-দুইদিন আগে ঘটে যাওয়া চলমান ইস্যুটি ভুলে যাই। কিন্তু আপনি যদি গোটা ঘটনাটি বিশ্লেষণ করেন, ঘূর্ণিঝড়ের এই জরুরি সময়ের মধ্যেই আছে, অনেক ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সূত্র। আপনাকে অবশ্যই চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। ঘূর্ণিঝড়ের আগে, ঘূর্ণিঝড়ের সময় এবং ঘূর্ণিঝড়ের পরে কী হলো? নোট রাখুন এবং এখান থেকে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পরিকল্পনা করুন। আরেকটি জরুরি সময় এক বছরের বেশি সময় ধরে পার করছে বাংলাদেশ এবং গোটা বিশ্ব। এটি হচ্ছে কোভিড-১৯ মহামারি। জাতীয়ভাবে যেমন এর প্রভাব পড়েছে, ঠিক তেমনি এলাকাভিত্তিক প্রভাবও পড়েছে। ধাক্কা লেগেছে উপকূল অঞ্চলে। ইতোমধ্যে বেসরকারি পর্যায়ের বেশ কয়েকটি সমীক্ষা থেকে উপকূলে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রভাবের ছবি উঠে এসেছে। এই প্রভাবের বিষয়গুলো আমাদেরকে অনেক ধরনের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পথ বের করে দিতে পারে। এজন্য বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে জরুরি সময়টা একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

প্রতিবেদন পরিকল্পনা

একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য প্রতিবেদন পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই বাক্যটি শুধু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়, সব ধরনের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আসলে সুষ্ঠু পরিকল্পনাই একটি কাজকে যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে। এজন্য কাজে নামার আগে পরিকল্পনায় বেশি জোর দেওয়া প্রয়োজন। পরিকল্পনা যে কোনো কাজের দিকনির্দেশনা হিসাবে কাজ করে। প্রতিবেদন পরিকল্পনার জন্য নিচের কয়েকটি বিষয়ে নজর দেওয়া খুবই জরুরি।

বিষয় নির্বাচন: সবার আগে প্রতিবেদনের বিষয় নির্বাচনে মনোযোগ দিন। ভেবে দেখুন বিষয়টি যথোপযুক্ত কি না। আরও একবার চিন্তা করুন, এই বিষয়ে কাজ করতে আপনার আগ্রহ আছে কি না। আপনার সক্ষমতার বিষয়টিও এখানে বিবেচনায় রাখা উচিত। বিষয় নির্বাচনের আগেই আপনাকে ভেবে নিতে হবে এই প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত মিলবে কি না। ভেবে নিন, কাজটি আদৌ আপনার পক্ষে সম্পন্ন করা, মানে শেষ অবধি যাওয়া সম্ভব হবে কি না। কাজটির জন্য প্রয়োজন হবে অর্থ, বিষয় নির্বাচনের সময়েই ভেবে নিন প্রয়োজনীয় অর্থ ও সময় পাওয়া যাবে কি না।

লক্ষ্য নির্ধারণ: বিষয় নির্বাচনের পরেই আপনার সামনে যে বিষয়টি আসবে, সেটি হচ্ছে লক্ষ্য নির্ধারণ। আপনাকে প্রতিবেদনের একটি ফোকাস নির্ধারণ করতে হবে। কখনো কখনো বিষয়টিকে চারদিক থেকে দেখতে গিয়ে আমরা চার ধরনের বিষয় পাই। তখন খবরের চারটি-পাঁচটি মুখ হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থায় একই বিষয়ে একাধিক রিপোর্ট হতে পারে কি না ভাবতে হবে। সেক্ষেত্রে সিরিজ প্রতিবেদনের পরিকল্পনা করা যেতে পারে। বিষয়সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার তালিকা করা দরকার। তথ্যের উৎসগুলোরও একটি তালিকা করে নেওয়া যেতে পারে।

এলাকা নির্বাচন: প্রতিবেদন পরিকল্পনায় থাকতে হবে সরেজমিন তথ্য সংগ্রহের বিষয়টি। সরেজমিন এলাকা পর্যবেক্ষণ না করলে আপনার অনেক বিষয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সেজন্য পরিকল্পনা পর্যায়েই বিষয়সংশ্লিষ্ট সরেজমিন এলাকা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। একাধিক সরেজমিন এলাকার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা উচিত। তাহলে বিষয় সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা সহজ হবে। অনুসন্ধানের বিষয়টি যাচাই করাও সহজ হবে। সরেজমিন এলাকা নির্বাচনের সময়ই আপনাকে এর ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে হবে। সেখানকার যাতায়াতব্যবস্থা কী, সেখানে কীভাবে যাওয়া যাবে, সেখানে কোথায় অবস্থান করবেন ইত্যাদি বিষয়ে আগেই খোঁজ নিতে হবে।

> “একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকের জন্য প্রতিবেদন পরিকল্পনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যদিও এই বাক্যটি শুধু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা নয়, সব ধরনের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আসলে সুষ্ঠু পরিকল্পনাই একটি কাজকে যথাযথ স্থানে পৌঁছে দিতে সাহায্য করে”

সরেজমিন তথ্য সংগ্রহ: সরেজমিন তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনার থাকতে হবে আরেকটি পরিকল্পনা। আগে থেকেই মাঠ সরেজমিন চেকলিস্ট তৈরি করে রাখতে পারেন। আপনি সরেজমিনে গিয়ে কী তথ্য বা উপাদান প্রত্যাশা করেন, আগে থেকে পরিকল্পনা থাকলে সেগুলো পেতে সহজ হবে। মাঠ সরেজমিনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে রাখতে হবে। অনেক সময় আমরা শুধু তথ্য নোট করি। দৃশ্যপটগুলো ভুলে যাই। সেজন্য সরেজমিনের পর্যবেক্ষণগুলো নোট করা খুবই জরুরি। সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যেমন আপনাকে কথা বলতে হবে, তেমনই কমিউনিটির অন্যদের সঙ্গেও কথা বলতে হবে। বিভিন্ন পেশাজীবীর সঙ্গে কথা বলতে হবে। তথ্য অবশ্যই ক্রস চেক করা খুবই জরুরি। সরেজমিনে গিয়ে আপনি নোটবুকে নোট নিতে

পারেন, বক্তব্য রেকর্ড করতে পারেন, ভিডিয়ো করতে পারেন, আলোকচিত্র ধারণ করতে পারেন।

মাঠ জরিপ: সাধারণত যে কোনো বিশেষ প্রতিবেদনের জন্য আমরা প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষা প্রতিবেদনের অপেক্ষায় চেয়ে থাকি। কিন্তু কখনো কখনো রিপোর্টের প্রয়োজনে প্রতিবেদক নিজেই বিষয়ভিত্তিক মাঠ জরিপ করতে পারেন। এজন্য বিষয়ের আলোকে একটি জরিপ প্রশ্নমালা তৈরি করতে পারেন। প্রশ্নমালাটি আরও কার্যকর করতে বিশেষজ্ঞের সহায়তা নিতে পারেন। প্রতিবেদক নিজেই সময় নিয়ে জরিপ করাতে পারেন, অথবা এ কাজে লাগাতে পারেন স্থানীয় যুবকদের। প্রতিবেদকের নিজের পরিচালনায় এই জরিপ প্রতিবেদনের ফল প্রতিবেদনকে আরও শক্তিশালী করে এবং বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে সহায়তা করে।

গবেষণা তথ্য: আপনি যে বিষয়ে প্রতিবেদন পরিকল্পনা করেছেন, নিশ্চয়ই সে বিষয়ে পাওয়া যাবে গবেষণা তথ্য। এ বিষয়ে সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে কোনো গবেষণা হয়ে থাকলে সেটা আপনার প্রতিবেদনে সহায়ক হতে পারে। এজন্য আপনার বিষয়সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাছে খোঁজ নিতে পারেন। এজন্য অনলাইনের সহায়তা নিতে পারেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য: আপনি যে বিষয়ে প্রতিবেদন করছেন, নিশ্চয়ই সে বিষয়ে আছে সরকারি তথ্য। সেটা আপনার প্রতিবেদনের জন্য প্রয়োজন হবে। কোনো প্রকল্প সম্পর্কে জানতে খোঁজ নিন বরাদ্দ কত ছিল? কী করার কথা ছিল? কীভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে? কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর সম্পর্ক কী? জনগোষ্ঠীর মতামত নেওয়া হয়েছে কি না? প্রকল্প বাস্তবসম্মত কি না? এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আপনার অনুসন্ধানকে আরও বেশি পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সহায়তা করবে।

নীতিমালার খোঁজ: নীতিমালার খোঁজ নেওয়া খুবই জরুরি। আপনি যে বিষয়ে প্রতিবেদন পরিকল্পনা করেছেন, নিশ্চয়ই সে বিষয়ে সরকারের নীতিমালা আছে। দেখে নিন এ বিষয়ে কী নীতিমালা আছে অথবা আদৌ নীতিমালা আছে কি না। নীতিমালা থাকলে সেখানে কী বলা আছে, দেখে নিন। নীতিমালা অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, খোঁজ নিন। এই নীতিমালা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠী অবহিত কি না, সেটাও আপনাকে খোঁজ নিতে হবে। নীতিমালা একবার পড়ে নিলে আপনার অনুসন্ধানের পথ অনেক সহজ হয়ে যাবে।

সংশ্লিষ্টদের কথা: প্রতিবেদন পরিকল্পনায় অবশ্যই নোট রাখবেন আপনি এই প্রতিবেদনের জন্য কাদের সঙ্গে কথা বলবেন। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের কথা প্রতিবেদনে যুক্ত করুন। সরকারি কর্মকর্তারা কী বলেন? বেসরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা কী বলেন? সংশ্লিষ্ট অন্য ব্যক্তিরা কী বলেন? বিশেষজ্ঞ মহল কী বলেন?

তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ: অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের কথা ভুলবেন না। অবশ্যই আপনাকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ করতে হবে। মনে রাখবেন, এটি একটি গবেষণা। প্রতিবেদন প্রকাশের পরে যে কোনো সময়ে আপনার এসব তথ্য প্রয়োজন হবে। নোটবুক সংরক্ষণের পাশাপাশি রেকর্ডকৃত বক্তব্য সংরক্ষণে রাখুন। আলোকচিত্র এবং ভিডিয়ো সংরক্ষণ করুন। মনে রাখতে হবে, আপনি শুধু প্রতিবেদনের জন্য ছবি তুলছেন না, অনেক ছবি আপনার প্রতিবেদনের পক্ষে প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে।

অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রাখুন

উপকূলে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের বিষয় খুঁজে পেতে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটাই আপনাকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারে। নজর রাখতে হবে উপকূলের ইস্যুগুলোর দিকে। চলমান বিষয়ের সঙ্গে খুঁজতে হবে আড়ালে থাকা বিষয়গুলো। একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে যথোপযুক্ত চর্চাই একজন সাংবাদিককে বিষয়ের গভীরে নিয়ে যেতে পারে। উপকূল ইস্যুটা এর বাইরে নয়। বরং উপকূলের ইস্যুতে আরও বেশি মনোযোগ দিতে হবে। আলোচনার শুরুতে উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশের গোটা উপকূল অঞ্চল বিরাট খবরের ভান্ডার। এই ভান্ডারে আপনাকে অবশ্যই প্রবেশ করতে হবে। থাকতে হবে যথাযথ প্রস্তুতি। একজন সাংবাদিকের ভালো প্রস্তুতিই উপকূল নিয়ে একটি সাড়া জাগানো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্ম দিতে পারে।

লেখক: কোস্টাল জার্নালিজম স্পেশালিস্ট, কন্ট্রিবিউটিং রিপোর্টার দ্য গার্ডিয়ান (ইউকে), রয়টার্স (ইউকে), দ্য থার্ড পোল (ইউকে), গাঁও কানেকশন (ভারত), রাইজিংবিডি (বাংলাদেশ) ও ইন্টারনিউজ পরিচালিত আর্থ জার্নালিজম নেটওয়ার্কের ফেলো

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

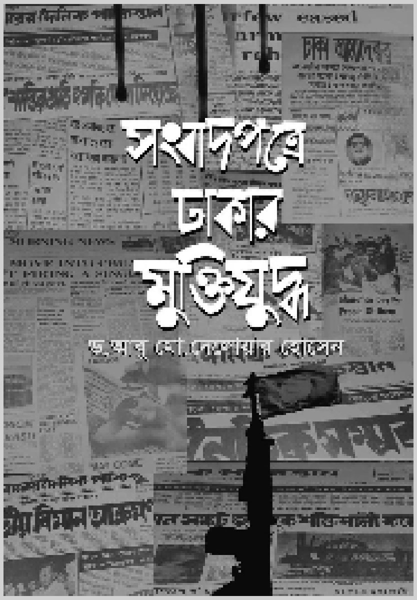

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

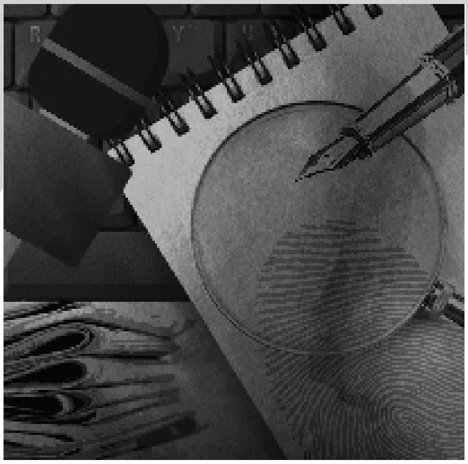

সময়ের সেরা পাঁচ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

মিনহাজ উদ্দীন

ব্রিটিশ লেখক জর্জ অরওয়েল (George Orwell) বলেছেন, ‘সাংবাদিকতা হলো এমন কিছু প্রকাশ করা, যা অন্য কেউ প্রকাশ করতে চাইবে না। বাকি সবকিছু জনসংযোগ।’ অরওয়েলের কথা অনুযায়ী এই অপ্রকাশিত, আড়ালে থাকা বিষয়ের প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরন্তন। মানুষ যুগে যুগে গভীর, বিশ্লেষণধর্মী তথা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পড়তে চান, যার সঙ্গে জনস্বার্থ জড়িত। (কীভাবে হবেন জনগণের কণ্ঠস্বর, ২০১৯)

সাংবাদিকতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। পাঠক ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য মুখিয়ে থাকেন। যে কারণে অনেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সাংবাদিকতার প্রাণ হিসাবে অভিহিত করে থাকেন। বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বেই গণমাধ্যমের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য থাকে ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বের করে আনা। এ লক্ষ্য থেকেই প্রতিনিয়ত গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ বা সম্প্রচারিত হয়ে আসছে। বলা যায়, সাংবাদিকতার শুরুর থেকেই এই চল শুরু, যা আজও বহাল।

বিশ্বব্যাপী এখন পর্যন্ত প্রকাশিত শত শত, হাজার হাজার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের মধ্য থেকে পাঁচটি প্রতিবেদন বেছে নেওয়া খুবই দুরূহ। অনেকটা দুঃসাধ্য কাজ। এতে বিতর্কের অবকাশও থাকে। আর যেহেতু বিশ্বব্যাপী নামকরা কোনো প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বা জরিপের ভিত্তিতে এমন কোনো তালিকা করেনি, সেহেতু এই কাজ আরও কঠিন। এই লেখায় যে

পাঁচটি প্রতিবেদনের কথা আলোচিত হয়েছে, এর ধারাক্রম বা বাছাইয়ের সঙ্গে পাঠক একমত না-ও হতে পারেন। আর যেহেতু লেখক বর্তমান যুগের প্রতিনিধি বা বয়সে তরুণ, তাই এই তালিকায় সমসাময়িক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলোও স্থান পেয়েছে।

১. ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি, ১৯৭২, ওয়াশিংটন পোস্ট

এই কেলেঙ্কারির সংবাদ সাংবাদিকতার ইতিহাসে ধ্রুপদি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদাহরণ হিসাবে স্বীকৃত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদপত্রের দুই তরুণ সাংবাদিক বব উডওয়ার্ড (Bob Woodward) ও কার্ল বার্নস্টেইন (Carl Bernstein) এই অনুসন্ধান করেছিলেন। যার ফলাফল হিসাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন ১৯৭৪ সালে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। দেশটির ইতিহাসে তিনিই একমাত্র প্রেসিডেন্ট, যিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন, যা তাকে করতে হয়েছিল অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সংবাদ প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল খুব সামান্য একটি ঘটনা থেকে। ১৯৭২ সালের জুনে ওয়াশিংটনের ওয়াটারগেট হোটেলে ডেমোক্রেটিক ন্যাশনাল কমিটির হেডকোয়ার্টারে একটি চুরির ঘটনা ঘটে। যে ঘটনায় কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। এই আটক ব্যক্তিদের মধ্যে কয়েকজনের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের পুনর্নির্বাচন প্রচারণা কমিটির (Committee to Re-Elect the President: CREEP) সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এই চোরেরা ওই হোটেলে টেলিফোনে আড়িপাতার যন্ত্র স্থাপন এবং বিভিন্ন নথি চুরি করেছিল। পরের দিকে এ ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছের লোকজনের সম্পৃক্ততা বের হয়ে আসে। এ বিষয়ে বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টেইনের একের পর এক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন পুরো ঘটনাটি মার্কিন জনগণের সামনে উন্মোচন করে। যাতে শুধু চুরির ঘটনায় সম্পৃক্ততায় নয়, এ ঘটনায় ক্ষমতার অপব্যবহারের অনেক ঘটনা প্রকাশিত হয়।

> “
>
> সাংবাদিকতার সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। পাঠক ভালো অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য মুখিয়ে থাকেন। যে কারণে অনেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সাংবাদিকতার প্রাণ হিসাবে অভিহিত করে থাকেন
>
> ”

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিয়ে অসাধারণ সাংবাদিকতা করার জন্য বব উডওয়ার্ড ও কার্ল বার্নস্টেইন সাংবাদিকতায় সম্মানসূচক পুলিৎজার পুরস্কার পান। আর এ ঘটনা নিয়ে তাঁদের লেখা বই অল দ্য প্রেসিডেন্টস মেন (All the President’s Men) ইতিহাসের বেশি বিক্রীত বই হিসাবে বিবেচিত।

২. দ্য মাই লাই ম্যাসাকার (The My Lai Massacre), **১৯৬৯, সেন্ট লুইস পোস্ট-ডিসপ্যাচ**

মাই লাই দক্ষিণ ভিয়েতনামের একটি অতি সাধারণ গ্রাম। যে গ্রামে বর্বর হত্যাকাণ্ড চালিয়েছিল মার্কিন সেনারা। ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ এই অভিযান পরিচালিত হয়েছিল। ভিয়েতনাম সরকারের তথ্য অনুযায়ী, এই গ্রামে এবং পার্শ্ববর্তী অন্য আরেকটি গ্রামে পরিচালিত অভিযানে ৫০৪ জন সাধারণ গ্রামবাসীকে হত্যা করেছিল মার্কিন সেনারা। ইতিহাসের অন্যতম বর্বর ও আলোচিত এ ঘটনা সংবাদমাধ্যমে আসে বেশ দেরিতে। সেন্ট লুইস পোস্ট-ডিসপ্যাচের সিমর হার্স (Seymour Hersh) এ বিষয়ে প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করেন ১৯৬৮ সালের মার্চে, যা নিয়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। মার্কিন সেনাবাহিনী বিষয়টিকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সিমর হার্সের তৎপরতা এবং একই সঙ্গে অন্যান্য মার্কিন সংবাদমাধ্যমের ভূমিকায় মার্কিন সেনাবাহিনীর ওই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। সিমর হার্সের ধারাবাহিক প্রতিবেদনের প্রেক্ষাপটে ওই অপারেশনের দায়িত্বে থাকা লে. উইলিয়াম ক্যালি জুনিয়রকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। এ বিষয়ে অসাধারণ অনুসন্ধানের জন্য ১৯৭০ সালে সিমর হার্স সাংবাদিকতায় সম্মানজনক পুলিৎজার পুরস্কার লাভ করেন।

৩. আরাফাতের মৃত্যুর কারণ কী? (What Killed Arafat?), ২০১২, আলজাজিরা

ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াসির আরাফাত। ফ্রান্সের একটি সামরিক হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয় ২০০৪ সালে। আরাফাতের মৃত্যুর আট বছর পর ২০১২ সালের ৪ জুলাই কাতারভিত্তিক আন্তর্জাতিক টেলিভিশন চ্যানেল আলজাজিরা তাদের নয় মাসব্যাপী অনুসন্ধানের ফলাফল নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে। যার শিরোনাম ছিল: What Killed Arafat? এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশের পর আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়।

ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু নিয়ে আগে থেকেই গুজব ছিল। মৃত্যুর আগে তাঁর স্বাস্থ্যও বেশ ভালো ছিল। কিন্তু ২০০৪ সালের ১২ অক্টোবর তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তারপর তাঁর মৃত্যু হয়। আলজাজিরা এই মৃত্যু নিয়েই অনুসন্ধান করে। তারা বিভিন্ন ল্যাবে আরাফাতের ব্যবহার্য জিনিসপত্র পরীক্ষা করতে পাঠায়। এগুলোর মধ্যে সুইজারল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব লুসানে ওইসব জিনিসপত্রে পলোনিয়াম (polonium) নামে মারাত্মক এক রাসায়নিকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে তাঁর শরীরে মাত্রাতিরিক্ত পলোনিয়ামের উপস্থিতি ছিল, যা তাঁর মৃত্যুর কারণ। ধারণা করা হয়, ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ কোনোভাবে এই মারাত্মক বিষ আরাফাতের শরীরে প্রবেশ করিয়েছে। যদিও ইসরাইলি কর্তৃপক্ষ তা অস্বীকার করে। এদিকে ২০১৩ সালে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে প্রকাশিত এক গবেষণায় একদল সুইস চিকিৎসক দাবি করে, ইয়াসির আরাফাত হয়তো পলোনিয়াম বিষক্রিয়ায়ই মারা গেছেন।

আলজাজিরায় এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর আরাফাতের মৃত্যুরহস্য নিয়ে নতুন করে তদন্তের দাবি ওঠে। আরাফাতের স্ত্রী সুহা আরাফাত স্বামীর মরদেহ উত্তোলন করে নতুন করে পরীক্ষা করার আহ্বান জানান। যার পরিপ্রেক্ষিতে মাহমুদ আব্বাসের সরকার আরাফাতের মরদেহ উত্তোলনের অনুমতি দেয়। ২০১২ সালের ২৭ নভেম্বর রামাল্লায় অবস্থিত আরাফাতের কবরস্থান থেকে সুইস, ফরাসি ও রাশিয়ান–তিনটি আলাদা গবেষক দল আরাফাতের দেহাবশেষ থেকে নমুনা সংগ্রহ করে। আগ্রহী যে কেউ নিচের লিংকে এই অনুসন্ধানটি দেখতে পারেন। ইউটিউবে এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি ৩১ লাখের অধিকবার দেখা হয়েছে।

https://www.youtube.com/watch?v=KBT7o0piZ8E

৪. পানামা পেপারস, ২০১৬, বিশ্বের প্রভাবশালী সব গণমাধ্যম

এটি একটি দলগত অনুসন্ধান। পানামা পেপারস সাংবাদিকতায় পরস্পরকে সহযোগিতার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক আদর্শ উদাহরণ।

বিশ্বের ৭০টি দেশের চার শতাধিক সাংবাদিক একটি আইন প্রতিষ্ঠানের ফাঁস হওয়া ১ কোটি ১৫ লাখ গোপন নথি নিয়ে অনুসন্ধান করেন। এতে রাজনীতিবিদ, খেলোয়াড়, ব্যবসায়ী, অপরাধীসহ অনেকের নাম বেরিয়ে আসে। যারা বেআইনিভাবে পানামার অফশোর অ্যাকাউন্টে টাকা রেখেছেন। এত বিশাল পরিমাণে নথি এককভাবে কোনো সাংবাদিকের পক্ষে বিশ্লেষণ করা সম্ভব ছিল না। তাই এই কাজটি হয়েছে দলগতভাবে (International Consortium)। দলগতভাবে সাংবাদিকরা আইনি প্রতিষ্ঠান মোসাক ফনসেকার নথিগুলো বিশ্লেষণ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করেছেন। যাতে সারা বিশ্বে আলোড়ন তৈরি হয়। অনেক দেশে সরকারের পতনও ঘটে।

ফাঁস হওয়া পানামা পেপারসে বিশ্বের শতাধিক ক্ষমতাধর মানুষ বা তাদের নিকটাত্মীয়দের বিদেশে টাকা পাচারের তথ্য পাওয়া যায়। তালিকায় দেখা যায়, চীন, যুক্তরাজ্য, সৌদি আরবের মতো ক্ষমতাধর রাষ্ট্রের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান বা তাদের আত্মীয় এসব অর্থ পাচারের সঙ্গে জড়িত। শুধু রাষ্ট্র বা সরকারপ্রধানরাই নন, বিশ্বখ্যাত ফুটবলার লিওনেল মেসি থেকে শুরু করে ভারতীয় চিত্রনায়িকা ঐশ্বরিয়া রাইও এই তালিকায় ছিলেন। তালিকায় ছিলেন অমিতাভ বচ্চনও। মেক্সিকোর মাদকসম্রাট বা শিয়া সংগঠন হাসান নাসারাল্লার হিজবুল্লাহর সঙ্গে যোগাযোগের কারণে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কালো তালিকায় থাকা ব্যবসায়ীরাও বাদ যাননি এ তালিকা থেকে।

> “অনুসন্ধানী এই প্রতিবেদনটি এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, এটি প্রকাশিত হওয়ার পর জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে বিশ্বের বড়ো বড়ো মানবাধিকার সংস্থা রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনটিকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে আসছে”

৫. ম্যাসাকার ইন মিয়ানমার, ২০১৮, রয়টার্স

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম বড়ো সংকটের নাম রোহিঙ্গা সংকট। মিয়ানমার সেনাবাহিনী ও বৌদ্ধ মিলিশিয়াদের অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ড থেকে বাঁচতে ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে, যা তৈরি করেছে সীমাহীন মানবিক দুর্যোগ। বাংলাদেশের জন্যও তৈরি হয়েছে ভীতিকর এক সংকট।

মিয়ানমারে মুসলিম এই জনগোষ্ঠীর প্রতি তাদের এই হত্যাযজ্ঞের বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশ করেছে। তবে বার্তা সংস্থা রয়টার্সের ‘Massacre in Myanmar: How Myanmar forces burned, looted and killed in a remote village’ শিরোনামের প্রতিবেদন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বার্তা সংস্থাটি প্রতিবেদনটি প্রকাশ করে ২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি। প্রতিবেদনটি তৈরি করেছিলেন মিয়ানমারের সাংবাদিক ওয়া লোনে এবং কিয়াও সোয়েও আর রয়টার্সের হেড অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সমন্বয় করেন সায়মন লুইস এবং এন্টনি স্লোডকোসয়স্কি। এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে মিয়ানমারের ইনদিন (INN DIN) গ্রামে ১০জন রোহিঙ্গাকে নিষ্ঠুরভাবে ঠান্ডামাথায় হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা উঠে আসে, যা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয়। এই প্রতিবেদনের কিছু অংশ ছিল নিম্নরূপ:

> INN DIN, Myanmar–Bound together, the 10 Rohingya Muslim captives watched their Buddhist neighbors dig a shallow grave. Soon afterwards, on the morning of Sept. 2, all 10 lay dead. At least two were hacked to death by Buddhist villagers. The rest were shot by Myanmar troops, two of the gravediggers said.
>
> ‘One grave for 10 people,’ said Soe Chay, 55, a retired soldier from Inn Din’s Rakhine Buddhist community who said he helped dig the pit and saw the killings. The soldiers shot each man two or three times, he said. ‘When they were being buried, some were still making noises. Others were already dead.’
>
> The killings in the coastal village of Inn Din marked another bloody episode in the ethnic violence sweeping northern Rakhine state, on Myanmar’s western fringe. Nearly 690,000 Rohingya Muslims have fled their villages and crossed the border into Bangladesh since August. None of Inn Din’s 6,000 Rohingya remained in the village as of October.
>
> The Rohingya accuse the army of arson, rapes and killings aimed at rubbing them out of existence in this mainly Buddhist nation of 53 million. The United Nations has said the army may have committed genocide; the United States has called the action ethnic cleansing. Myanmar says its ‘clearance operation’ is a legitimate response to attacks by Rohingya insurgents….

অনুসন্ধানী এই প্রতিবেদনটি এতটাই প্রভাবশালী ছিল যে, এটি প্রকাশিত হওয়ার পর জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে বিশ্বের বড়ো বড়ো মানবাধিকার সংস্থা রোহিঙ্গা সংকটের ক্ষেত্রে এই প্রতিবেদনটিকে রেফারেন্স হিসাবে ব্যবহার করে আসছে।

তথ্যসূত্র

১. কীভাবে হবেন জনগণের কণ্ঠস্বর (২০১৯): অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য একটি নির্দেশিকা, সৈয়দ নাজাকাত এবং কেএএস মিডিয়া প্রোগ্রাম এশিয়া সম্পাদিত।
২. *https://www.pulitzer.org/prize-winners-by-category/206*
৩. https://jagocommunications.com/investigative-journalism-top-5-worldwide-media-scoops/
৪. https://www.history.com/topics/1970s/watergate
৫. https://www.reuters.com/investigates/special-report/myanmar-rakhine-events/
৬. https://www.icij.org/investigations/panama-papers/five-years-later-panama-papers-still-having-a-big-impact/
৭. https://gijn.org/2020/01/02/the-15-most-influential-journalism-stories-in-us-history/

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

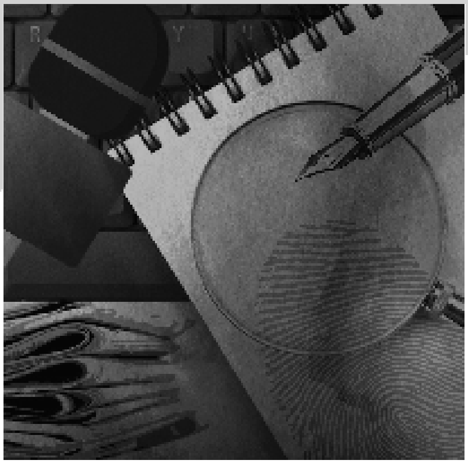

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা প্রেক্ষিত কোভিড-১৯

মো. শরিফুল ইসলাম

করোনা মহামারি পুরো বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। বদলে দিয়েছে বিশ্বের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি। সেই বদলের হাওয়া এসে পড়েছে গণমাধ্যমের পালেও। গণমাধ্যমে সাংবাদিকতার বিষয়বস্তু যেমন পালটেছে, পালটে গিয়েছে এর ধরনও। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো করোনার টিকা ক্রয়, বিতরণ, চুক্তি ও স্বাস্থ্যসামগ্রীর মান, মূল্য প্রভৃতি বৈচিত্র্যময় বিষয়ে অনুসন্ধান করছে।

কোভিড-১৯ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কিছু রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ভ্যাকসিন সংক্রান্ত চুক্তির গোপনীয়তা অনুসন্ধানী রিপোর্ট করার অন্যতম প্রধান বাধা। তবে কোম্পানিগুলো কী কারণে এ চুক্তিগুলো গোপন রাখছে, এর সুনির্দিষ্ট কোনো যৌক্তিক কারণ ব্যাখ্যা করছে না। তবে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, এ ধরনের গোপনীয়তার কারণে দুর্নীতির পথ প্রসারিত হচ্ছে। ২৮ জানুয়ারি নিউইয়র্ক টাইমস এক প্রতিবেদনে করোনার টিকার চুক্তিগুলোয় যে বিষয়গুলো গোপন করা হচ্ছে তা তুলে ধরে। রিপোর্টে দেখানো হয়, বিভিন্ন দেশের সরকারগুলোর চুক্তির ভিন্নতার কারণে দেশভেদে একই কোম্পানির ভ্যাকসিনের দামেও পার্থক্য হয়। যেখানে ইউরোপীয় কমিশন অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা প্রতিটি ২.১৯ ডলারে ক্রয় করে, সেখানে দক্ষিণ আফ্রিকাকে এ টিকা প্রায় দ্বিগুণ দামে ৫.২৫ ডলারে কিনতে হয়। কিন্তু চুক্তির গোপনীয়তার কারণে সরকারগুলো এ ক্রয়মূল্য প্রকাশ করতে পারছে না। রিপোর্টটিতে আরও দেখানো হয়, ভ্যাকসিনের স্বত্ব থাকে কোম্পানিগুলোর; কিন্তু এর ঝুঁকি নেয় সরকার।

যদিও কয়েকটি গণমাধ্যমে দেখা গেছে, তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে চুক্তির কিছু তথ্যাবলি উন্মুক্ত করা গেছে। তবে সেক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অনেক তথ্যই গোপন রাখা হয়েছে বা তথ্যগুলো সম্পাদিত আকারে দেওয়া হয়েছে। চুক্তির ডেটাবেজ হাতে পাওয়ার পর দেখা গেছে, সেই ডেটাবেজে অনুসন্ধান করার মতো বিস্তর উপাদান খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোয় চুক্তির শর্ত ধরে ধরে অনুসন্ধানের প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। টিকা সরবরাহের ক্ষেত্রে কীভাবে পক্ষপাত হয়, চুক্তিপত্রে প্রতিটি টিকার দাম কত আর দেশগুলোয় সরবরাহকৃত দামের পার্থক্য, সরবরাহের শর্ত লঙ্ঘন, টিকা সরবরাহের সময়সূচি না মানা, উৎপাদকদের দায়দায়িত্ব ও চুক্তি পরিপালনে ব্যর্থ হওয়া প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রিপোর্ট হতে দেখা গেছে।

করোনার স্বাস্থ্যসামগ্রীসহ সরকারি কেনাকাটায় নানা দুর্নীতি নিয়ে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বড়ো প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। ২০২০ সালের ২ এপ্রিল ইতালির 'ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং প্রজেক্ট ইতালি'র একটি প্রতিবেদনে দেখানো হয়, ইতালিতে সার্জিক্যাল মাস্ক, গ্লাভস প্রভৃতি সুরক্ষাসামগ্রী কেনার জন্য চুক্তি করা হয়েছে এমন দুই ইতালিয়ান ব্যবসায়ীর সঙ্গে, যারা প্রতারণার দায়ে অভিযুক্ত। রাশিয়ায় ইমপোর্ট্যান্ট স্টোরিজ মিডিয়ার একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টের ইন্ট্রোটি ছিল এমন–করোনা মহামারির সময় ভেন্টিলেটর হলো বিশ্বের সবচেয়ে মূল্যবান স্বাস্থ্যসামগ্রী। যার মূল্য অর্থ নয়, মানুষের জীবনের মূল্যের সঙ্গে জড়িত। এমন হৃদয়স্পর্শী তথ্য দিয়ে শুরু হওয়া রিপোর্টটিতে দেখানো হয়, রাশিয়ার হাসপাতালগুলো এই গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীটি ক্রয়ের চুক্তি করেছে অপরিচিত কিছু কোম্পানির সঙ্গে এবং কোম্পানিটির নেতৃত্বে থাকা ব্যক্তিরাও সন্দেহজনক। ওয়াশিংটন পোস্টের একটি রিপোর্টে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র এন ৯৫ মাস্কের জন্য ৫৫ মিলিয়ন ডলারের একটি চুক্তি করেছে এমন একটি কোম্পানির সঙ্গে, যাদের এমন চিকিৎসা উপকরণ উৎপাদন বা ক্রয়-বিক্রয়ের কোনো রেকর্ড নেই। গণমাধ্যমগুলোর সংবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, করোনার টিকা নিয়ে সারা বিশ্বেই বিশাল অঙ্কের বাণিজ্য শুরু হয়েছে। এত টাকা কোথায় যাচ্ছে, কে এর আর্থিক সুফল পাচ্ছে, কে অধিক সুবিধা নিচ্ছে, কে বঞ্চিত হচ্ছে–এসব নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির নতুন ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়েছে।

'ওপেন কন্ট্রাক্টিং পার্টনারশিপ'-এর সহযোগিতা নিয়ে সরকারি চুক্তি ও কেনাকাটা নিয়ে কাজ করার মৌলিক পরামর্শগুলো সংকলন করেছে জিআইজিএন রিসোর্স সেন্টার। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো এসব নির্দেশনা অনুসরণ করে দীর্ঘ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করছে। পরামর্শে বলা হয়েছে, কোভিড-১৯ সংক্রান্ত অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করার জন্য সরকারি ক্রয় কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা নিতে হবে। পরিকল্পনা, টেন্ডারিং ও বাস্তবায়নের ধাপগুলোয় নজর রাখতে হবে। তথ্য পাওয়ার সম্ভাব্য সূত্রগুলো নিয়মিত নজরে রাখতে হবে। এসব সূত্রের মধ্যে থাকতে পারে ক্রয় কমিটির সভার সারাংশ, প্রেস রিলিজ, ই-প্রকিউরমেন্ট পোর্টাল, সংবাদপত্রে দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতি। এ ধরনের তথ্যের জন্য সম্ভাব্য আদর্শ জায়গা হতে পারে বাণিজ্যিক প্রতিযোগীরা। কাজের জন্য আবেদন করে হেরে যাওয়া কোম্পানি হয়তো তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ করতে পারে। এমনকি পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেও অভিযোগ জানাতে পারে। এসব অভিযোগের সত্যাসত্য যাচাই করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা চালিয়ে নেওয়া যায়। এছাড়াও যেসব ঠিকাদারকে কাজ দেওয়া হয়, তাদের নিয়েও অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন করা যায়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটির বিশ্বাসযোগ্যতা আছে কি না, অভিজ্ঞতা আছে কি না–এমন নানা প্রশ্নের উত্তর বের করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা সম্ভব।

করোনা আসার পরপর অনেক সাংবাদিককে রাতারাতি স্বাস্থ্য বিটের রিপোর্টারে রূপান্তর হতে হয়েছে। ফলে অনেকেই এমন সব ডেইলি ইভেন্ট কাভার করছেন, যার মধ্যে হয়তো অনুসন্ধানের নানা উপাদান রয়েছে–রিপোর্টার হয়তো তা বুঝতেও পারছেন না। যেমন: ভ্যাকসিন ট্রায়ালের বিভিন্ন স্টেজ, বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়া ও কার্যকারিতা বা এর প্রভাব সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় অনেক সাংবাদিকই এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারছেন না। তাই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জার্গন ও তাত্ত্বিক জ্ঞান থাকলে অনুসন্ধানী সংবাদের ধারণা পাওয়া সহজতর হয়। এসব সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য গণমাধ্যমগুলো মানসম্মত পিয়ার রিভিউড জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা আর্টিক্যাল অনুসরণ করছে। গত বছর ২১ অক্টোবর 'বিএমজি' নামে মেডিকেলের একটি পিয়ার রিভিউড জার্নালে 'কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন কি জীবন বাঁচাতে পারবে?' শিরোনামে একটি গবেষণা আর্টিক্যাল প্রকাশিত হয়। এ ধরনের আর্টিক্যাল থেকে অনুসন্ধান করার মতো অনেক ধারণা স্পষ্ট হতে পারে। গবেষণা জার্নালগুলোয় কিওয়ার্ড দিয়ে সার্চ করলে এমন অনেক প্রাসঙ্গিক আর্টিক্যাল খুঁজে পাওয়া সম্ভব, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে।

করোনা নিয়ে অনুসন্ধানের জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় টুল হলো ডেটা অ্যানালাইসিস করা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলোর সংবাদ পর্যালোচনা করে এমন কিছু ডেটা রিসোর্স সেন্টারের সন্ধান পাওয়া যায়। কোভ্যাক্স ও বিভিন্ন দেশের সরকারের ক্রয় করা টিকার তথ্য পাওয়ার জন্য সবচেয়ে ভালো উন্মুক্ত জায়গা কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন মার্কেট ড্যাশবোর্ড। এটি তৈরি করেছে ইউনিসেফ। এখানে সাধারণত কী পরিমাণ টিকা কেনা হয়েছে, সেই তথ্য পাওয়া যায়। অন্যদিকে, কোভ্যাক্স কী পরিমাণ অর্থ পেয়েছে এবং বিতরণ করেছে, এর হিসাব রাখছে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের কোভিড-১৯ হেলথ ফাইন্ডিং ট্র্যাকার। কোভিড-১৯ সংক্রান্ত বিভিন্ন চুক্তি এক জায়গায় করেছে ব্লুমবার্গের কোভিড-১৯ ডিলস ট্র্যাকার। নাইজেরিয়ায় কোভিড-১৯ মোকাবিলার জন্য জমা হওয়া অর্থ সাহায্যের ডেটাবেজ তৈরি করেছে ফলো দ্য মানি নামে একটি গ্রুপ এবং কীভাবে এই অর্থ খরচ করা হচ্ছে, সেদিকেও নজর রাখছে তারা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ব্যবহৃত টুলগুলোয় এ ধরনের ডেটাবেজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

> বৈশ্বিক মহামারি পৃথিবীর মানুষকে যেমন করেছে গৃহবন্দি, তেমনই অদৃশ্য অবরোধে আটকে দিয়েছে গণমাধ্যমের অবাধ বিচরণ। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের অবাধ বিচরণও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা যেন করোনায় বন্দি না হলে উপলব্ধি করা কঠিন হতো

করোনা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথা সাংবাদিকতার জন্য একটি মডেলকে প্রায় প্রতিষ্ঠিত করে যাচ্ছে। তা হচ্ছে–নেটওয়ার্কভিত্তিক সাংবাদিকতা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট, নেটওয়ার্ক বা গ্রুপভিত্তিক কাজ লক্ষ করা যাচ্ছে। অনেক দেশ ও

সংগঠন আন্তর্জাতিকভাবে যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে এসব সাংবাদিকতা শুরু করেছে। কোভিড সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য ৩৭টি দেশের অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের নিয়ে টিম করেছে অর্গানাইজড ক্রাইম অ্যান্ড করাপশন রিপোর্টিং প্রজেক্ট (ওসিসিআরপি)। একই সঙ্গে কোভিডের আর্থিক ও স্বাস্থ্যগত প্রভাব পর্যবেক্ষণের জন্য আফ্রিকার পাঁচটি দেশের (ঘানা, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, তানজানিয়া ও উগান্ডা) সাংবাদিকদের নিয়ে কাজ শুরু করেছে আফ্রিকান উইমেন জার্নালিজম প্রজেক্ট। প্যারাগুয়েতে রেসপিটরের বাড়তি দাম নিয়ে অনুসন্ধান করেছে লাতিন আমেরিকান অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কেন্দ্র। বিভিন্ন দেশের চুক্তি সংক্রান্ত উন্মুক্ত ডেটা নিয়ে রিপোর্টিং করছে দ্য লাতিন আমেরিকান জার্নালিস্টস নেটওয়ার্ক ফর ট্রান্সপ্যারেন্সি অ্যান্ড করাপশন (পিএএলটিএ)। এমন বিভিন্ন প্রজেক্টের মাধ্যমে যেমন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা হচ্ছে, আবার এসব গ্রুপ বা প্রজেক্ট থেকে সহায়তা নিয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়া তথ্য সংগ্রহ করছে। প্রকৃত অর্থে, করোনা মহামারি এমন একটি অবস্থা তৈরি করেছে, যেখানে প্রত্যেকটি দেশের মিডিয়াকেই অন্য দেশের মিডিয়ার তথ্যের ওপর নজর রাখতে হচ্ছে। ফলে এমন একটি সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নেটওয়ার্কভিত্তিক মডেলের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

বৈশ্বিক মহামারি পৃথিবীর মানুষকে যেমন করেছে গৃহবন্দি, তেমনই অদৃশ্য অবরোধে আটকে দিয়েছে গণমাধ্যমের অবাধ বিচরণ। অবাধ তথ্যপ্রবাহ নিশ্চিতকরণে গণমাধ্যমের অবাধ বিচরণও যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা যেন করোনায় বন্দি না হলে উপলব্ধি করা কঠিন হতো। অনলাইন প্রেস কনফারেন্স বা তথ্যবিবরণী দিয়ে হয়তো সংবাদটা পাঠককে জানানো যাচ্ছে; কিন্তু সংবাদের ভেতরের সংবাদ, অনুসন্ধানী সংবাদ তুলে ধরতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত ফিল্ডওয়ার্ক। করোনা এসে সাংবাদিকতায় ফিল্ডওয়ার্কের সুযোগ কমিয়ে দিয়েছে। ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার অন্যান্য টুলের সাহায্যে অনুসন্ধান করা গেলেও এই টুলটির ঘাটতি মোকাবিলা করা বর্তমানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য অন্যতম বড়ো চ্যালেঞ্জ। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে করোনা মোকাবিলায় একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

তথ্য সহায়তা

1. gijn.org
2. iacrc.org
3. open-contracting.org
4. niemanlab.org

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা ডিসিপ্লিন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

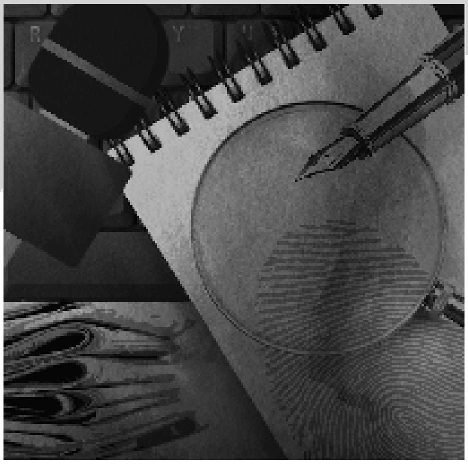

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার কাঠামো

আবুজার

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার পেশাদারি একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে কোনো পেশার উৎকর্ষ ও বিকাশের জন্য পেশাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিষ্ঠা অপরিহার্য, পাশাপাশি গুণগত পেশাদারি নিশ্চিতকল্পে ওই পেশার জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা রাষ্ট্রের দায়িত্বও বটে। বিষয়টি অনেকটা দ্বিমুখী যোগাযোগ প্রবাহের মতো। অর্থাৎ ব্যক্তি যেমন তার পেশার প্রতি নিষ্ঠাবান হবেন, তেমনই রাষ্ট্রও ওই পেশার পেশাদারি রক্ষায় সম্ভব সবকিছু করতে প্রতিশ্রুত থাকবে (রিয়াজ ও চৌধুরী, ১৯৯৫)। বাংলাদেশে সাংবাদিকতা শিক্ষার ৫০ বছর পার হলেও এখন পর্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে সাংবাদিকতা তার কাঙ্ক্ষিত পেশাদারির মাত্রা অর্জন করতে পারেনি। এর পেছনে একদিকে যেমন কাজ করেছে বিভিন্ন সরকারের বিবর্তনমূলক নীতি, তেমনই কাজ করছে মালিক পক্ষের চরম উদাসীনতা (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০১৫)। গুটিকয়েক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান বাদ দিলে সংবাদকর্মীদের বেতন এবং চাকরির নিশ্চয়তা, যেটি যে কোনো পেশার বুনিয়াদি শর্ত নিশ্চিত হয়নি। বেতন ছাড়া কর্ম মফস্‌সল সাংবাদিকতার অন্যতম চরিত্র। ফলে একদিকে অর্থের হাহাকার, অন্যদিকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার দীনতা–সবমিলিয়ে ধুঁকছে প্রান্তিক অঞ্চলের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। তবে কেন্দ্রের বাস্তবতাও যে খুব একটা ভিন্ন, তা জোর দিয়ে বলার উপায় নেই (আলম, ২০১৯)। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য যে ধরনের পরিশ্রম ও পেশাগত নিষ্ঠা বিনিয়োগ করা প্রয়োজন, সেই ধরনের বিনিয়োগে আগ্রহী নন এখনকার অধিকাংশ সংবাদকর্মী। অল্প পরিশ্রমে সেলিব্রেটির তকমার অনুসন্ধানী সংবাদকর্মীরা তাই

অনুকূল পরিবেশ পেলেও সহজাত সীমাবদ্ধতার কারণে রচনা করতে পারছেন না মানসম্মত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন (রিয়াজ, ১৯৯৪)। এছাড়া মামলা-মোকদ্দমার ভয়, প্রেস কাউন্সিলের সীমিত ক্ষমতা, পেশি শক্তির দাপট, প্রশাসনের অসহযোগিতা, সিন্ডিকেট ও ডেস্ক রিপোর্টিংয়ের প্রবণতা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা কোনোক্রমেই সন্তোষজনক নয় (কবীর, ২০২১)। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যথাযথ নিশ্চিত করতে হলে সাংবাদিকতার শিক্ষা, চর্চা ও দর্শনের মধ্যেই আনতে হবে আমূল পরিবর্তন। এজন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সমন্বিত গণমাধ্যম নীতিমালা, যা এ পেশার উৎকর্ষের পাশাপাশি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য এমন এক পরিসর বা পরিবেশ নির্মাণ করবে, যেখানে প্রকৃত অর্থেই গণমাধ্যম গণমানুষের কথা বলবে এবং সাংবাদিকতাই হবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম হাতিয়ার। বর্তমান এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে, বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কেন প্রয়োজন, একজন প্রতিবেদক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রক্রিয়া কাঠামোর কোন কোন ধাপ বা স্তর ব্যবহার করে প্রতিবেদন তৈরি করতে পারেন।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা

সুশাসনের ঘাটতি, সীমাবদ্ধতা, শুদ্ধাচারের ব্যত্যয় এবং দুর্নীতির তথ্য জনগণের সামনে প্রকাশের মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন মূলত সরকারের অধিকতর কার্যকারিতা, নৈতিক আচরণ ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এছাড়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনসচেতনতা ও সম্পৃক্ততা বাড়াতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা তথা স্বাধীন গণমাধ্যম সবচেয়ে কার্যকর মাধ্যমগুলোর একটি। সুশাসনের ঘাটতি চিহ্নিত করে জনগণের কাছে সে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা উচিত (কবীর, ২০২১)। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিক সুচিন্তিতভাবে জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় জনগণের এজেন্ডায় পরিণত করেন। এতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একদিকে যেমন জনমত তৈরি হয়, অন্যদিকে সুশীলসমাজ ও নীতিনির্ধারকদেরও টনক নড়ে। ফলে গণতন্ত্র ও সুশাসনের ভিত যেমন শক্তিশালী হয়, তেমনই সর্বক্ষেত্রে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার কাজটিও ত্বরান্বিত হয়। আর এতে কিছু বিষয়ের প্রশ্ন সম্মুখীন হয়: এক. গণমাধ্যম জনগণের জানা প্রয়োজন এমন বিষয় অবহিত করে। দুই. প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে জনগণই ঠিক করে কোন বিষয়ে সংস্কারের জন্য তারা সোচ্চার হবেন। তিন. নীতিনির্ধারকরা জনচাপে সাড়া দেন এবং সংস্কার বা পরিবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। চার. গণমাধ্যম নীতিনির্ধারকদের নেওয়া পদক্ষেপের কথা পুনরায় জনগণকে অবহিত করেন (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০১৫; পৃ. ৪৮-৫০)।

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এখনো ক্ষমতাবানদের দুর্নীতি, অনিয়মের ফিরিস্তি দখল করে রাখে সংবাদমাধ্যমের স্থান ও সময়। এমন বাস্তবতায় সুশাসন নিশ্চিত ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ভূমিকা ও প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। ক্ষমতার সঙ্গে ক্ষমতার অপব্যবহারের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যিনি বা যারা ক্ষমতায় থাকেন, তাদের কেউ কেউ ক্ষমতার অপব্যবহার করে, আইন ভঙ্গ করে, অর্থের পাহাড় গড়ে তোলার কর্মে লিপ্ত হন আর এতে শেষবিচারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জনগণ (রিয়াজ ও চৌধুরী, ১৯৯৫)। অনুসন্ধানী সাংবাদিককে সর্বদা এই ক্ষমতাকাঠামো চোখে চোখে রাখার কাজটি করে যেতে হয়। সুতরাং যা কিছু মানুষের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করতে পারে, এর সবটুকু তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এগোতে থাকলে সব ধরনের দুর্নীতি, শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্যমুক্ত একটি বাংলাদেশ নির্মাণ সহজ হবে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (আমিন, ২০০৭; পৃ. ৮৪-৮৬):

ক. অন্তর্গত প্রয়োজনীয়তা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অন্তর্গত প্রয়োজনীয়তা হলো সত্যকে জানা। উপরিতলের প্রতিবেদনে আপাত সত্য প্রকাশ করা হলেও ঘটনার আসল রূপ থাকে দৃষ্টির অগোচরে। আর ওই আপাত সত্যের পূর্ণ অবয়বটি তুলে আনা হয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। এই তাগিদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের প্রয়োজনীয়তা।

খ. সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

তথ্য জানার অধিকার সর্বজনীন মানবাধিকারের অন্যতম ধারা। গণমাধ্যম জনসাধারণকে তথ্য জানানোর জন্য নৈতিকভাবে দায়বদ্ধ। দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচনের জন্য, অপরাধের মূলোৎপাটনের জন্য, অপরাধ, স্বজনপ্রীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য ঘটনার গভীর খুঁড়ে তথ্য বের করা গণমাধ্যমের সামাজিক দায়িত্ব (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার, পৃ. ২৩)।

“ অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অন্তর্গত প্রয়োজনীয়তা হলো সত্যকে জানা। উপরিতলের প্রতিবেদনে আপাত সত্য প্রকাশ করা হলেও ঘটনার আসল রূপ থাকে দৃষ্টির অগোচরে। আর ওই আপাত সত্যের পূর্ণ অবয়বটি তুলে আনা হয় অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ”

১. তথ্য জানার অধিকার নিশ্চিত করা

জনসাধারণ সত্য তথ্য জানতে চায়। কিন্তু সত্য তথ্য যখন সাবলীল নয়, সত্যকে আড়াল করে রাখা হয়, তখনই অনুসন্ধান প্রয়োজন হয়। অনুসন্ধানের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে মানুষের তথ্য জানার অধিকার সুনিশ্চিত করা হয়।

২. সমাজ পর্যবেক্ষণ করা

গণমাধ্যম জনগণের প্রহরী হিসাবে কাজ করে। জনগণের সার্বিক অধিকার ও গণতন্ত্রের ধারা অব্যাহত রাখতে সহায়তা করে। পর্যবেক্ষণ তাই গণমাধ্যমের কাজ। অনুসন্ধান এক্ষেত্রে কার্যকরী হাতিয়ার। প্রশাসনকে সতর্ক করে দেওয়া, কেলেঙ্কারি ফাঁস করে দেওয়া (যেমন, ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি), কোনো বিষয় সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক করার জন্য গণমাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা দরকার (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার, পৃ. ২৩)।

৩. ঘটনার অন্তর্নিহিত তথ্য তুলে ধরা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে একটি ঘটনার পুরো অংশটুকু খুঁটিয়ে দেখা হয়। এ ধরনের প্রতিবেদনে রিপোর্ট করাই কেবল উদ্দেশ্য নয়, এর মাধ্যমে

ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্যকে তুলে ধরার পাশাপাশি প্রতিবেদনে অনুসন্ধানের ফলাফল ব্যাখ্যা করা হয়। আর তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে ভাবাবেগের পরিবর্তে স্থান পায় যুক্তি ও প্রমাণ।

৪. মুখোশ উন্মোচন করা

অন্যায়-অত্যাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, ঘুস–এসব উদ্‌ঘাটন অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের কাজ। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সরকারি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা ধরনের অনিয়ম, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার হয়ে থাকে। অনুসন্ধানমূলক প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হলো, কারা ভালো মানুষ সেজে সমাজের এসব অন্যায়, অসংগতি, অব্যবস্থাপনায় জড়িত, তাদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া।

৫. গণমাধ্যমের ব্যবসায়িক স্বার্থরক্ষা

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও গণমাধ্যমের জন্য অবশ্য দরকারি। কোনো মাধ্যমে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হলে তাদের প্রচার ও প্রকাশ বৃদ্ধি পায় এবং এতে বিজ্ঞাপনের আধিক্য দেখা যায়। আর গণমাধ্যমগুলোর মাঝে অর্থনৈতিক কারণে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। ফলে উপকার হয় সমাজ ও জনগণের। আর জনগণ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সচেষ্ট হয় (অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও মানবাধিকার, পৃ. ২৩)।

আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশে যদিও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা জারি রাখার জন্য নির্বাচনের ব্যবস্থা আছে, যেখানে ভোটাররা পাঁচ বছরের জন্য কোনো একটি দলের কাছে দেশের দায়িত্ব দিয়ে নাগরিক হিসাবে তার নৈতিক দায়িত্বটি পালন করে বটে; কিন্তু যাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হলো সেই সরকার ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করছে কি না, এর তদারকির ব্যবস্থা কিংবা আরও স্পষ্ট করে বললে সরকারকে চোখে চোখে রাখার দায়িত্বটি গণমাধ্যমের ওপরই বর্তায় (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০১৫)। যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারকে জবাবদিহি করে তোলার ক্ষেত্রে বিরোধী দলের ভূমিকাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হওয়ার কথা; কিন্তু বাংলাদেশে নিকট ইতিহাসে বিরোধীদল সে ধরনের প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে–এমন কথা জোর দিয়ে বলার সুযোগ খুব একটা নেই। এ কারণে গণমাধ্যমকে বিরোধী দলের সেই ঘাটতিটুকুও পূরণ করতে হয় (রিয়াজ, ১৯৯৪)। গণমাধ্যম যেহেতু রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ, তাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে গণমাধ্যম তার এই ভূমিকাটি সফলতার সঙ্গে পালন করতে পারে।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রক্রিয়ার কাঠামো

আমাদের চারপাশে গল্পের যেমন শেষ নেই, তেমনই সেই গল্প বলার কৌশলও আছে অনেক। আমরা অনুসন্ধান করে খুঁজে বের করি সমাজের গভীর সমস্যাগুলোকে, পথ দেখাই সমাধানের; বের করে আনি লুকানো সত্য, যা এত দিন ছিল সবার চোখের আড়ালে। আমাদের অনুসন্ধান সমাজের দর্পণ হয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ আর তাদের না-বলা কষ্টকে তুলে আনে গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া ও দরকারি কৌশলগুলো প্রয়োগের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় স্তরগুলো পার করে একজন প্রতিবেদকের পক্ষে লুকিয়ে থাকা তথ্যগুলো বের করে আনা সম্ভব হয়। এখানে আবেগ নয়, বরং সত্য তথ্য যাচাই করে গোপন তথ্য নিয়ে কাজ করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পুরো প্রক্রিয়াকে Paul N. Williams তার 'Investigative Reporting and Editing' বইয়ে নয়টি স্তর বা ধাপের কথা বলেছেন। একজন প্রতিবেদককে এই প্রক্রিয়ার ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়। এ ধাপগুলো তার কাজকে অনেক বেশি সুষ্ঠু ও গতিশীল করে তোলে। আর শেষ পর্যন্ত গল্পটা কেমন, এর ওপরই নির্ভর করে আপনি সেটি কীভাবে বলবেন।

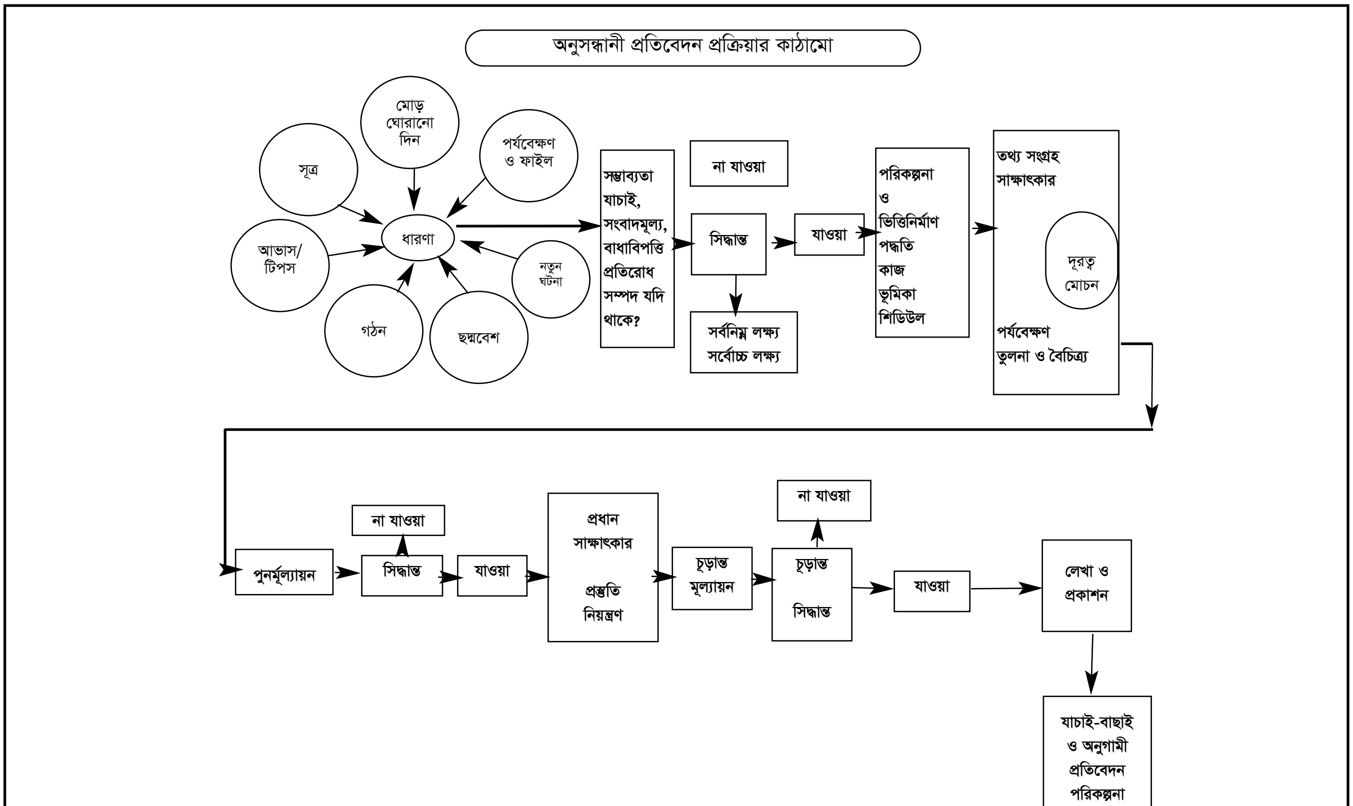

এক. ধারণা
যে কোনো বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করতে গেলে প্রথমে বিষয়টি সম্পর্কে একটি ভালো ধারণা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিষয়টি সম্পর্কে বাইরের সংবাদ উৎস (টিপস্টার, সহকর্মী ও অন্যান্য দৈনিক), অভ্যন্তরীণ উৎসগুলো (অন্য কাজগুলোয় নেতৃত্ব দেন এবং অন্যান্য তদন্ত থেকে সিদ্ধান্ত দেন) এবং তাৎক্ষণিক প্রতিবেদকের তীব্র আগ্রহ বা সংবাদে চেতনা থেকে ধারণা আসতে পারে।

দুই. সম্ভাব্যতা যাচাই
প্রতিবেদক প্রথমে নিচের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পাদকদের সঙ্গে কথা বলে মেমো প্রস্তুত করতে পারেন:
এক. গল্পটি করা কি সম্ভব?
দুই. আমাদের কি প্রয়োজনীয় কর্মী এবং দক্ষ কর্মী আছে?
তিন. আমাদের কি তহবিল এবং অন্যান্য সংস্থান আছে?
চার. আমাদের কি পর্যাপ্ত সময় আছে?
পাঁচ. পুরো গল্পটি পেতে বাধাগুলো কী কী?
ছয়. এটি প্রকাশে বাধাগুলো কী কী?
সাত. গল্পটির চূড়ান্ত তাৎপর্য কী?

তিন: সিদ্ধান্ত
প্রতিবেদক ন্যূনতম এবং সর্বাধিক সংবাদ-গল্পের সম্ভাব্যতা অনুমান করে সম্পাদকের সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেন। সংবাদ করতে যা-ই হোক না কেন এগিয়ে যেতে পারবেন, স্থগিত করবেন বা বাতিল করতে পারেন।

চার. পরিকল্পনা ও ভিত্তি নির্মাণ
এক্ষেত্রে প্রতিবেদক নিযুক্ত করা হয়, ফাইল সেটআপ করা হয়, পদ্ধতিগুলোর আউটলাইন করা এবং সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়। প্রাথমিক প্রচেষ্টা সীমানা এবং তাত্ত্বিকদের জন্য একটি কেন্দ্রীয় ফোকাস গঠন করে একটি দল তৈরি করা হয়।

পাঁচ. গবেষণা
সংবাদকর্মী অনুমিতি পরিকল্পনার মাধ্যমে, ট্র্যাকিং করে (রেকর্ড অনুসন্ধান), সাক্ষাৎকার এবং সংরক্ষণের পুনরাবৃত্তি চক্রগুলোয় নিযুক্ত থেকে প্রোফাইলে বিকাশ ঘটান। আর ফলাফলগুলো সংক্ষিপ্ত করে উপস্থাপন করেন।

ছয়. পুনর্মূল্যায়ন
মূল গবেষণার ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষারত বা তদন্তকে এগিয়ে নেওয়া যেতে পারে এবং পূর্বের স্থগিত, পুনর্নির্দেশিত বা বাতিল–এগুলো করা যেতে পারে।

সাত: প্রধান সাক্ষাৎকার
এখন অবধি প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তদন্তকারীদের তথ্য নিশ্চিতকরণ, অস্বীকার, দ্বন্দ্ব এবং সংবাদ-গল্পের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ তথ্য অনুসন্ধান করে গল্পটির ফোকাস করা যায়।

আট. চূড়ান্ত মূল্যায়ন
প্রতিবেদক এখন গল্পটি চূড়ান্তভাবে তথ্যগুলো মূল্যায়ন করে সংবাদ উপযোগী করে লেখা এবং প্রকাশের জন্য তৈরি করতে পারেন।

নয়. লেখা ও প্রকাশ
প্রতিবেদক একটি কেন্দ্রীয় বিষয় নির্ধারণ করেন এবং চারপাশে একটি শব্দদৈর্ঘ্য গল্প লেখেন। আবার চূড়ান্তভাবে কিছু প্রস্তাব দেন এবং সব প্রমাণ ভালোভাবে পরীক্ষা করেন।

Paul N. Williams-এর মতে, সচেতন বা অসচেতনভাবে, আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক যেভাবেই হোক না কেন, একজন অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে তার অনুসন্ধান প্রক্রিয়ায় উপরের প্রত্যেকটি স্তর অনুসরণ করতে হয় কিংবা পার করতে হয়। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াটি এতই জটিল যে, অনুসন্ধানে নামলে যে কোনো সময় সিদ্ধান্তের গতিপথ পরিবর্তন হতে পারে। সেজন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদককে প্রায়ই তার সিদ্ধান্ত মূল্যায়ন করতে হয়। তবে, ১৯৭৮ সালে দেওয়া Paul N. Williams-এর মডেলের কার্যকারিতা থাকলেও বর্তমান সময়ের আলোকে এতে কিছু স্তরের অভাব অনুভূত হয়। যেমন: বর্তমান সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পণ্ডিতরা মনে করেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির জন্য অনুমিতি বা হাইপোথিসিস গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। কিন্তু Paul N. Williams-এর কাঠামোতে এ ধাপটি নেই। পরবর্তী সময়ে আরও অনেক লেখক নানাভাবে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়ার ধাপগুলো তুলে ধরেছেন। সাংবাদিকদের অভিজ্ঞতা ও পণ্ডিতদের দেওয়া মতামতের ভিত্তিতে অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ার নতুন একটি কাঠামো তুলে ধরা হলো (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০১৫; পৃ. ৫৬):

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া

আবার 'দ্য সেভেন বেসিক প্লটস, হোয়াই উই টেল স্টোরি' বইয়ে গল্প বলার কার্যকর কয়েকটি কাঠামো তুলে ধরেন ক্রিস্টোফার বুকার। যদিও বইটি ফিকশন তথা কাল্পনিক গল্প-উপন্যাসের কথা মাথায় রেখে লেখা; কিন্তু লংফর্ম এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাঠামোগুলো ফিরে ফিরে আসে (পল ব্রাডশ, ২০১৯; গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক)।

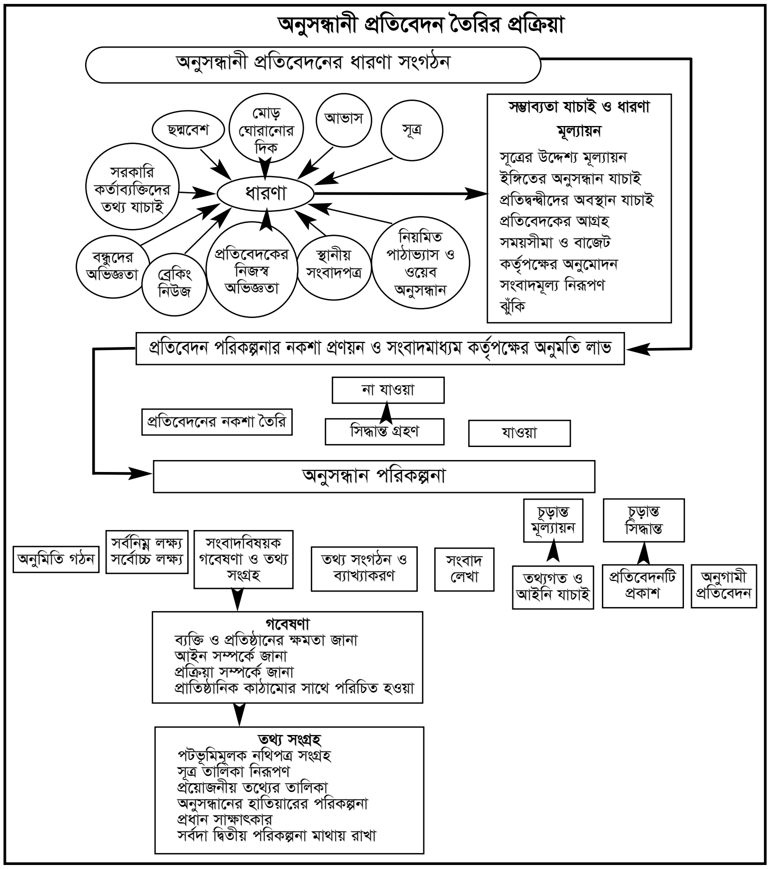

অভিযাত্রা

কোনো কিছু পাওয়ার জন্য ছুটে চলা রিপোর্টারের এমন অভিযাত্রা অনুসন্ধানী গল্প বলার বেশ প্রচলিত একটি ধরন। বিশেষ করে টেলিভিশনে এই পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয়, যেখানে একজন উপস্থাপক নিজেই বের হন সত্যকে জানার আশায়। আর তার সঙ্গে এগিয়ে চলে গল্পের বর্ণনাও। অবশ্য এই অভিযাত্রা যে কেবল উপস্থাপক বা রিপোর্টারের হতে হবে তা নয়। যাত্রাটি হতে পারে একজন সাধারণ মানুষের, যিনি সমাজে পরিবর্তন চান; হতে পারে একজন হুইসেলব্লোয়ার বা প্রতিবাদী যুবকের, যিনি রুখে দিতে চান চারপাশের অনিয়ম; হতে পারে এমন যে কোনো ব্যক্তির, যার চাওয়া সত্য বের করে আনা।

স্টোরিটেলিংয়ের এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এমন পরিস্থিতিতে, যখন আপনি হয়তো সত্যের গভীরে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সত্যটাকে পুরোপুরি তুলে আনতে পারেননি, আবার সত্যের সন্ধানে আপনার যাত্রাটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনেক সময় অনুসন্ধান থেকে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না; কিন্তু অনুসন্ধান করতে গিয়ে এমন কিছু তথ্য বেরিয়ে আসে, এমন কিছু বাধা পার হতে হয়, যা পাঠককে জানানো জরুরি, তখন বিকল্প এই ফরম্যাটের কথা ভাবতে হয়।

দানবের সঙ্গে লড়াই

'দানবের সঙ্গে লড়াই' নামের স্টোরিটেলিং ফরম্যাটটিও 'রহস্যের সন্ধানে' ধাঁচের, তবে এখানে নায়কের বিপরীতে একজন খলনায়ক থাকে। সেই খলনায়ক বা দানব যে একজন ব্যক্তি হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। প্রভাবশালী মানুষ যেমন খলনায়ক হতে পারে, তেমনই হতে পারে পুলিশ বাহিনী বা মানব পাচারকারী গোষ্ঠীর মতো দল বা প্রতিষ্ঠানও। আবার দানব হতে পারে এমন কিছু, যা কোনো ব্যক্তি বা এলাকার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে (একটি দেশ অন্যায্য খনিজসম্পদ আহরণ বা কর ফাঁকির কারণে হুমকির মুখে পড়তে পারে; পরিবেশে পরিবর্তন বা সংঘটিত অপরাধের কারণে হুমকিতে পড়তে পারে একটি শহরও)। কখনো কখনো হুমকিটি হতে পারে গোটা বিশ্বের জন্যও (যেমন, জলবায়ু পরিবর্তন বা পরমাণু অস্ত্র)।

শূন্য থেকে শিখরে

'শূন্য থেকে শিখর'—এই ফরম্যাটের প্লটে প্রধান চরিত্র নিজেই গল্পকে তুলে ধরে। যেমন, কোনো ব্যক্তির ক্ষমতাধর হয়ে ওঠার গল্প বলতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে গল্পের একটি শাখাকে তুলে ধরতে এই ফরম্যাট কাজে আসে। আর সাধারণ রিপোর্টিংয়ের ক্ষেত্রে জীবনালেখ্য বা সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনে এই ফরম্যাট প্রচুর ব্যবহার হয়।

ট্র্যাজেডি

'ট্র্যাজেডি' হলো 'শূন্য থেকে শিখর' ফরম্যাটের একেবারে বিপরীত; কোনো ভুলের কারণে খ্যাতির শীর্ষ থেকে কারও পতনের ঘটনা তুলে ধরতে স্টোরিটেলিংয়ের এই পদ্ধতি কাজে আসে। সাধারণত সেই ভুলটি ধামাচাপা দিতে গিয়ে যেসব ঘটনা ঘটে, সেখান থেকেই গল্প শুরু হয়। 'ঘটনাটি কীভাবে ঘটল'—এই প্রশ্নকে সামনে রেখে যেসব অনুসন্ধানী প্রতিবেদন আবর্তিত হয়, সেখানে এই প্লটের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন: গ্রেনফেল টাওয়ারে অগ্নিকাণ্ড বা ক্যারিলিয়নের পতনের মতো ঘটনায় সাংবাদিকরা অনুসন্ধান করে বের করেন, কোন কোন ভুলের কারণে এমনটি হয়েছে আর এই ধরনের স্টোরিতে আক্ষরিক অর্থেই ট্র্যাজেডি শব্দটি বেশি ব্যবহার হয়।

যাওয়া, ফিরে আসা

'যাওয়া, ফিরে আসা' ধাঁচের স্টোরিতেও একজন চরিত্রের যাত্রা বা ভ্রমণ তুলে ধরা হয়, যেখানে তিনি আবার সেই শুরুতেই ফিরে আসেন। এই ধরনের গল্পকাঠামোতে আগের জায়গায় ফিরে আসার কারণটি খুব শক্তিশালী হতে হয়। এই কাঠামো কাজে আসতে পারে মানব পাচারের ঘটনা অনুসন্ধানে, যেখানে অপরাধীদের মিথ্যা প্রলোভনে কোনো ব্যক্তি বিদেশে পাড়ি জমান; কিন্তু শেষ পর্যন্ত নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে তাকে ফিরে আসতে হয় নিজভূমে।

পুনর্জন্ম

'পুনর্জন্ম' ধাঁচের গল্প কাঠামোয়ও ফিরে আসার বিষয় থাকে, তবে এই ফিরে আসা মৃত্যুর মতো কোনো পরিস্থিতি থেকে। এই কাঠামোয় বলা গল্পের অন্যতম উদাহরণ হলো, স্নো হোয়াইট, যেখানে রাজকুমারী ১০০ বছরের ঘুমের ফাঁদে বন্দি হয়ে পড়েন, যতক্ষণ না একজন রাজকুমার এসে তাকে জাগিয়ে তোলেন। তবে সাংবাদিকদের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উদাহরণ হলো 'আ ক্রিসমাস ক্যারল'—এই গল্পে একজন নীচ ও কপট ব্যবসায়ীর পুনর্জন্ম হয়, একজন উদার-উপকারী মানুষ হিসাবে। কীভাবে এই রূপান্তর হলো, তাকে উপজীব্য করেই গল্পটি গড়ে উঠেছে। এই কাঠামো কোনো ব্যক্তির প্রোফাইল বা সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদনেও কাজে আসে। 'খলনায়ক থেকে নায়ক' ধাঁচের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের ক্ষেত্রেও কাঠামোটি কাজে আসতে পারে। আবার সরাসরি কোনো খবরের উদাহরণ হলো 'দ্য আনক্যাচেবল'-এর কথা। এই স্টোরিতে তুলে ধরা হয়েছে গ্রিসের মোস্ট ওয়ান্টেড অপরাধী কীভাবে গ্রামীণ জনপদের নায়ক হয়ে উঠলেন।

কমেডি

কমেডি প্লট অবশ্য সাংবাদিকতায় খুব একটা দেখা যায় না। এর কারণ সম্ভবত, কমেডি গল্পের বিষয়বস্তু সাধারণত খুব সিরিয়াস হয় না। এ ধরনের প্লটে প্রথমে সবকিছু উলটা পথে চলে, তারপর সেটিকে ঠিক পথে আনা হয়। এখানে কমেডি বলতে সরাসরি হাস্যরসের উপস্থিতিকে বোঝানো হয় না।

গল্পের প্লটকে প্রশ্ন করা

নির্দিষ্ট গল্পকাঠামো ব্যবহারের উদ্দেশ্য হলো আপনার পাওয়া তথ্যগুলোকে সহজে বুঝতে সাহায্য করা; যে গল্পটা বলতে চাচ্ছেন তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলা। কাঠামোর ছাঁচে ঢেলে সত্যকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা এর উদ্দেশ্য নয়। কোনো গল্প 'শূন্য থেকে শিখর' কাঠামোয় বলা মানে এই নয়, আপনি তাকে বিকৃত করছেন। বরং কাঠামো দিয়ে আপনি তাকে আরও সহজবোধ্য করে তুলছেন সম্পাদকের কাছে। কাঠামো দিয়ে আপনি গল্পের ইস্যুগুলোকে আরও নিবিড়ভাবে বুঝতে সাহায্য করছেন।

হতে পারে, 'শূন্য থেকে শীর্ষে ওঠার গল্পে অন্য মারপ্যাঁচ আছে' অথবা 'চরিত্রের অভিযাত্রা যতটা সরল ভেবেছিলেন ততটা নয়'—এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে প্রশ্ন করুন, সাদা চোখে দেখে যা মনে হচ্ছে, তা-ই কি ঠিক। গল্পের প্লটকে প্রশ্ন করার এই পর্যায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ স্বাভাবিকভাবেই বিশৃঙ্খলা থেকেই প্যাটার্নের জন্ম দেয়। আর

সাংবাদিকরা তো সেই প্যাটার্ন তৈরিতে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ। তাদের কাজই হলো ঘটনার পরম্পরাকে একটি সুতোয় বেঁধে এমনভাবে উপস্থাপন করা, যাতে সবাই গল্পটা বুঝতে পারে।

প্রতিবেদনের জন্য গল্পকাঠামো বাছাইয়ের আগে নিজেকে যেসব প্রশ্ন করবেন

এক. গল্পের 'দানব' কি আসলেই দানব, তার এমন পরিণতির কারণ কী?

দুই. চরিত্রের অভিযাত্রা কি সব সময় ভালোতেই শেষ হয়? (উত্তর: না।) এর আর কী কী অভিঘাত থাকতে পারে?

তিন. 'যাওয়া, ফিরে আসার' গল্পে ফিরে আসার কারণ সম্পর্কে সব তথ্য কি আপনার কাছে আছে?

চার. কেউ কি কোনো তথ্য গোপন করছে, যাতে গল্পটিকে 'শূন্য থেকে শিখরে' ওঠার মতো মনে হয়?

পাঁচ. গল্পে কি আসলেই চরিত্রের 'পুনর্জন্ম' হয়েছে?

ছয়. ট্র্যাজেডির গল্পে হেরে যাওয়া মানুষই আসল; কিন্তু আপনি কি জানেন এই ট্র্যাজেডি থেকে কে লাভবান হচ্ছে?

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রতিবেদককে তার পরিমিতি বা প্রশ্নের উত্তরগুলো খোঁজার জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য জোগাড় করতে হয়। এজন্য তাকে খুঁজে বের করতে হয় তথ্যের উৎস। সুনির্দিষ্ট তথ্যের জন্য সুনির্দিষ্ট উৎস থেকে তথ্য বের করে আনতে টুলস বা হাতিয়ার ব্যবহার করতে হয়। আর এক্ষেত্রে একজন প্রতিবেদকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পরিকল্পনা করা। অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য দরকার গভীর পরিকল্পনা। এটি কোনো ঘটনানির্ভর নয়, বরং একটি প্রক্রিয়ানির্ভর সাংবাদিকতা। এ ধরনের সাংবাদিকতায় একজন প্রতিবেদককে অনেক ধাপ বা স্তর পার করতে হয়। রাতারাতি কোনো অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রতিবেদককে উপরের ধাপ বা স্তরগুলো অনুসরণ করতে হয় ভালো একটি প্রতিবেদন তৈরি করতে। সর্বোপরি, প্রতিবেদন লেখার সময় একটি কাঠামো ব্যবহার করার সবচেয়ে বড়ো সুবিধা হলো, এটি গল্পের অসম্পূর্ণতাকে দূর করে।

তথ্যসূত্র

১. আলী রিয়াজ ও জাফরিন জেবিন চৌধুরী (১৯৯৫), 'দৈনিক সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন' বিসিডিজেসি।
২. আলী রিয়াজ (১৯৯৪), 'অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যান্ডবুক' বিসিডিজেসি।
৩. শামীম আল আমিন (২০০৭), 'গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা' কথাপ্রকাশ, ঢাকা।
৪. রোবায়েত ফেরদৌস ও অন্যান্য (২০১৫), 'দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা'
৫. পল ব্রাডশ (২০১৯) গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক, ইনস্টিটিউট ফর ননপ্রোফিট নিউজ, ইউএসএ।
৬. শেখ মনজুর-ই-আলম (২০১৯), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ: প্রেক্ষিত গণমাধ্যম জবরদখল, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।
৭. সৈয়দ বোরহান কবীর (২০২১), সাংবাদিকতা চ্যালেঞ্জ বনের বাঘ না কি মনের? বাংলাদেশ প্রতিদিন।
৮. Hugo de Burgh (2008), Investigative Journalism: Context and Practice, Routledge.
৮. Pual N. Williams (1978), 'Investigative Reporting and Editing' PRENTICE-HALL,INC, Englewood Cliffs, New Jersey.
১০. Christopher Booker (2004), 'The Seven Basic Plots, why we tell storis' The Tower Building, London.

লেখক: প্রভাষক, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা অধ্যয়ন বিভাগ, নর্থ বেঙ্গল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী

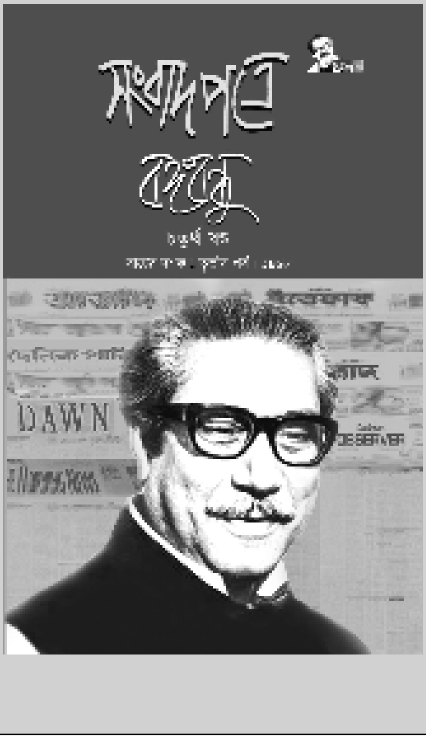

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

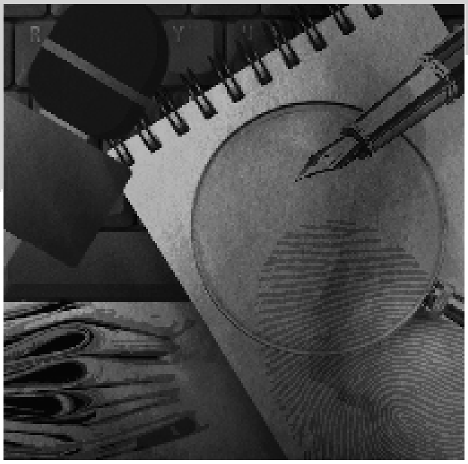

বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা সমস্যা ও সম্ভাবনা

মো. মামুন আ. কাইউম

উন্নয়নশীল এবং আয়তনে তুলনামূলক ছোটো দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ও সুশাসনের ঘাটতির বিষয়গুলো গণমাধ্যমের কল্যাণে অনেকটাই দৃশ্যমান। রাষ্ট্রের সব ক্ষেত্রে প্রভাবশালীদের ভুলভ্রান্তি তুলে এনে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গণমাধ্যম ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রতিদিনের 'টাচ অ্যান্ড গো' প্রতিবেদনের বাইরে একটু বিস্তারিত, গবেষণাধর্মী, নতুন ও জনস্বার্থসংশ্লিষ্ট ইস্যুকে জাতির সামনে প্রথমবার উপস্থাপনই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কাজ। বাংলাদেশের যাত্রা থেকে অনেক সাংবাদিকই এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন। আবার কিছু কিছু প্রতিবন্ধকতার কারণে অনেক সময় গণমাধ্যমকর্মীদের পক্ষে প্রকাশ বা এসব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভবও হয় না। অথচ সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্যতম পূর্বশর্ত হলো তথ্যের অবাধ প্রবাহ। তথ্যের প্রবাহ স্বচ্ছ না হলে দুর্নীতি বেড়ে যায়, ক্ষমতার অপপ্রয়োগ ঘটে এবং জনগণের কাছে সরকারের জবাবদিহিতা থাকে না। 'রাষ্ট্রের প্রকৃত মালিক জনগণ'–এই বিশ্বাসে ঘাটতি দেখা দেয় (ফেরদৌস ও অন্যান্য, ২০১৫)। আবার শক্তিশালী বিরোধী দলের ভূমিকার অভাবও গণমাধ্যমকে পূরণ করতে হয়। ফলে দর্শক-শ্রোতার এক ধরনের আকাশচুম্বী চাহিদা থাকে। যেটি মাঝেমধ্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মাধ্যমে পূরণ সম্ভবও হয়েছে।

দেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা

উপমহাদেশের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, ১৯৫৪ সালে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নতুন মাত্রা যুক্ত করেন সাংবাদিক অমিতাভ চৌধুরী। তিনি 'শ্রী নিরপেক্ষ' ছদ্মনামে

যুগান্তর পত্রিকায় সমাজের দুর্নীতি, অনাচার, সরকারি খাতের অপচয়, সাধারণ মানুষের হয়রানিসহ জনগণের অত্যাচারের কাহিনি তুলে আনতেন। তার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল কাস্টমস অফিসের দুর্নীতির চিত্র তুলে আনা এবং সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কাস্টমস আইনে পরিবর্তন সাধনে ভূমিকা রাখা। হত্যাকাণ্ডের শিকার এক কাস্টমস কর্মকর্তার স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে তিনি এ কাজে হাত দেন বলে তথ্য পাওয়া যায়। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৫৫ সালে তিনি ম্যাগসেসে পুরস্কার পান। পঞ্চাশের দশকে এ অঞ্চলের কয়েকজন প্রথিতযশা সাংবাদিক পাকিস্তানের লাহোরে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাবিষয়ক একটি সেমিনারে অংশগ্রহণ শেষে ফিরে এসে হাতে-কলমে কাজ শুরু করেন। ১৯৬০-৬২ সালে সাংবাদিক সলি-মুল্লাহর যৌনকর্মীদের বাস্তবজীবন নিয়ে মানবিক আবেদনমূলক সিরিজ 'নিষিদ্ধ পল্লীর কাহিনী', শহীদুল হকের পুস্তক প্রকাশনায় দুর্নীতি ও কমিশন বাণিজ্য নিয়ে 'কমিশনের কমিশন', এনায়েতউল্লাহ খানের 'Mr. Observer goes to Report Railway', 'Mr. Observer goes to see the condition of people in the pool' ইত্যাদি প্রকাশ তখনকার সময়ে পাঠকের মনোযোগ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল (খান ও রাজী, ১৯৯৬)। মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিক আবেদ খানের অনুসন্ধানী সিরিজ প্রতিবেদন 'ওপেন সিক্রেট' ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

বর্তমানে দেশে প্রকাশিত দৈনিক পত্রিকাগুলোর অনুসন্ধানে দেখা যায়, বহুল প্রচারিতের মধ্যে প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, কালের কণ্ঠ, সমকাল, দৈনিক ইত্তেফাক, বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় মাঝেমধ্যে কিছু আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ হয়েছে। প্রথম আলোয় শরীফুজ্জামান পিন্টুর শিক্ষাবিষয়ক, রোজিনা ইসলামের দুর্নীতিবিষয়ক, শিশির মোড়লের স্বাস্থ্য খাতে দুর্নীতি নিয়ে করা সংবাদ অনেক সময়ই আলোচনায় এসেছে। দৈনিক ইত্তেফাকের আবুল খায়েরের 'আমরা কী খাচ্ছি!', দ্য ডেইলি স্টারে জুলফিকার আলি মাণিকের সাম্প্রদায়িকতা ও জঙ্গিবাদ নিয়ে প্রতিবেদন 'Where Lies Reign Supreme', কালের কণ্ঠের তৌফিক মারুফের 'ওষুধও নিরাপদ নয়!', শীর্ষক প্রতিবেদনগুলোও ব্যাপক আলোড়ন তুলেছিল। কালের কণ্ঠে প্রকাশিত ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরে অধিকারের নিহত তালিকার মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছে–এমন সংবাদও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বের হয়ে এসেছিল।

টেলিভিশনেও জায়গা নিয়েছে

শুধু প্রিন্ট মিডিয়া নয়, ক্রমবর্ধমান ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ব্যবহার লক্ষ করা যাচ্ছে। এ ধরনের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নব্বইয়ের দশকে শুরু হলেও সাম্প্রতিক সময়ে ২৪ ঘণ্টার সংবাদ চ্যানেলগুলোও এ পথে দ্রুত এগোচ্ছে। এর পেছনে দর্শক-শ্রোতার চাহিদাও আছে, সেটি সহজভাবেই বোঝা যায়। নব্বইয়ের দশকে বিটিভিতে সৈয়দ বোরহান কবীরের উপস্থাপনায় প্রচার হতো 'পরিপ্রেক্ষিত' নামের সংবাদভিত্তিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান। এরপর দৈনিক ইত্তেফাকের আবেদ খানই একুশে টেলিভিশনে 'ঘটনার আড়ালে' নামে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের অনুষ্ঠান শুরু করেন। জেলহত্যার অনেক অজানা ইতিহাস জেলের মধ্যে প্রবেশ করে বের করে সেসময় সামনে আনেন আবেদ খান (ডয়েচে ভেলে, ২০১৮)। বিশেষ করে ম্যাগাজিনের আদলে ইনডিপেনডেন্ট টিভির তালাশ, যমুনা টিভির থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি, একুশে টিভির একুশের চোখ, এনটিভির ক্রাইম ওয়াচ, সময় টিভির অপরাধসূত্র প্রভৃতিতে অনুসন্ধানী বিভিন্ন আয়োজন দেখা যায়। মাছরাঙা টিভিতে সাংবাদিক বদরুদ্দোজা বাবুর স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাত নিয়ে কিছু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন দৃষ্টি এড়ায়নি। বিশেষ করে 'বিক্রি হচ্ছে জিপিএ ফাইভ', 'নর্থসাউথে নয়ছয়', কৃষি অফিসের সরকারি বরাদ্দের দুর্নীতি নিয়ে 'গৌরীসেন' পর্বগুলো ব্যাপক দর্শকপ্রিয়তা পায়।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নীতিনির্ধারণ!

ব্যাংক কেলেঙ্কারি, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নফাঁস, জাতীয় বাজেটের অপচয়, সরকারি-বেসরকারি খাতের দুর্নীতি, অন্যান্য দাপ্তরিক কেলেঙ্কারি, প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতা প্রভৃতির উন্মোচন সুশাসনের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম, প্রতিরক্ষা ব্যয়, সংস্কার কর্মসূচির যৌক্তিকতা, ব্যয়ের ধরন–এসব নিয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদনসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সঠিক পথে চলতে সামাজিক চাপ তৈরি করেছে। পাশাপাশি বিদ্যমান অবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কারসাধনে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজও করেছে। উদাহরণ হিসাবে সাংবাদিক আবেদ খানের ডয়েচে ভেলেকে দেওয়া সাক্ষাৎকারের কথা বলা যেতে পারে: 'আমার প্রতিবেদন বঙ্গবন্ধু নিয়মিত পড়তেন, ব্যবস্থাও নিতেন। আমার প্রতিবেদনের কারণে বিডিআর থেকে সিআর দত্তকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ডেপুটি

“ 'আমার প্রতিবেদন বঙ্গবন্ধু নিয়মিত পড়তেন, ব্যবস্থাও নিতেন। আমার প্রতিবেদনের কারণে বিডিআর থেকে সিআর দত্তকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, বাংলাদেশ ব্যাংকের এক ডেপুটি গভর্নরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল ”

গভর্নরকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল। আরও অনেক কাজ হয়েছিল' (ডয়েচে ভেলে, ২০১৮)। বাংলাদেশ নামক দেশটির যাত্রা শুরুর পরপরই এমন ঘটনা যে কোনো সাংবাদিকের অনুসন্ধানী কাজের প্রতি আস্থা এবং রাষ্ট্রপ্রধানের দূরদর্শিতারই ফল।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পর বের হয়ে আসা দুর্নীতির প্রতিকার হিসাবে আইনি প্রক্রিয়া শুরু, সরকারি কর্মকর্তাদের চাকরিচ্যুতি, অপসারণ প্রভৃতির উদাহরণ রয়েছে। ২০০৭ সালে প্রথম আলোর শরিফুজ্জামান পিন্টুর প্রতিবেদনে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির চিত্র ফুটে উঠলে পরপর কয়েকজনের অপসারণ করা হয়েছিল। এছাড়া অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৪ সালে পাঁচজন সচিবের মুক্তিযোদ্ধা সনদ বাতিলের বিষয়টিও বাংলাদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ফলাফলের অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণগুলো প্রমাণ করে, অপরাধ বা দুর্নীতিবাজরা যতই প্রভাবশালী হোক, লোকচক্ষুর অন্তরালের ঘটনা সামনে এনে এজেন্ডা নির্ধারণের পাশাপাশি ইতিবাচক পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

অনুসন্ধানের চেয়ে সরকারি সংস্থার বরাতে আস্থা বেশি!

সাংবাদিকতায় সাম্প্রতিক প্রবণতা হিসাবে খেয়াল করলে দেখা যায়, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা অন্য যে কোনো প্রভাবশালী দপ্তর বা ব্যক্তির বরাতকে চ্যালেঞ্জ না করে বিনা বাক্যে মেনে নেওয়া হচ্ছে। একটু অনুসন্ধানের মাধ্যমে ঘটনাটি আসলেই যেভাবে ঘটেছে তা ফুটে উঠছে কি না, তার অনুসন্ধান দেখা যাচ্ছে না। অথচ মেক্সিকোয় হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যাবিষয়ক সরকারি তথ্যকে চ্যালেঞ্জ করে তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে আলোড়ন সৃষ্টিকারী অনুসন্ধানী সংবাদ উপস্থাপিত হয়েছিল (আকন, ২০১৭)।

ভাইরাল প্রবণতা আগেও ছিল, এখনো আছে

বাংলাদেশে মাঝেমধ্যে কিছু সংবাদ আলোড়ন তুলে থাকে, পরে আবার তা ভুলও প্রমাণিত হয়েছে। অনুসন্ধানী দাবি করলেও অনেক সময় বস্তুনিষ্ঠতা বজায় থাকে না। ১৯৭৪ সালে চিলমারীর বাসন্তীর জালসহ ছবি প্রকাশের কথা উদাহরণ হিসাবে বলা যায়। হলুদ সাংবাদিকতার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটও সেসময় নির্মিত হয়। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় আলোকচিত্রী আফতাব আহমদের তোলা জাল পরা ছবি তখন স্বাধীন বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইস্যুতে পরিণত হয়। পরে অবশ্য বাসন্তীর ওই জাল পরা ছবি প্রসঙ্গে (মোনাজাতউদ্দিন রচনা সমগ্র-১, পথ থেকে পথে, পৃ. ১৮) চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে বের করে এনেছেন যে, ছবিটি তোলার সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বাসন্তীর শাড়ির উপর মাছ ধরা জাল দেওয়া হয়েছিল। সেই জেলেপল্লিতে ফটোসাংবাদিক আফতাব আহমদকে নিয়েছিলেন স্থানীয় চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসনের একজন কর্মকর্তা। ২০২০ সালের জুলাইয়ে করোনায় ঢাকা মেডিকেলে দায়িত্ব পালনকারী ডাক্তার-নার্সদের মাসের খাবার বিল ২০ কোটি টাকা–এমন গুজব প্রথমে ভাইরাল হয়। বিষয়টি নিয়ে সংসদে পর্যন্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সংবাদ সম্মেলনে দেখানো হয়, ডাক্তার, নার্স, নিরাপত্তাকর্মীসহ ৩ হাজার ৭০০ জনের থাকা-খাওয়া, যাতায়াত বাবদ এ টাকা খরচ করা হয়েছে। যে কোনো ব্যাখ্যাতেই হোক না কেন, এ ধরনের ভুল অপ্রত্যাশিত। বর্তমানে হালকা অনুসন্ধানের মাধ্যমে শুধু বাজেট বা ভাউচার বের করে বাজারদরের সঙ্গে তুলনা দেখিয়েও অনেক প্রতিবেদন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হচ্ছে।

গবেষণা কী বলে?

পাণ্ডে ও রহমান (২০১১) এবং ইসলাম ও মারজান (২০১৩) তাদের বিভিন্ন নিবন্ধে দেখিয়েছেন, বাংলাদেশের গণমাধ্যমে প্রত্যাশিত ইন-ডেপথ (অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক) প্রতিবেদনের যথেষ্ট ঘাটতি থাকায় তা পাঠক-দর্শক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। নব্বইয়ের দশকের দৈনিক পত্রিকাগুলোর আধেয় বিশ্লেষণের মাধ্যমে রিয়াজ ও চৌধুরী দুজন গবেষকের গবেষণায় দেখা যায়, এক মাসে ৫৮টি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। যার মধ্যে ৭৮৫ কলাম ইঞ্চি শহরের এবং ৪০৩ কলাম ইঞ্চির গ্রামীণ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছিল। ৪০টি শহরে ইস্যুর ওপর অনুসন্ধানী প্রতিবেদন হলেও গ্রামীণ ইস্যুর সংখ্যা ছিল মাত্র ১৮টি। ইংরেজি দৈনিকে কোনো গ্রামীণ ইস্যুর জন্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদন স্থান পায়নি। গবেষণায় আরও দেখা যায়, প্রাপ্ত ৭৭ শতাংশ অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ব্যাবসা, অর্থনীতি, পুলিশ, অপরাধ, বিভিন্ন সেবা খাত ও স্বাস্থ্য ইস্যু সংশ্লিষ্ট (উদ্ধৃত খান ও রাজী, ১৯৯৬)। প্রাপ্ত সংবাদগুলোয় তথ্য অকাট্য উপাত্তের ঘাটতি ছিল। কিছু কিছু প্রতিবেদন সরকারি কর্মকর্তাদের মন্তব্য ও প্রদত্ত তথ্যভিত্তিক ছিল। রিয়াজ ও চৌধুরী (১৯৯৫) আরেক গবেষণায়ও অনেক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে নির্দিষ্ট সূত্রের ঘাটতি পান।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় পুরস্কার, প্রতিযোগিতা ও প্রশিক্ষণ

গত তিন দশকে সংবাদপত্রে ঢাকার তো বটেই, ঢাকার বাইরেরও অনেক প্রতিনিধি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা করে আসছেন। তরুণ সাংবাদিকরা অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করে সম্মান ও পুরস্কারও জিতেছেন। ১৯৮৫ সালে দেশে প্রথমবার ফিলিপস বাংলাদেশ এমন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। বিজয়ীদের সার্টিফিকেট ও ৫০ হাজার টাকার সম্মাননা দেওয়া হতো। ১৯৮৫ সালে দৈনিক বাংলার মোজাম্মেল হক 'ভুলে ভরা বোর্ড বই' শীর্ষক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য এ পুরস্কার পান। পরে চারণ সাংবাদিক মোনাজাতউদ্দিন দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত ১৯ পর্বের 'কানসোনার মুখ' অনুসন্ধানী ও ফলোআপ প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার পান। সেই সময় দৈনিক জনকণ্ঠের নূর মোহাম্মদ, বাংলাদেশ টাইমসের এমআর রুশো, দৈনিক ইত্তেফাকের নাজিমুদ্দিন মস্তান ও আমীর খসরু, সাপ্তাহিক বিচিত্রার মিজানুর রহমান খান, দৈনিক সংবাদের শিশির শীল সে সময়কার আলোচিত অনুসন্ধানী সাংবাদিক ছিলেন। যদিও দৈনিক বাংলা ও সাপ্তাহিক বিচিত্রা সরকারের তহবিল থেকে ছাপানোর পরও একঝাঁক সাংবাদিক বছরের পর বছর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করেছিলেন। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় সপ্তাহে অন্তত একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হতো। বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধ, যুদ্ধাপরাধ, আদালতের বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে বিচিত্রার অনুসন্ধানী আয়োজন সেসময়ের পাঠকের মনের খোরাক জোগাত (রহমান, ২০১৪)।

বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) ১৯৯৭ সাল থেকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মানোন্নয়ন ও সাংবাদিকদের উৎসাহিত করতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা পুরস্কার, প্রশিক্ষণ এবং সাম্প্রতিক সময়ে চালু করা ফেলোশিপ চালু রেখেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সংস্থাটি বিষয়ভিত্তিক (জলবায়ু অর্থায়ন এবং কোভিড সংক্রান্ত) অনুসন্ধানী প্রতিবেদনেও পুরস্কার চালু করেছে। আরেক বেসরকারি সংস্থা বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) ১৯৯৪ সাল থেকে বেশ কয়েক বছর অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মানোন্নয়নে পত্রিকাগুলোকে আর্থিক ও সম্পাদকীয় সহায়তা দিয়েছে। এছাড়া ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি, ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন, ফিন্যান্সিয়াল অ্যান্ড বিজনেস জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন পৃথকভাবে ইস্যুভিত্তিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

বিভিন্ন ব্যবসায়ী ও করপোরেট প্রতিষ্ঠান এগুলোয় পৃষ্ঠপোষকতা দেয়। ২০১১ সালে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (যাত্রী) টেলিভিশন সাংবাদিকদের অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর প্রশিক্ষণ দেয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সংবাদকর্মীদের উদ্বুদ্ধ করতে যৌথভাবে নানা প্রশিক্ষণ ও প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। বর্তমানে দেশে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই) সাংবাদিকদের জন্য অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ, প্রকাশনা ও মেন্টরশিপ অব্যাহত রেখেছে। অন্যদিকে গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম নেটওয়ার্ক (জিআইজিএন) বাংলাও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিভিন্ন ম্যানুয়াল সহজলভ্য করে সাংবাদিকদের দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় প্রতিবন্ধকতা ও প্রত্যাশা

যেহেতু অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বেশির ভাগ সময় প্রভাবশালী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে চ্যালেঞ্জ করে, সুতরাং হুমকি-ধমকি, মারধর, নিজের, অফিসের ও সাংবাদিকদের পরিবারের নিরাপত্তার অভাব, আইনি বিভিন্ন ব্যবস্থা বিশেষ করে মানহানি মামলা এগুলো আগেও ছিল মামুলি ব্যাপার, যা অব্যাহত রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রণীত ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের ৩২ নিয়েও অনেক কথা হচ্ছে। আমলাতান্ত্রিক লাল ফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে তথ্য অধিকার আইনের সুফলও অনেক সময় ভোগ করা সম্ভব হচ্ছে না। অথচ ধারণা করা হয়েছিল–সাম্প্রতিক মিডিয়া ব্যুমে বর্তমান সরকারের যে অবদান, তাতে গণমাধ্যম আরও বেশি শক্তিশালী হবে। সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণে কথা উঠলে দেখা যায়, বেশির ভাগ সাংবাদিক তথ্য অধিকার চর্চার মাধ্যমে যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যায়, সে সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। আর জ্ঞাতরাও দাপ্তরিক প্রক্রিয়া মেনে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে চান না। বরং এর মধ্যে তাদের কাছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে পুরোপুরি না জেনেও এক অজানা আতঙ্ক কাজ করছে। এসবের ঊর্ধ্বেও কিছু সাংবাদিক শুধু অপরাধবিষয়ক অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চা করছেন। সাংবাদিকদের মধ্যে ঐক্যের অভাব, করপোরেট মালিকানা, রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতাও অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য অনুকূলে নয়। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী সাংবাদিকদের তুলনামূলক দুর্বল নৈতিক ভিত্তি, পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব, গণমাধ্যমের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও এর জন্য দায়ী। এমনকি সাংবাদিকদের ওপর আগের ঘটে যাওয়া নির্যাতন-নিপীড়ন, বিচারে দীর্ঘসূত্রতাও পুনরাবৃত্তি এড়াতে অনুসন্ধানী ও সাহসী সাংবাদিকতার সংখ্যাকে কমিয়ে দিচ্ছে। প্রভাবশালীদের চাপেও অনেক সময় প্রতিবেদন হত্যা করতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসাবে আবেদ খানের ধারাবাহিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ‘ওপেন সিক্রেট’ বন্ধ নিয়ে ডয়েচে ভেলের কাছে সাক্ষাৎকারের কথা বলা যায়। তিনি বলেন, ‘আমি ১৯৭৫ সালের মার্চ অথবা এপ্রিলে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকে যাই। মেজর ডালিমসহ কিছু বিপথগামী সেনা কর্মকর্তা সেসময় একটি বৈঠক করছিলেন। তাদের সেই বৈঠকে সরকার উৎখাত ও বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। যে কোনো উপায়ে আমি সেই বৈঠক পর্যন্ত পৌঁছে যাই। কিন্তু সেই প্রতিবেদন আমি ছাপতে পারিনি। আমাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। ইত্তেফাকের মধ্যেই ওই সেনা কর্মকর্তাদের পক্ষের প্রভাবশালী লোক ছিল। তারা আমাকে বসিয়ে দেয়। এরপর আমি আর ‘ওপেন সিক্রেট’ প্রতিবেদন করিনি। পরে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে আবারও উদ্যোগ নিই ‘ওপেন সিক্রেট’-এর। কিন্তু সেবার সরকারি আদেশেই তা বন্ধ করা হয়।’ (ডয়েচে ভেলে, ২০১৭)

এতসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও বাংলাদেশে অনুসন্ধানী রিপোর্টের পরিসর ব্যাপক, সম্ভাবনা অসীম। আমাদের সমাজের সর্বস্তরে বিরাজমান অসংগতি ও সংকটই বলে দেয় আমাদের করার কত কাজ বাকি রয়ে গেছে। সাংবাদিক সাগর-রুনির হত্যাকাণ্ড, হলি আর্টিজান জঙ্গি ট্র্যাজেডি, আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ক্রসফায়ার, বহুজাতিক তেল-গ্যাস ও মোবাইল কোম্পানির অনিয়ম-দুর্নীতি ও ভিওআইপি জালিয়াতি, বড়ো বড়ো বিভিন্ন প্রকল্পে বাজেট বাড়ানোয় দুর্নীতির আশ্রয়, কানাডার বেগমপাড়ার বাসিন্দাদের আয়ের উৎস, টাকা পাচার প্রভৃতি নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান খুব কমই চোখে পড়ছে। সাংবাদিকদের অন্যতম দায়িত্ব হলো এসব অসংগতির কারণ অনুসন্ধান করা। এ কাজ করতে গিয়ে তারা বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হবেন–এটাই স্বাভাবিক। এর মধ্য দিয়েও নিজেদের আইনি, শারীরিক ও ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এগিয়ে যেতে হবে। এর মাধ্যমেই গণমাধ্যমের দায়িত্বশীলতা প্রমাণিত হবে এবং রাষ্ট্র হবে আরও স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক।

> “ সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণে কথা উঠলে দেখা যায়, বেশির ভাগ সাংবাদিক তথ্য অধিকার চর্চার মাধ্যমে যে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা যায়, সে সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। আর জ্ঞাতরাও দাপ্তরিক প্রক্রিয়া মেনে দীর্ঘসময় অপেক্ষা করতে চান না ”

তথ্যসূত্র

১. আলী রীয়াজ (১৯৯৪), অনুসন্ধানী ও ব্যাখ্যামূলক রিপোর্টিং হ্যাণ্ডবুক, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যাণ্ড কমিউনিকেশন, ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯৯৪।

২. আলী রীয়াজ ও জাফরিন জেবিন চৌধুরী(১৯৯৫), দৈনিক সংবাদপত্রে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন, বিসিডিজেসি, ঢাকা।

৩. রোবায়েত ফেরদৌস, মোহাম্মদ সাইফুল আলম চৌধুরী ও সাইফুল হক (২০১৫), দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল ২০১৫।

৪. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (২০১৩), অনুসন্ধানী প্রতিবেদন সংকলন (২০০৬-২০১০), ঢাকা।

৫. ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (২০০৫), টিআইবি পুরস্কারপ্রাপ্ত অনুসন্ধানী প্রতিবেদন (১৯৯৭-২০০৪), ঢাকা। ডয়েচেভেলে (২০১৭), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা: বাধা কোথায়? কোথায় গলদ। ডয়েচেভেলে (বাংলা)।

৬. সেলিম আকন (২০১৭), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য অধিকার আইন ও জনপরিসর, নিরীক্ষা, ২১২ তমসংখ্যা, বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

৭. ড. গোলাম রহমান (২০১৪), ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম ইন বাংলাদেশ: স্ট্রেনদেনিং ডেমোক্রাটিক প্রসেস এণ্ড সোশ্যাল রেসপনসেবিলিটি, ডিআইইউ জার্নাল অব হিউম্যানিটিজ এণ্ড সোশ্যাল সায়েন্স, সংখ্যা-২, জুলাই ২০১৪।

৮. ড. গোলাম রহমান (২০০৬), রাইট টু ইনফরমেশন ইন সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ, আন্তর্জাতিক তথ্য জানার অধিকার দিবস উপলক্ষে সাময়িকী, দ্য ডেইলী স্টার, ২৮ সেপ্টেম্বর।

৯. নাঈমুল ইসলাম খান এবং আলী আররাজী (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, বিসিডিজেসি, ঢাকা।

১০. ডয়েচেভেলে (২০১৭), সাংবাদিকতার পরিধি বেড়েছেকিন্তু অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বাড়েনি। ডয়েচেভেলে (বাংলা)।

লেখক: সহকারী অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

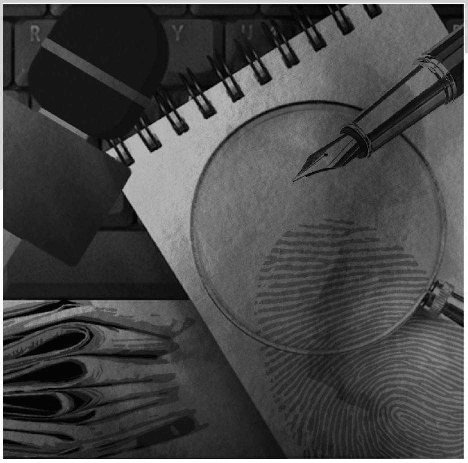

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা

মামুন রশীদ

অসংখ্য পত্রিকা সারা দেশে। এর মাঝে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে নিবন্ধনকৃত দৈনিক পত্রিকার সংখ্যা ১,৩০৯। এগুলোর মধ্যে ঢাকায় নিবন্ধনকৃত দৈনিক ৫৪৩ এবং মফস্‌সলের ৭৬৬টি। এসব দৈনিকের অধিকাংশে দৈনন্দিন খবর ছাড়া অনুসন্ধানী প্রতিবেদন খুঁজে পাওয়া কঠিন। যেন সত্যিই হারিয়ে যেতে বসেছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। বলা হচ্ছে, যেখানে সাংবাদিকতারই সুযোগ নেই, সেখানে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা? সাংবাদিকতার সুযোগ নেই, কারণ আমাদের সংবাদমাধ্যম এখনো শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেনি, নিজের পায়ে দাঁড়ায়নি। সে প্রসঙ্গ প্রাসঙ্গিক হলেও আপাতত সরিয়ে রেখেই কথা বলতে চাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বিষয়ে।

সংবাদপত্র, যা গণমাধ্যম হিসাবে পরিচিত। সত্যিকার অর্থেই একটি সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের রয়েছে শক্তিশালী ভূমিকা। সমাজে এর প্রভাব অসীম। গণমাধ্যমই পারে জনমত তৈরি করতে। জনগণের কাছে তথ্য তুলে ধরতে। গণমাধ্যম যেভাবে জনমত গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করে, তা অন্য কোনো উপায়েই সহজ না। যে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারকেও সংবাদপত্রই পারে জবাবদিহিতার কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে। ফলে ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারের কোনো একটি অংশের দুর্নীতি, অন্যায়, ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমই জনগণের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে। একইভাবে ইতিবাচক সংবাদ, ব্যক্তি বা সরকারের সাফল্যগাথা প্রকাশের মাধ্যমেও গণমাধ্যমই সামাজিক, রাজনৈতিক এবং রাষ্ট্রীয় নানা বিষয়কে জনগণের সামনে নিয়ে আসে; যা মানুষের মনে প্রেরণা দেয়, আশার সঞ্চার করে।

খুব দূরের কথা সরিয়ে রাখলেও এই অতিমারি করোনাকালেও গণমাধ্যম যেভাবে জনগণকে সচেতন করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে, তা প্রশংসনীয়। আবার এই গণমাধ্যমের কল্যাণেই কিন্তু আমরা বালিশকাণ্ডের মতো পুকুরচুরির খবর জানতে পেরেছি। মহামারিকালে যখন, লকডাউনের কবলে সবকিছুই বন্ধ। তখন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট বিলের অসংগতির খবরও চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে গণমাধ্যমেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। যার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের ইন্টারনেট বিলের অসংগতি দূর করতে লাগাম টেনেছে। এসবই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত। গণমাধ্যমের ইতিবাচক সাংবাদিকতারই দৃষ্টান্ত। তারপরও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা আজ বড়ো চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছে।

অন্য নানা কারণের সঙ্গে আমাদের সংবাদপত্রগুলো নব্বইয়ের দশকের শেষে এক লাফে ১২ পাতা থেকে ২০ পাতায় উন্নীত হয়। হঠাৎ করে আটটি পাতা বেড়ে যাওয়ায় একটি বড়ো ধাক্কা আসে সংবাদের গুণগত মান ঠিক রাখার ক্ষেত্রে। প্রাথমিকভাবে বড়ো বাজেটের সংবাদপত্রগুলোর বড়ো লগ্নি থাকলেও তাতে ভাটা পড়তেও সময় লাগেনি। শুরুর বড়ো বাজেট দ্রুতই গুটিয়ে ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণ করতে থাকে অনেক বড়ো কাগজ। এক্ষেত্রে তারা পৃষ্ঠাসংখ্যা কমায়নি। বরং তারা মনোযোগ দেয় লোকবল কমানোর দিকে। তাতে করে সংবাদপত্রে তৈরি হয় নতুন সংকট, যা আমাদের সংবাদের মানকে ঊর্ধ্বমুখী না করে নিম্নমুখী করার পথে উৎসাহ জোগায়।

ব্যক্তিমালিকানাধীন এসব প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনের তুলনায় জনবল কম হওয়ায় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কম বেতনে অদক্ষ সাংবাদিক নিয়োগের প্রবণতা দেখা দেওয়ায় সংবাদের মান কমতে থাকে। শুধু রাজধানীতেই নয়, এ ধারা মফস্সলেও। অন্যান্য অনেক কারণের মতোই এটি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির পথেও একটি বাধা হিসাবে চিহ্নিত। ব্যয় সংকোচন নীতি বাস্তবায়নের ফলে অধিকাংশ সংবাদপত্রে শুধু পৃষ্ঠা ভরানো ছাড়া অন্যদিকে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ করতে থাকে। কারণ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য ধৈর্য ধরে যে অপেক্ষা, তার জন্য আলাদা বাজেট, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকের আর্থিক ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, তার মানসিক সাপোর্টের দিকটি নিশ্চিত করতেও অনেক সংবাদমাধ্যম কর্তৃপক্ষের অনীহাও প্রকট।

এজন্য সংবাদপত্রের সংখ্যার তুলনায়, আমাদের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের সংখ্যা হাতেগোনা। অধিকাংশের নজর দায়সারা দায়িত্ব সম্পাদনের দিকে। এজন্যই আমাদের সংবাদমাধ্যমে একই ধরনের খবরের সংখ্যাধিক্য। নেতিবাচক সংবাদের প্রাধান্য। কারণ অনেক কর্তৃপক্ষই বিশ্বাস করেন, নেতিবাচক সংবাদ 'পাঠক খায়'। সংবাদমাধ্যমের কাজ যেখানে রুচি তৈরি করা করা, সেই দায়িত্বের বাইরে এসে সস্তা বিক্রয় আইটেম বাড়ানোর সংবাদের দিকেই আমাদের নজর। কোনো একটি সংবাদমাধ্যমে যখন একটি নেতিবাচক খবর প্রকাশ পায় এবং কর্তৃপক্ষের ভাষায় খবরটি 'পাঠক খাচ্ছে', তখন অন্য প্রতিনিধিরাও ঠিক সেই ধরনের সংবাদ পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এটি ঘটতে থাকে দিনের পর দিন, যতক্ষণ না নতুন একটি মুখরোচক সংবাদের জন্ম হয়। এতে সংবাদপত্রের মানের যে ঘাটতি, তার যে অধঃপতন, তা ঠেকানোর ইচ্ছা মালিকপক্ষের তো নেই-ই, সংবাদমাধ্যমের কর্তাব্যক্তিদেরও নেই। কারণ সংবাদপত্রের উন্নতির চেয়ে চেয়ারছাড়া হওয়ার শঙ্কাকেই বড়ো করে দেখা হয় অধিকাংশ সময়। এই সময়ের একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এখন বর্ষা মৌসুম। এ মৌসুমে প্রায় প্রতিদিনই বজ্রপাতে সারা দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের মৃত্যুর খবর আসে। রোজ একই শিরোনামের সংবাদ। পালটে যাচ্ছে শুধু এলাকার নাম, আর বজ্রপাতে মৃত ব্যক্তির নাম ও বয়স। কখনো কখনো সারা দেশ থেকে বার্তাকক্ষে আসা এ ধরনের খবরগুলো একত্র করে একটি শিরোনামেও প্রকাশ করেন কর্তৃপক্ষ। উদাহরণের প্রয়োজনেই বজ্রপাতের প্রসঙ্গটি এনেছি। এই একই উদাহরণ তুলে ধরা যাবে নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, শত্রুতামূলকভাবে কারও জমির ফসল নষ্ট করা, পুকুরের মাছ মেরে ফেলার সংবাদের ক্ষেত্রেও। আবার কোথাও এক-দুই পিস ইয়াবাসহ বা এক-দুই পুরিয়া গাঁজাসহ কারও ধরা পড়া এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক তাকে মাদকসম্রাট বা সম্রাজ্ঞী হিসাবে বিশেষায়িত করেও প্রতিবেদন পাঠানোর এই যে ধরন, এর পরিবর্তন নেই। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন নেই। অনেকেই মনে করেন, অনুসন্ধানী প্রতিবেদন বুঝি শুধু রাজধানীতেই হবে। অথচ মফস্সলও যে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার নতুন পথ খুলে দিতে পারে, সেজন্য আমাদের সতর্ক দৃষ্টি নেই।

রোজ রোজ বজ্রপাতে এত মৃত্যু নিয়েও তো হতে পারে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন। একটি এলাকায় এ ধরনের মৃত্যুর দীর্ঘসময়ের রেকর্ড পাওয়া খুব কঠিন না। স্থানীয় থানায় অপমৃত্যুর তথ্য থাকে। খুব বেশিদিনের না হলেও, পাঁচ/দশ বছরের তথ্য ব্যবহার করেও বজ্রপাতে মৃত্যুর কারণ ও প্রতিকার বিষয়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন করা সম্ভব। বজ্রপাতে মৃত্যু প্রতিরোধে একসময় বড়ো ভূমিকা রেখেছে ব্রিটিশ আমলে স্থাপিত ম্যাগনেটিক পিলার। অথচ অপপ্রচার, গুজব, মূল্যবানসামগ্রী হিসাবে অনেক দামে বিক্রি করার মতো সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে এই পিলারগুলোর চুরিকে উৎসাহিত করা হয়েছে। পিতল, তামা, লোহা ও টাইটেনিয়ামসহ ধাতব চুম্বকের সমন্বয়ে তৈরি এই পিলারগুলো ব্রিটিশ আমলে সীমানা পিলার হিসাবে মাটির নিচে পুঁতে রাখা ছিল। এগুলো যেমন ভূমি জরিপে সহায়তা করত, তেমনই নির্দিষ্ট দূরত্বে পরপর পুঁতে রাখায় এগুলো আর্থিংয়ের কাজও করত। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে অনেক দামি আখ্যা দিয়ে পিলারগুলো চুরি হয়ে যাওয়ায় বজ্রপাতের সময়ে আর্থিংয়ের সুবিধা আমরা হারিয়েছি। আবার অন্যদিকে উঁচু গাছ অকাতরে কেটে সাবাড় করারও কুফল আমরা ভোগ করছি। এসব বিষয়ের সমন্বয়ে, সংশ্লিষ্টদের কথাবার্তা যোগ করে, নানা সংস্থায় খোঁজ করে বজ্রপাত প্রতিরোধে কার্যকর পরামর্শ সংবলিত রিপোর্ট তৈরির দিকে না হেঁটে আমরা গৎবাঁধা মৃত্যুর প্রতিবেদন পাঠিয়েই দায়িত্ব শেষ করছি।

অথচ সংবাদপত্রের ভূমিকা তো শিক্ষকের। সংবাদপত্রের ভূমিকা যাত্রাপালার বিবেকের মতো। সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ। এর কাজ শুধু প্রেস রিলিজনির্ভর সংবাদ প্রকাশের মধ্যে না।

এরপরও আশার কথা, এখনো অনুসন্ধানী রিপোর্ট হচ্ছে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কষ্ট ও ঝুঁকি স্বীকার করে নিয়েই অনেক সাংবাদিক এদিকে আগ্রহী হচ্ছেন। এর ফলে আমরা হলমার্ক কেলেঙ্কারি, বেসিক ব্যাংক কেলেঙ্কারি, অনেক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার জাল মুক্তিযোদ্ধা সনদ, মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য বিদেশি বন্ধুদের দেওয়া পদকে জালিয়াতির মতো প্রতিবেদন পেয়েছি। এসব প্রতিবেদন সরকারের জন্যও সহায়ক হিসাবে কাজ করেছে। দেশে-বিদেশে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সুফলের কথা আমাদের অজানা নয়। আমরা ভুলে যাইনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ উইকিলিকস, পানামা পেপারসসহ নানা কেলেঙ্কারি ফাঁসের কথা। বা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, জাপানের প্রধানমন্ত্রী তানাকা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে নিয়ে সংবাদমাধ্যমের অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের কথা, যা শুধু তাদের মসনদই কাঁপিয়ে দেয়নি, নিঃস্বার্থভাবে সমাজকেও পথ দেখিয়েছে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেই সংবাদমাধ্যমকে দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসতে হবে। সমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, মানুষের প্রতি সংবাদমাধ্যমের যে দায়িত্ব ও দায়বোধ, একে স্বীকার করে নিয়েই সংবাদমাধ্যমকে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় উৎসাহিত করতে হবে। সংবাদপত্র এবং সাংবাদিকদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াসের মাধ্যমেই সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণ সম্ভব। এক্ষেত্রে পথ দেখাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। এর মধ্য দিয়ে সুসংহত হবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, নিশ্চিত হবে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। প্রেস রিলিজ সাংবাদিকতার বাইরে এসে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা যত শক্তিশালী হবে, সমাজ ও রাষ্ট্রে তত স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। সংবাদমাধ্যমকে বলা হয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। কারণ গণমাধ্যমই অন্ধকারের দিকে যাওয়া ঠেকাতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে, পথ দেখায় আলোর। ভুল সংশোধন এবং সঠিক পথ দেখানোর জন্যই প্রয়োজন অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। পথনির্দেশনা, পথের দিশা ঠিক রাখার জন্যও খুবই জরুরি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা।

লেখক: সাংবাদিক

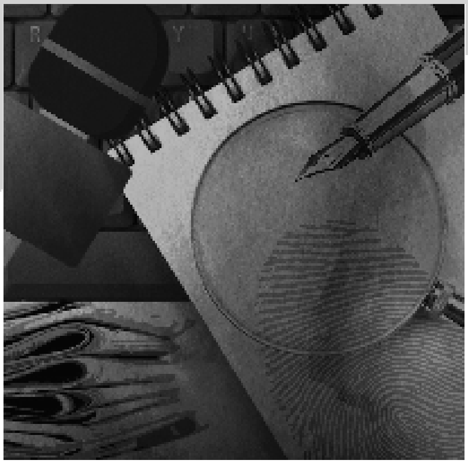

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় 'অনুসন্ধান'

স্মৃতি চক্রবর্তী

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞা-সূত্র নিয়ে রয়েছে নানা মত। অর্থাৎ এর সর্বসম্মত সংজ্ঞা এখনো স্পষ্ট নয়। তবে ইউনেস্কোর প্রকাশনায়, 'স্টোরি বেজড ইনকোয়ারি' নামের হ্যান্ডবুক যা লিখেছে, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞা হিসাবে অনেকে তা-ই উল্লেখ করে থাকেন। ইউনেস্কোর হ্যান্ডবুকে উল্লেখ রয়েছে, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হচ্ছে গোপন বা লুকিয়ে রাখা তথ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা। সাধারণত ক্ষমতাবান কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এসব তথ্য গোপন রাখে। কখনো হয়তো বা বিশৃঙ্খলভাবে তথ্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা চট করে খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে সাধারণত প্রকাশ্যে বা গোপনে নানা উৎস ব্যবহার করতে হয়, ঘাঁটতে হয় নানা নথিপত্র।' অর্থাৎ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় তথ্য হেঁটে আসে না, ঘেঁটেই বের করতে হয়। ডাচ-ফ্লেমিশ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা সংঘ ভিভিওজের অভিমত অনুযায়ী, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কিংবা প্রতিবেদন বলতে সেসব প্রতিবেদনকেই বোঝায়, যেসব প্রতিবেদন, বিশ্লেষণাত্মক ও কোনো একটি বিষয়কে সাংবাদিক তলিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে পেশাদার সাংবাদিকদের যে অভিমত রয়েছে তা হলো, পদ্ধতি বা পরিকল্পনামাফিক গভীর অনুসন্ধান ও মৌলিক গবেষণা, গোপন তথ্য উন্মোচন। আবার অনেকেই মনে করেন, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় কিংবা প্রতিবেদনে ব্যাপকভাবে তথ্য ও নথিপত্র ব্যবহার হয়ে থাকে। এ ধরনের মূল প্রতিবেদনের বিবেচ্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও জবাবদিহিতা।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা অত্যন্ত গভীর ও কঠিন কাজ। অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ব্যাপক গবেষণা ও কঠোর পরিশ্রমের ফসল। অর্থাৎ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও প্রতিবেদন ব্যাপকার্থে একটি রাষ্ট্র কিংবা সমাজের একেবারে গভীর থেকে তুলে আনা অনেক উপাদানের সমন্বয়। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য রয়েছে বহু। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য, অনুসন্ধানের কৌশল নির্বাচন নির্ণয় করা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে, উৎসের ওপর তথ্যের ব্যাপারে নির্ভর করা এবং সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য গভীর থকে গভীরে যাওয়া। নিয়মানুগ অনুসন্ধানমূলক এই কাজের জন্য একজন সাংবাদিককে বরাবরই অনেক ঝুঁকির মধ্যে থাকতে হয় এবং এর দৃষ্টান্ত বিশ্বে অনেক আছে। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। রাষ্ট্র-সমাজ এবং মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সংবাদমাধ্যম অর্থাৎ ব্যাপক অর্থে গণমাধ্যম অনেক বড়ো সহায়ক শক্তি। গণতান্ত্রিক সংজ্ঞা-সূত্র ও বিকশিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় এ কারণেই গণমাধ্যম-সংবাদমাধ্যমে স্বাধীনতা অনেকাংশেই নিশ্চিত এবং এর সুফল ভোগ করে রাষ্ট্র, সমাজ ও নাগরিক। উন্নত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোয় তো বটেই, আমাদের মতো উন্নয়নশীল অনেক দেশেও সংবাদমাধ্যম এখন অনেক বিস্তৃত-সমৃদ্ধ। এর পরিসর বৃদ্ধির ফলে সাংবাদিকদের কাজের পরিধিও বেড়েছে এবং সাংবাদিকতায় যোগ হয়েছে এক ভিন্নমাত্রা, যা অনেক ক্ষেত্রেই চমকপ্রদও বটে।

একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য যেমন যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, তেমনই এর বস্তুনিষ্ঠতার জন্য আরও কিছু অনুষঙ্গও যুক্ত। সন্দেহ নেই, এই ধারার সাংবাদিকতা নতুন নতুন কৌশল ব্যবহারে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকে। এই ধারার সাংবাদিকতা এবং একজন সাংবাদিককে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করতে একটা সূত্র ধরে একাধিক সূত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়। এই কাজটিকে যদি আমরা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার 'অনুসন্ধান' বলি, তাহলে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান এবং ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টার্স অ্যান্ড এডিটরসের সাবেক নির্বাহী প্রধান ব্র্যান্ট হিউস্টন বলেছেন, 'অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কাজ করার নতুন পথ দেখায়। এই কৌশলগুলো ধীরে ধীরে প্রতিদিনকার সাংবাদিকতার সঙ্গে মিশে যায় এবং শেষ পর্যন্ত পেশারই মান বাড়ায়।' জার্মান ফাউন্ডেশন কনরাড অ্যাডেনোয়ার স্টিফটুং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার একটি উল্লেখযোগ্য ম্যানুয়াল। বেশকিছু কেস স্টাডি, অনুশীলনসহ এটি বের করা হয় মূলত আফ্রিকার সাংবাদিকদের জন্য হ্যান্ডবুক হিসাবে। তবে লক্ষণীয় হলো, এই হ্যান্ডবুকটি শেষ পর্যন্ত তাদের জন্য নতুন সংস্করণ করা হয়, যারা কাজ করেন সম্পদের সীমাবদ্ধতা, দমনমূলক সংবাদমাধ্যম আইন এবং স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে এমন পরিবেশে। ইংরেজি ভাষায় রচিত গ্লোবাল ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজম কেসবুক নামে একটি গাইডলাইনমূলক গ্রন্থে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কর্মপন্থা এবং অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির রূপরেখা বর্ণিত হয়েছে। এমন আরও অনেক গ্রন্থ কিংবা তথ্য অনুসন্ধানমূলক সূত্র রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা করা যায় এবং এর মধ্য দিয়ে প্রতিবেদন তৈরির পথ নির্ণীত হয়েছে। আমাদের দেশের বাস্তবতায় রাজনৈতিক বিষয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা কম হলেও অন্যান্য অনেক বিষয়েই তা হচ্ছে কমবেশি।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার কয়েকটি কেস স্টাডি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই সাংবাদিকতার ধারা কতটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। ক. ২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বহুলপ্রচারিত পত্রিকা ওয়াশিংটন পোস্টের সাংবাদিক সুজান স্মিথ, জেমস ভি রিমান্ডিং, আর জেফরি সংস্কারের নামে মার্কিন কংগ্রেসে ওয়াশিংটন লবিস্ট জ্যাক আব্রামোফের দুর্নীতিবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি করে সাড়া ফেলেছিলেন এবং এ নিয়ে তারা ব্যাপকভাবে সম্মানীতও হয়েছিলেন। অর্জন করেছিলেন শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারও। যুক্তরাষ্ট্রের অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ, ড্যালিয়েন এলসবার্গ রাষ্ট্রের প্রতাপশালীদের গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন–সাপের লেজ দিয়ে কান চুলকানো খুবই বিপজ্জনক হলেও এটাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। এলসবার্গের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তি ও তথ্য চুরির অভিযোগ আনা হয়েছিল। ওই ঘটনার জল গড়িয়েছিল অনেক দূর। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ সেই দেশের আদালতে নাকচ হয়ে যায়। এলসবার্গের 'দ্য পেন্টাগন পেপারস' ফাঁস করার চার দশক পর দেখা যায় আরেকটি যুগান্তকারী ঘটনা। আমেরিকার ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সির তরুণ বিশ্লেষক এডওয়ার্ক স্লোডেনের দেওয়া তথ্যের সূত্র ধরে ২০১৩ সালের জুনে অনুসন্ধানী সাংবাদিক গ্লান গ্রিনওয়াল্ড, লরা পোস্টাস, ব্রান্টন জেলমে স্লোডেনের ফাঁস করা তথ্যের সূত্র ধরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে আলোচিত প্রতিবেদনের জন্ম দিয়েছিলেন, আমেরিকার ওয়াশিংটন পোস্ট আর ব্রিটেনের দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় তা বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সত্তর দশকে আমেরিকার ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি নিয়ে কাজ করেছিলেন কার্ল বার্নস্টেইন ও বব উডওয়ার্ড। তাদের ওই অনুসন্ধানী প্রতিবেদন কীভাবে সাড়া ফেলেছিল, তা-ও

> একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য যেমন যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন, তেমনই এর বস্তুনিষ্ঠতার জন্য আরও কিছু অনুষঙ্গও যুক্ত। সন্দেহ নেই, এই ধারার সাংবাদিকতা নতুন নতুন কৌশল ব্যবহারে সবার চেয়ে এগিয়ে থাকে

আমরা অনেকেই জানি। 'পানামা পেপারস' সাম্প্রতিককালে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এমন কোনো তথ্য নেই যা সেখানে উঠে আসেনি। জার্মানির একদল সাংবাদিক অনেকদিন অনুসন্ধান করে সাড়া জাগানো, বিস্ময়কর সব তথ্য তুলে ধরেন।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের মূল লক্ষ্য জনস্বার্থের সংরক্ষণ। আমরা বিশেষ করে মার্কিন সাংবাদিকতার ইতিহাসে সেই দৃষ্টান্ত খুব বেশি দেখি। নথি যত গুরুত্বপূর্ণ কিংবা গোপনীয়ই হোক, জনস্বার্থে তা প্রকাশযোগ্য। সরকার, রাজনীতি, রাষ্ট্র কিংবা ধর্ম–কোনো আবরণেই জনগণকে ধোঁকা দেওয়া যাবে না। ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির ঘটনায় প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন কীভাবে পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তা-ও সচেতন মানুষমাত্রই অজানা নয়। সাংবাদিকতায় উৎসের পরিচয় গোপন রাখা একটা বড়ো নীতি। সারা বিশ্বেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার জন্য সাংবাদিকদের পদে পদে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়। সাংবাদিকতাকে বলা হয় সমাজের প্রহরী। শক্তিশালী সাংবাদিকতা গণতন্ত্র ও রাষ্ট্রকে পাহারা দেয়। এই সাংবাদিকতায় সময় বদলানো ও তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের পদ্ধতি এমনকি জানার কৌশল বদলানোর পরও বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার গ্রহণযোগ্যতা বা বিশ্বাসযোগ্যতার মূল্য অনেক।

লেখক: সাংবাদিক

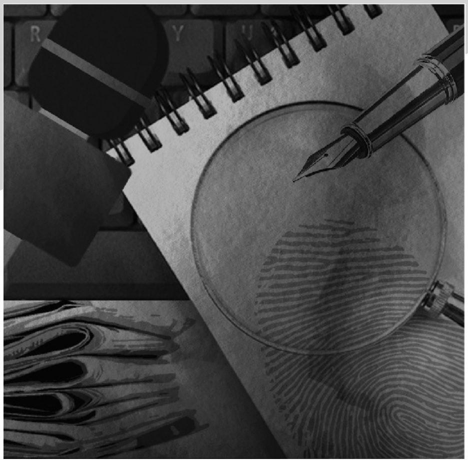

মৃত্যুঞ্জয়ী ম্যারি কলভিন

সারতাজ আলীম

Active warzone বা যুদ্ধের ময়দান সংবাদকর্মীদের জন্য যেন এক ভয়াবহ জায়গা। পরিস্থিতিভেদে দুপক্ষই হয়ে উঠতে পারে সংবাদকর্মীর জন্য শত্রু! যুদ্ধের ময়দানে মুহূর্তেই মারা যায় মানুষ। বলা হয়, যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময় সত্যটাও চাপা পড়ে। কারণ দুপক্ষের চরম সংঘাতের মধ্যে নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণের বেশ অভাবই থাকে বটে! সব মিলিয়ে সংবাদকর্মীদের জন্য যুদ্ধক্ষেত্র অত্যন্ত বাজে স্থান বলেই বিবেচিত হয়। সব মিলে যুদ্ধের ময়দানের সামনে সংবাদকর্মীদের না থাকা যেন এক অঘোষিত নিয়মই ছিল!

তবে কোনো প্রথা বা নিয়মই চিরস্থায়ী নয়। কেউ না কেউ স্রোতের বিপরীতে যান এবং শুরু করেন নতুন যুগের। বলছি ম্যারি কলভিনের কথা! যিনি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে নিয়ে গেলেন একেবারে যুদ্ধের ফ্রন্টলাইনে।

বাংলায় বললে যুদ্ধবিষয়ক সংবাদকর্মী, ইংরেজিতে War correspondent বা war journalist। ইংরেজিতে শব্দগুলো গুগলে সার্চ করলে শুরুতেই ভেসে উঠবে এক নারীর নাম ও ছবি। প্রাচীনকালের জলদস্যুরা যেমন এক চোখ হারানোর পর চোখে তাপ্পি বা কাপড় বেঁধে ঘুরত, ঠিক একইভাবে এই নারীর এক চোখেও পট্টি বাঁধা!

আমেরিকান এই নারী সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেন আশির দশকে। United Press International থেকে শুরু করে The Sunday Times-সহ অনেক জায়গায় কাজ করেন তিনি।

তাঁর চমকের শুরু ১৯৮৬ সাল থেকে। খ্যাপাটে স্বৈরশাসক গাদ্দাফির প্রাসাদে বসে তাকেই জর্জরিত করতে শুরু করেন প্রশ্নবাণে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে রীতিমতো যুদ্ধের মাঠে টেনে নিয়ে যাওয়ার কাহিনি শুরু এখান থেকেই।

পেশাদারির ডাক থেকে একজন মানুষ ঠিক কতটা ঝুঁকি নিতে পারে? ম্যারি কলভিন ঝুঁকি নেওয়া এক ধরনের রুটিনই বানিয়ে ফেলেছিলেন। যুদ্ধ আর সংঘাতের মধ্যে প্রায়ই হারিয়ে যান নিরীহদের আর্তচিৎকার। রাজনীতি আর যুদ্ধ যুদ্ধ খেলায় চাপা পরে নিরীহ জনতার রাসায়নিক বোমাতে পুড়ে মরার ঘটনা। চেচেনিয়া, কসোভো, পূর্ব তিমুর, শ্রীলঙ্কা–যুদ্ধের গন্ধ যেখানেই পেয়েছেন, সেখানেই ছুটে গেছেন তিনি।

যুদ্ধের হিংস্রতার মধ্যে সামান্য কিছু নিয়মের চল আছে। যেমন, অনেক সময় একপক্ষ আরেক পক্ষের ওপর অভিযান চালানোর আগে বেসামরিকদের সরে যেতে অনুরোধ করে। বেসামরিকদের আওতায় সাংবাদিকরাও প্রায়ই Active warzone ত্যাগ করেন।

কিন্তু ১৯৯৯ সালে পূর্ব তিমুরের রণাঙ্গনে ম্যারি কলভিন পেশাদারিকে নিয়ে গেলেন এক অন্য পর্যায়ে। ২২ জন মিডিয়াকর্মী যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে গেলেন। বাকি সবাইকে বিদায় দিয়ে তিনি একাই থেকে যান ১ হাজার ৫০০ নারী ও শিশুর সঙ্গে। একের পর এক খবর জানিয়ে চমকে দেন গোটা বিশ্বকে। ওই যুদ্ধে গণহত্যার আশঙ্কা করা হচ্ছিল। কিন্তু মিডিয়াকর্মী যেখানে উপস্থিত, সেখানে আর গণহত্যা চালানোর ঘটনা ভাবে না কেউ। বেঁচে যায় ১৫০০ প্রাণ। আজকের যুগে সোশ্যাল মিডিয়ার কল্যাণে কোনো যুদ্ধের অনেক কিছুর খবরই সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু সেই সময় বিশ্বের মানুষের কাছে যুদ্ধের খবর দ্রুত পৌঁছানোর একমাত্র উপায় ছিল যুদ্ধক্ষেত্রের ভেতর থেকে করা রিপোর্টগুলো।

একইভাবে কসোভো ও চেচেনিয়া থেকেও তিনি একের পর এক রিপোর্ট করে যান। কসোভো যুদ্ধে অন্তত ১০০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলেন তিনি। চেচেনিয়া যুদ্ধের রিপোর্ট শেষ করে হিমশীতল বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে পৌঁছান। এমনকি স্যাটেলাইট ফোন নিয়ে যান তিনি, যাতে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ না হয়। ম্যারি কলভিনের পাঠানো সংবাদগুলো অনেকের অপছন্দের তালিকায় ছিল। আর তাই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল সব পথ! এই দুই যুদ্ধে সংবাদকর্মী হিসাবে কাজ করায় International Women's Media Foundation পদক পান তিনি।

২০০১ সালে শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধের সময় অনেকটা জোর করেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করেন তিনি। এক তামিল যোদ্ধার সাক্ষাৎকার নেন। পেশাদারির ঝুঁকি নেওয়ার মূল্য চুকাতে হয় নিজের চোখ দিয়ে!

হামলার মুখে পড়ে তার দলটি। তার খুব কাছেই একটি আরপিজি বিস্ফোরিত হয়। প্রাণে বেঁচে গেলেও এক চোখ হারান তিনি। তবে আহত হয়েও নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেন তিনি। শ্রীলঙ্কায় তাঁরই অনুসন্ধানী রিপোর্টের ভিত্তিতে মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগ আনার রাস্তা সহজ হয়।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, আমার কাজ মানবতায় চরম আঘাত প্রত্যক্ষ করা এবং সেটা জানানো। কামানের গোলা ১২০ মিলিমিটার না ১৫৫ মিলিমিটার, সেটা নিয়ে আমার আগ্রহ নেই। আরব বসন্তের সময় ম্যারি বিভিন্ন দেশে ঘুরে বেড়ান। গিয়েছিলেন ইরাক যুদ্ধেও।

সংঘাতের সময় মানবতাবিরোধীদের গণমাধ্যমের ওপর প্রায়ই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে দেখা যায়। ২৫ মার্চের কালরাত্রিতেও একই আচরণ করেছিল পাকিস্তান সরকার। গণহত্যার খবর যাতে দেশের বাইরে প্রচারিত না হয়, সেজন্য বন্দুকের মুখে সব বিদেশি সাংবাদিককে ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে আটকে রাখা হয় এবং ধরে করাচি পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ব্রিটেনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার ২৬ বছর বয়সি সাইমন ড্রিং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর চোখ এড়িয়ে থেকে যেতে সক্ষম হন। তার রিপোর্ট ধরেই বিশ্ব জানতে পারে 'ছোটোখাটো সংঘাত না', বরং বাংলাদেশে ভয়ানক মানবিক বিপর্যয় চলছে।

জোরপূর্বক সব বিদেশি সাংবাদিককে বের করে দেওয়া হলেও এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে টাইম ম্যাগাজিনের প্রতিনিধি ড্যান কগিনস ভারত সীমান্ত পার হয়ে কুষ্টিয়ায় পৌঁছান। তার প্রতিবেদন থেকেও বিশ্ব বাংলাদেশের অবস্থা আঁচ করতে পারে। ১৯৭১ সালের এপ্রিল-মে মাসের পর যুদ্ধক্ষেত্র আর কোনো সরেজমিন প্রতিবেদন হয়নি।

ম্যারি কলভিনও অনেকটা জোর করেই ২০১২ সালে সিরিয়ায় প্রবেশ করেন। সিরিয়ায় বিদেশি গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর তখন কড়া নিষেধাজ্ঞা। ম্যারি শুরু করলেন তার কাজ। একটার পর একটা খবর পাঠাতে শুরু করেন বাইরে। শেষ রিপোর্টে জানান একটু আগেও ৪৫ জন মারা গিয়েছে। খাবার পানির অপেক্ষায় আরও অনেকেই মৃত্যু পথযাত্রী। নিহত বেসামরিকদের হতাহত বাড়ছে!

তিনি যখন সিরিয়ার বাইরে খবর পাঠাচ্ছিলেন, তখন গোয়েন্দা ড্রোন ফোনের সিগন্যাল ধরে তার অবস্থান খুঁজে বের করে। এরপর

> “গোয়েন্দা ড্রোন ফোনের সিগন্যাল ধরে তার অবস্থান খুঁজে বের করে। এরপর তার ভাগ্যে ছিল কামানের গোলা। ম্যারি কলভিন যাদের গল্প বলে এসেছিলেন, মুহূর্তেই চলে যান তাদের দলে। পেশাদারির চরম পরিচয় দিতে হয় প্রাণ দিয়ে!”

তার ভাগ্যে ছিল কামানের গোলা। ম্যারি কলভিন যাদের গল্প বলে এসেছিলেন, মুহূর্তেই চলে যান তাদের দলে। পেশাদারির চরম পরিচয় দিতে হয় প্রাণ দিয়ে!

যুদ্ধের ময়দানে প্রথম সাংবাদিকের দেখা পাওয়া যায় ১৮৫৩ সালে ক্রিমিয়া যুদ্ধের সময়। ভিয়েতনাম যুদ্ধে নিহত হন ৬৮ জন সংবাদকর্মী। আধুনিক যুগে বেশির ভাগ সময় একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিককে একটি-দুটি যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করতে দেখা যায়। কিন্তু ম্যারি কলভিন এখানেই ব্যতিক্রম! একের পর এক যুদ্ধের ময়দানে 'PRESS' লেখা জ্যাকেট পরে সত্য খোঁড়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। ছয়টির বেশি যুদ্ধের সংবাদ তিনি তুলে ধরেছেন মানুষের সামনে!

এই লেখাটি যখন আপনি পড়ছেন, তখন বিশ্বের কোনো না কোনো প্রান্তে চলছে যুদ্ধ। খবরের কাগজ, টিভি সেট অথবা অনলাইন মাধ্যমে সেই যুদ্ধের খবর পৌঁছে যাচ্ছে আপনার কাছে। ম্যারি কলভিনকে হত্যার পর যুদ্ধক্ষেত্রে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা বন্ধ হয়নি, বরং নতুন প্রজন্মের সাংবাদিকরা বাড়তি উদ্যম এবং পেশাদারি পাচ্ছেন।

'PRESS' লেখা জ্যাকেট পরে গুলি-বোমার মধ্য দিয়ে ঘুরে বেড়ানো মানুষগুলোর জন্য শুভকামনা।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী

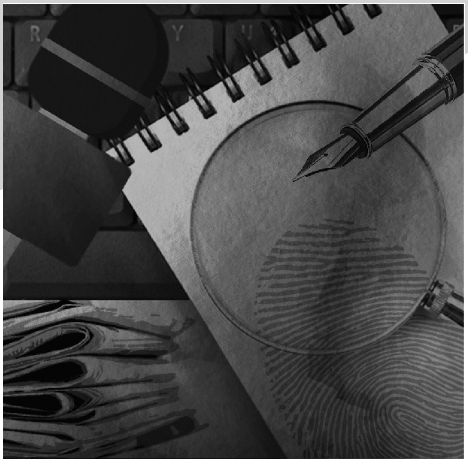

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা ও সামাজিক মাধ্যম

কামনা আক্তার
ইশরাত জাহান নিঝুম

Reality is an aspect of
Property. It must be
Seized. And investigative
Journalism is the Noble
art of seizing reality
backs from the powerful.
–Julian Assange (Australian editor, Publisher and activist)

১৯৯৬ সাল। কিছু সুনিশ্চিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গ্যারি ওয়েব ওহাইওর কেন্টাকি অনুমান করেছিলেন যে লসঅ্যাঞ্জেলেসে ঘেট্টোতে ক্র্যাক কোকেনের মহামারির পেছনে রাষ্ট্রের দায়বদ্ধতা থাকতে পারে। কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে বেরিয়ে এলো সাপ। অনুসন্ধানে দেখা গেল, মাদক বাণিজ্যে সিআইএ জড়িত। শুধু তা-ই নয়, রাষ্ট্রের উপর মহলও এর সঙ্গে সম্পৃক্ত। শুধু দেশের বাইরে নয়, দেশের ভেতরেই টনে টনে ক্র্যাক কোকেনের বাজার তৈরি করা হয়েছে। কৃষ্ণাঙ্গপল্লিগুলো তখন কোকেনপল্লিতে রূপ নিয়েছে। কোকেন বাণিজ্য থেকে উপার্জন হচ্ছিল মিলিয়ন নয়, বিলিয়ন ডলার। এর সবই ব্যবহার যাচ্ছিল কন্ট্রা এবং অন্য সমাজতন্ত্রবিরোধী সশস্ত্র বিদ্রোহীদের অস্ত্র কেনা এবং অন্তর্ঘাতমূলক কাজে। গ্যারি ঝুঁকি নিলেন। লিখতে শুরু করলেন ডার্ক অ্যালায়েন্স সিরিজ। তার কাজের বিপরীতে তার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু হলো। প্রচারিত হতে থাকল

গ্যারির প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত নির্ভরযোগ্য নয়। কিন্তু এত প্রচারণার পরও কোনোভাবেই তার অনুসন্ধান ও তথ্যকে মোকাবিলা করা যায়নি। তিনি সব বাধাবিপত্তি পেরিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে গেছেন (প্রথম আলো, ২০ মে ২০২১)।

যুগ যুগ ধরে গ্যারির মতোই যেসব সাংবাদিক কোনো ঘটনার সত্যতা উন্মোচনে, ঘটনার পেছনের ঘটনাকে অনুসন্ধান করে বের করে আনেন, তাদেরই বলা হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিক। আর এ সাংবাদিকদের পুরো কর্মপ্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। যে সাংবাদিকতার ভাবনাজুড়েই থাকে একটি বিশ্বাস ও বোধ–যে কোনোভাবেই হোক, মানুষকে সত্যটি জানাতেই হবে।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা এমন এক ধরনের সাংবাদিকতা, যেখানে শুধু ঘটনার সাদামাটা ও সরল বর্ণনা নয়, বরং সত্যের খোঁজে ঘটনার গভীর অনুসন্ধান।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সংজ্ঞায়নে The Dutch Flemish investigative Journalism group VVOJ-এর মতে, Investigative Journalism critical & in-depth journalism.

UNESCO-এর 'Investigative Journalism Handbook'-এ অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে সংজ্ঞায়নে বলেছে, 'Investigative Journalism involves exposing to the public matters that are concealed either deliberately by someone in a position of power, or accidentally behind a chaotic mass off facts & circumstances that obscure understanding. It requires using both secret & open sources & documents.'

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে অন্যান্য সাংবাদিকতার মূল পার্থক্যের জায়গা হলো–সাধারণ সাংবাদিক কোনো ঘটনার সাদামাটা ও সরল বর্ণনা দিয়েই তাদের কাজ শেষ করেন আর অনুসন্ধানী সাংবাদিক প্রবেশ করেন ঘটনার গভীর থেকে গভীরে।

পরিকল্পনা ছাড়া সাংবাদিকতা করা যায় না। অনুসন্ধানী রিপোর্টিংয়ের জন্য দরকার গভীর পরিকল্পনা। এটি কোনো ঘটনানির্ভর নয়, বরং একটি প্রক্রিয়ানির্ভর সাংবাদিকতা। এ ধরনের সাংবাদিকতায় একজন রিপোর্টারকে অনেক ধাপ পার করতে হয়। তবে উল্লেখ্য, রিপোর্টার ঘটা করে এসব ধাপ অনুসরণ করেন না। এগুলো তার চর্চার মধ্য দিয়ে অভ্যাসে পরিণত হয়।

আইডিয়া বা ধারণা থেকে শুরু হয় একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টারের যাত্রা। আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত কোনো টিপস, পুরোনো সোর্সের দেওয়া কোনো ক্লু, নিয়মিত পাঠাভ্যাস, ওয়েবে অনুসন্ধান, সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত কোনো প্রতিবেদন, প্রতিবেদকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ব্রেকিং নিউজের ফলোআপ প্রভৃতি নানা দিক থেকে একজন প্রতিবেদক অনুসন্ধানী রিপোর্টের ধারণা পেতে পারেন।

বর্তমান সময়ে তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের রিপোর্টের ধারণার বড়ো উৎস হয়ে উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বদৌলতে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে নতুন করে যুক্ত হয়েছে বৈচিত্র্যতা। উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

নিউ মিডিয়া বা নতুন মাধ্যম হিসাবে অনলাইন ভুবনে আবির্ভাব হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামাজিক নেটওয়ার্ক ফেসবুক আসে ২০০৪ সালে। ধীরে ধীরে এর পরিধি বৃদ্ধি পায় এবং চালু হয় টুইটার, মাইস্পেস, বেবু, হাইফাইয়ের মতো বেশকিছু সাইট। নাগরিকদের স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অন্যতম প্ল্যাটফরম হিসাবে কাজ করছে এসব সাইট। ক্ষমতাহীন মানুষ নিজেদের চাহিদা, প্রয়োজনকে অন্যের সামনে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে নিজেকে ক্ষমতায়িত করতে পারছে (আলম, ২০১০)। বিশ্বের মূলধারার অনেক গণমাধ্যম তাদের কাছ থেকেই বিপ্লবের সর্বশেষ তথ্য ও ছবি সংগ্রহ করে বিশ্বব্যাপী তা প্রচার করেছে (সাদী, ২০১১)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মূলত সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা এক ধরনের ওয়েবসাইট, যেখানে ব্যক্তি তার চিন্তাচেতনা, ধ্যানধারণা, আবেগ-অনুভূতিসহ মানবীয় বিষয়গুলো নিজস্ব পরিমণ্ডলে তুলে ধরার মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। সামাজিক মাধ্যম মূলত ব্যবহারকারী কর্তৃক আধেয় উৎপাদন ও বিনিময়ের মাধ্যম (Kaplan and Haenlein, 2010)। এর মাধ্যমে মানুষ তার ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে জোরালো ও বাস্তবিক পরিবর্তন আনতে পারছে (Kietzman and others, 2011)

সামগ্রিকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হচ্ছে ডিজিটাল ফর্মের মধ্যে মানুষে মানুষে গড়ে ওঠা একটা সম্পর্ক, যেখানে নিবন্ধিত ব্যবহারকারীরা প্রতিনিধিত্ব করে। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অথবা ইন্টারনেট ব্যবস্থার মাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে ভাগাভাগি করে। এই মাধ্যমে মানুষ একে অন্যের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে এবং ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো আদানপ্রদান করতে পারে।

বাংলাদেশে বর্তমানে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারকারীর সংখ্যা

মোট জনসংখ্যা	ইন্টারনেট ব্যবহারকারী	সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী
১৬৫.৫ মিলিয়ন (জানুয়ারি ২০২১)	৪৭.৬১ মিলিয়ন (জানুয়ারি ২০২১)	৪৫.০০ মিলিয়ন (জানুয়ারি ২০২১)

সূত্র: ডেটারিপোর্টাল-গ্লোবাল ডিজিটাল ইনসাইট

তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

ডিজিটাল প্রযুক্তির আগমন, বিশেষ করে ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আবিষ্কার সাংবাদিকতার জগতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। এরই মধ্যে বদলে গেছে সাংবাদিকতার ধরন ও আঙ্গিক। যুক্ত হয়েছে নানা বৈচিত্র্য। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে।

গত শতকের সত্তরের দশকে আসে ইন্টারনেট, আর ১৯৯৪ সালে জিওসাইটিস সাইটি প্রকাশের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের যাত্রা শুরু হয় (ফেরদৌসী, ২০১৯)। এর প্রভাবে শুরু হয় প্রযুক্তিনির্ভর তথ্যকেন্দ্রিক যোগাযোগব্যবস্থা। মানুষ নিয়োজিত হয় তথ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণব্যবস্থায়। এই মাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ জনগণ যে কোনো তথ্য, ছবি, অডিয়ো, ভিডিয়ো, মতামত ও ধারণা ভার্চুয়াল কমিউনিটি নেটওয়ার্কে বিনিময় করতে পারে (Ahlqvist and others, 2008)।

গত কয়েক বছরে সামাজিক মাধ্যম অত্যন্ত প্রভাবশালী মাধ্যম হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমের প্রভাবে গণমাধ্যমজগতে নানা মাত্রিক পরিবর্তন এসেছে। গণমাধ্যমের আলোচ্যসূচি নির্ধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী গণমাধ্যম জনগণের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে দেয় (Shaw & McCombs, 1977) । কিন্তু সামাজিক মাধ্যমের এ যুগে গণমাধ্যমের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে দিচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম (ফেরদৌসী, ২০১৮)। সামাজিক মাধ্যমে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয়, সে বিষয়টি গণমাধ্যমে গুরুত্ব পায়। সামাজিক মাধ্যম এক্ষেত্রে মূলধারার গণমাধ্যমের ওপর একধরনের অদৃশ্য চাপ তৈরি করছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অন্য সাংবাদিকদের মতো অনুসন্ধানী সাংবাদিকও সংবাদের সূত্র হিসাবে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার করছেন। একই সঙ্গে এ মাধ্যমগুলো বিশাল তথ্য উৎস হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

জর্জ গার্বনারের কালটিভেশন থিয়োরিতে বলা হয়েছে, মূলধারার গণমাধ্যম মানুষের বাস্তব জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। বাস্তব জগৎ সম্পর্কে দর্শকদের চিন্তাচেতনাকে সমানভাবে প্রভাবিত করে (Gerbner et al, 1980)। গণমাধ্যম প্রচারিত আধেয়গুলোর আলোকে সাধারণ জনগণ তাদের চিন্তাভাবনা তৈরি করে। কিন্তু বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বিকল্প মাধ্যম হিসাবে অডিয়েন্সের কাছে হাজির হয়েছে। ব্যবহারকারীরা সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা অডিয়ো-ভিডিয়োর পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দিতে পারছে, মন্তব্য করতে পারছে। ফলে সাধারণ জনগণের বাস্তব জগৎ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা বা ধারণা তৈরিতে গণমাধ্যমের যে একক ক্ষমতা ছিল, তা পরিবর্তন হয়েছে। বরং গণমাধ্যমকর্মীরা বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকরা কোনো ঘটনা অনুসন্ধানের মাধ্যমে যথাযথ অবস্থা তুলে ধরার আগেই সাধারণ জনগণ সামাজিক মাধ্যমে প্রচারিত বা প্রকাশিত তথ্য দ্বারা সে বিষয় সম্পর্কে একটা ধারণা নিজেদের মধ্যে তৈরি করে নিচ্ছে (Hahn & stalph, 2018)।

নোয়েল নিউম্যানের ‘নীরবতা কুণ্ডলী’ (Spiral of Silence) তত্ত্ব অনুযায়ী, ব্যক্তি যখন নিজের মতামতকে সংখ্যালঘু অবস্থানে দেখে, বিচ্ছিন্ন হওয়ার ভয়ে তার মতামত প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা থেকে বিরত থাকে বা নিজের মধ্যেই রেখে দেয়–এভাবে একপর্যায়ে ব্যক্তি পুরোপুরি নীরব হয়ে যায়। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের এ যুগে এসে যে কোনো মানুষ তার মন্তব্য প্রকাশ করতে পারছে। নিজের দেখা বিষয়ে সংবাদ তৈরি ও প্রকাশ করতে পারছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একজন ব্যবহারকারী প্রকাশক (ইলেকট্রনিক পাবলিশার) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আর সাধারণ জনগণ কর্তৃক প্রকাশিত আধেয়

> “সামাজিক মাধ্যম শুধু সংবাদসূত্র খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সংবাদ উৎসের সঙ্গে সব সময় যুক্ত থাকতে সাহায্য করছে। সহজেই বৈশ্বিক পর্যায়ের দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে”

অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সংবাদসূত্র হিসাবে ব্যাপক আকারে কাজ করছে।

নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম

গত শতাব্দীর শেষদিকে এসে সামাজিক মাধ্যমের যাত্রা শুরু হয়। সামাজিক মাধ্যমে যে কোনো নাগরিক তার বক্তব্য, সমস্যা, বিভিন্ন বিষয়ে মতামত তুলে ধরতে পারে। সামাজিক মাধ্যমের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো, কোনো ধরনের গেটকিপিং ছাড়াই এখানে তথ্য, সংবাদ কিংবা মতামত প্রকাশ করা যায়। যে কোনো নাগরিক তার আশপাশ, সমাজব্যবস্থা, প্রশাসনিক অসংগতি, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতা, দুর্নীতিসহ যে কোনো বিষয় অবলীলায় প্রকাশ করার সুযোগ পায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যাপক ব্যবহার এবং এর সহজলভ্যতা প্রভাব ফেলেছে সাংবাদিকতার জগতে। সাংবাদিকতায় বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় যুক্ত হয়েছে নানা বৈচিত্র্য। ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক মাধ্যম এখন অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের জন্য একদিকে যেমন বড়ো একটি হাতিয়ার, তেমনই অন্যদিকে তথ্যের উৎসে পরিণত হয়েছে (Coronel, 2009, p. 65)।

বর্তমানে দেশীয় প্রেক্ষাপটে ইন্টারনেট অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার মৌলিক গবেষণার জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। Alan knight তার Online Investigative Journalism নিবন্ধে বলেছেন, The Internet offers investigative journalism New tools for Reporting; qualified access to global communities of interests which may provide alternate sources to those in Authority.

সামাজিক মাধ্যম শুধু সংবাদসূত্র খুঁজে পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং সংবাদ উৎসের সঙ্গে সব সময় যুক্ত থাকতে সাহায্য করছে। সহজেই বৈশ্বিক পর্যায়ের দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে। একই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যমের সাহায্যে অনুসন্ধানী সাংবাদিক আঞ্চলিক এবং একই সঙ্গে নিজ দেশের সীমানার গণ্ডি অতিক্রম করে বৈশ্বিক পর্যায়ের অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারছে। মিডিয়া সেন্টারগুলোও পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারছে। পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারছে (Gearing, 2014)।

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সবচেয়ে বড়ো অবদান–যেসব তথ্য সাধারণত মূলধারার মিডিয়ায় প্রকাশিত হয় না, বিতর্কিত সেসব তথ্যও পৌঁছে যাচ্ছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কাছে। একই সঙ্গে সামাজিক মাধ্যম ও ওয়েবভিত্তিক যোগাযোগ মাধ্যমে আঞ্চলিক ও জাতীয় প্রতিবেদনগুলোকে সমৃদ্ধ করে এবং এদের আন্তর্জাতিক মানের প্রতিবেদন রূপায়ণে ভূমিকা রাখে (Gearing, 2014)।

এছাড়াও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার বিভিন্ন ধাপে সহায়তা করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম:

১. সংবাদের সূত্র পাচ্ছেন

অনুসন্ধানী সাংবাদিক সমাজে ওয়াচডগের ভূমিকা পালন করেন। তারা তাদের অনুসন্ধানের মাধ্যমে সমাজে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন অসংগতি, দুর্নীতি, অনিয়মসহ নানা দিক তুলে নিয়ে আসেন। এজন্য সব সময় তাদের চোখ-কান খোলা রাখতে হয় এবং সংবাদ বোঝার নাক (Nose for News)-এর ব্যাপারটি তাদের ক্ষেত্রে বেশি কার্যকর থাকতে হয়। আর এই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অনুসন্ধান সাংবাদিকদের সংবাদ ক্লু বা সূত্র পেতে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। বিভিন্ন ধরনের আপডেট, সূত্র, তথ্য প্রভৃতি পেতে অনুসন্ধানী সাংবাদিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বেশ সক্রিয় থাকেন।

চলতি বছর ৬ মে Global Investigative journalism network-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন, যুক্তরাজ্যের সাংবাদিক ম্যাকক্লিনাহান প্রতিবেশীর এক টুইটার পোস্ট থেকে একটি ক্লু পান। ২০১৭ সালের শীতে, টুইটারে স্ক্রল করতে করতে একটি পোস্টে তার চোখ আটকে যায়। পোস্টটি করেছিলেন সেই এলাকারই এক অধিবাসী। বিষয় ছিল: গৃহহীন এক ব্যক্তির মৃত্যু। এই সূত্রকে সামনে রেখে সাংবাদিক ম্যাকক্লিনাহান অনুসন্ধান শুরু করেন। ১৮ মাসের অনুসন্ধান শেষে ৮০০টি মৃত্যু লিপিবদ্ধ করেছিলেন। প্রত্যেক মৃতব্যক্তির আলাদা আলাদা গল্পের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে গৃহহীনদের সুরক্ষা দিতে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা এবং কাঠামোগত এই ব্যর্থতার কারণে যুক্তরাজ্যে কীভাবে গৃহহীনতা টিকে থাকছে, এ বিষয়টি বেরিয়ে আসে। তিনি বিষয়টি নিয়ে একটি পডকাস্টও করেছিলেন (GIJN, 2021)।

বাংলাদেশ প্রেক্ষপটে

এ বছরের মে মাসের শেষ সপ্তাহে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়। যেখানে দেখা যায়, ভারতের বেঙ্গালুরুতে বাংলাদেশি এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতন করা হয় (বাংলা ট্রিবিউন, ২৮ মে ২০২১)।

অনুসন্ধানী সাংবাদিক সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিয়োটিকে সংবাদসূত্র হিসাবে পাওয়ার পর অনুসন্ধান চালান। অনুসন্ধানের একপর্যায়ে বের হয়ে আসে একটি চক্র টিকটক ভিডিয়ো তৈরির নামে বাইরের দেশে নারী পাচার করছে। বাংলাদেশি যুবক টিকটক হৃদয় বাবু (২৬) চাকরির প্রলোভনসহ নানা ফাঁদে ফেলে ২ বছরে অন্তত ৫০ নারীকে পাচার করেছে (যুগান্তর, ২ জুন ২০২১)।

২. তথ্যের অন্যতম উৎস

যেসব ঘটনা সাধারণ মানুষের চোখের আড়ালে ঘটে, সেগুলোকে খুঁজে বের করাই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজ। এই কাজের ক্ষেত্রে অন্যতম সহায়ক বা প্রাথমিক উৎসের কাজ করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। কেননা বর্তমান ডিজিটাল যুগে সামাজিক মাধ্যম নাগরিক সাংবাদিকতার একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে, যা অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকেও বহুলাংশে সহজ করে দিয়েছে।

ইউনিভার্সিটি অব এলিয়েনের একটি গবেষণায় (২০০৮) দেখা যায়, ব্লগ বিভিন্ন সংবাদপত্রের শক্তিশালী তথ্যের উৎস। ইউটিউবে প্রকাশিত ভিডিয়ো ক্লিপগুলোর ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় (২০১০) দেখা যায়, মূলধারার গণমাধ্যম কোনো বিষয়কে চেপে গেলে বা এড়িয়ে গেলে সামাজিক মাধ্যম সেটিকে আলোচনায় নিয়ে আসে (ফেরদৌসী, ২০১৯)।

বাংলাদেশের বহুল আলোচিত একটি ঘটনা হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলা। যেখানে হামলার ভিডিয়ো ফুটেজ প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল ফেসবুকে। পাশের একটি ভবন থেকে একজন কোরিয়ান নাগরিক ভিডিয়ো ধারণ করেন। তখন প্রকাশিত এই ভিডিয়োটি পেশাদার সাংবাদিক, পুলিশ উভয়ের জন্যই তথ্যের প্রাথমিক উৎসে পরিণত হয় (ফেরদৌসী, ২০১৯)।

অর্থাৎ, এই সামাজিক মাধ্যম পুলিশ ও পেশাদার সাংবাদিকসহ অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কোনো ঘটনার তথ্যের প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করছে।

৩. ঘটনা বিশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপে সহায়তা করছে

অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় ঘটনার বিভিন্ন দিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অন্যতম একটি টুল হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। যে কোনো ঘটনার ক্ষেত্রেই সাংবাদিক অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের

ফেসবুক পেজ, বিভিন্ন পাবলিক প্রোফাইল কিংবা গ্রুপ মেসেজিংয়ের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সন্ধান করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে অনুসরণ করে বা সামাজিক মাধ্যমে তাদের অ্যাক্টিভিটি অনুসরণ করে ওই ব্যক্তিকে শনাক্ত করতে পারেন। আবার অনেক সময় শুধু সামাজিক মাধ্যমকেই কেন্দ্র করে সম্পূর্ণ ঘটনা বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদন তৈরি করেন।

২০১৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর যমুনা টেলিভিশনে একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট প্রচারিত হয়। যেখানে দেখানো হয় হত্যা মামলায় ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত এবং পলাতক আসামিরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে ওই আসামিরা প্রকাশ্যে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং প্রশ্ন ফাঁসসহ বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে, সে বিষয়গুলো দেখানো হয়েছে। প্রতিবেদনটিতে দেখা যায়, রিপোর্টার আসামিদের ফেসবুক প্রোফাইল বিশ্লেষণ করে এবং সামাজিক মাধ্যমে তাদের অ্যাক্টিভিটি বিশ্লেষণ করে তাদের অবস্থান বা লোকেশন শনাক্ত করেছেন। আসামিদের লোকেশন ট্র্যাকিংয়ের ক্ষেত্রে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সহায়তা করেছে।

৪. এজেন্ডা সেট করে দিচ্ছে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণমাধ্যমের এজেন্ডা সেট করতে ভূমিকা পালন করছে। আলোচ্যসূচির নির্ধারণ তত্ত্ব অনুযায়ী গণমাধ্যম দর্শকদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম গণমাধ্যমের আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করে দিচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচিত এবং জনগণের আগ্রহ (Public Interest) আছে–এমন বিষয় নিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক অনেক সময় তাদের অনুসন্ধান করতে বাধ্য হচ্ছেন।

৫. সোর্সের সঙ্গে কানেক্টিভিটি

সংবাদ-সোর্সের সঙ্গে নিবিড় সংযুক্তি সব সময়ই সাংবাদিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনলাইন প্ল্যাটফরম মানুষকে বলা এবং লেখার সুযোগ মূলধারার গণমাধ্যমের চেয়েও বেশি দিচ্ছে, যাকে উৎস হিসাবে কাজে লাগিয়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক নতুন সব স্টোরি কাভারেজের সুযোগ পাচ্ছেন।

৬. অডিয়েন্সের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে

সামাজিক মাধ্যম অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের শুধু সংবাদসূত্র, তথ্য উৎস বা ঘটনা বিশ্লেষণের কাজেই সহায়তা করছে না, বরং দীর্ঘ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে অনুসন্ধানকৃত তথ্যটি দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেও সহায়তা করছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায়, অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ধাপে ধাপে অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম।

চ্যালেঞ্জ

Robert Putnam তার বই ‘Bowling Alone’-এ ব্যাখ্যা দেন–সমাজে পারস্পরিক সেতুবন্ধ তৈরির মেকানিজম হলো ইন্টারনেট। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপন করে ইন্টারনেট ও ইন্টারনেটভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের আগমনে সাংবাদিকতায় বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুক্ত করেছে নানা বৈচিত্র্য। এ সাংবাদিকতায় উন্মোচিত হয়েছে এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার।

তবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে কিছুটা চ্যালেঞ্জের মুখেও পড়েছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ জনগণ যা খুশি তা-ই প্রকাশ করতে পারে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া। ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশত বিকৃত ও অসত্য তথ্য প্রকাশ হওয়ার সুযোগ থাকে শতভাগ। আর এসব ভুল তথ্য অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অনেক সময় ভুলপথে পরিচালিত করে। সামাজিক মাধ্যম এবং অনলাইন মাধ্যমের ভুয়া তথ্য, ভুয়া প্রোফাইল এবং মাত্রাতিরিক্ত সংবাদ উৎসের কারণে বিচিত্র ধরনের তথ্যের পরিমাণ বেড়ে গেছে। এ কারণে ‘Information Overloaded’ তৈরি হয়েছে। ফলে অনুসন্ধানী সাংবাদিক নতুন ধরনের একটি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন। আর Information Overloaded-এর সময়ে অনুসন্ধানী সাংবাদিক আবার প্রথাগত পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করতে বাধ্য হচ্ছেন। একই সঙ্গে সংবাদ উৎসের সঙ্গে পুনরায় মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে (Xu & Gutsche, 2020)।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত তথ্যের প্রবাহের কারণে অনুসন্ধানী সাংবাদিক একটি ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে যথাযথ বা সত্য তথ্য উপস্থাপনের আগেই সাধারণ জনগণ সেই ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে একটি ধারণা নিয়ে নিচ্ছেন (Hahn & Stalph, 2018)। আর সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হলো–পুরোপুরি অনুসন্ধান শেষ হওয়ার আগেই অনেক সময় তথ্য ফাঁস হয়ে যাচ্ছে, যা সঠিক অনুসন্ধানে বাধার সৃষ্টি করে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কারণে তথ্য অনেক বেশি সহজলভ্য হয়ে গেছে। মূলধারার গণমাধ্যমগুলো তথ্যের জন্য সামাজিক মাধ্যমের

“সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাধারণ জনগণ যা খুশি তা-ই প্রকাশ করতে পারে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়া। ইচ্ছাকৃত ও ভুলবশত বিকৃত ও অসত্য তথ্য প্রকাশ হওয়ার সুযোগ থাকে শতভাগ। আর এসব ভুল তথ্য অনুসন্ধানী সাংবাদিককে অনেক সময় ভুলপথে পরিচালিত করে”

ওপর নির্ভর করছে। আর তথ্য সহজলভ্য হওয়ায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকের কাজের পরিধি কমে গেছে। কারণ সামাজিক মাধ্যমের সহজলভ্যতায় অনুসন্ধানী সাংবাদিকের ভূমিকা পালন করছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো নিজেই। আর এর প্রভাবে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চর্চার সুশৃঙ্খল কাঠামো ভেঙে যাওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসার ও সহজলভ্যতায় একুশ শতকের পৃথিবীতে গণমাধ্যমব্যবস্থায় আসছে লক্ষণীয় পরিবর্তন। সাংবাদিকতার ধরনেও পরিবর্তন আসছে। বিশেষ করে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় একটা নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। যে ঘটনাগুলো সাধারণত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না বা অজানা থেকে যায়, সেসব ঘটনা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে অনুসন্ধানী সাংবাদিকদের কাছে পৌঁছে যায়। যার সূত্র ধরে অনুসন্ধানী সাংবাদিক কোনো ঘটনার পেছনের ঘটনাকে সামনে নিয়ে আসেন। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের গতিশীলতা অনেক সময় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় বাধা সৃষ্টি করে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও একুশ শতকের পৃথিবীতে সামাজিক যোগাযোগামাধ্যম অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় নতুন সম্ভাবনা নিয়ে হাজির হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. খান, নাঈমুল ইসলাম এবং রাজী, আলী আল (১৯৯৬), অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ঢাকা, বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন।

২. ফেরদৌস, রোবায়েত, চৌধুরী, মোহাম্মদ সাইফুল আলম, হক, সাইফুল (২০১৫), দুর্নীতি, সুশাসন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতা, ট্রান্সপ্যারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ।

৩. সাদি, সাফওয়ান (২০১১), বিপ্লবের বাহন 'নিউ মিডিয়া', মিডিয়াওয়াচ, সংখ্যা: ৭, ৭ ফেব্রুয়ারি।

৪. ফেরদৌসী, হেলেনা (২০১৯), নয়া মাধ্যম ও আমাদের জীবন, ঢাকা, অন্যধারা।

৫. Ahlqvist, T., Back, A., Halonen, M., Heinone,s. (2008). Social Media Roadmaps: Exploring the Futures triggered by social Media, VTT Technical Research Centre of Finland.

৬. Gerbner, George, Gross Larry, Morgan, Michael and singnorielli, Nancy. (1980). (The 'Mainstreaming' of America, Violence profile No. 11 Journal of communication, 30.

৭. Kaplan, A.M and Haenlein, M. (2010). Social Media: back to the rootsand back to the Future, ESCP Europe.

৮. Kietzman, J.H., Hermkens, K., McCarthy, I.p., and Silvestre, B.S. (2011). Social Media? Get Serious! Understanding the Functional building blocks of Social Media, Business horizons.

৯. https://datareportal.com/reports/digital-2021-bangladesh.

১০. https://www.dhakatribune.com/ bangladesh/ 2021/04/ 26/bangladesh-charts-9m-new-social-media-users.

লেখকদ্বয়: গণমাধ্যমকর্মী

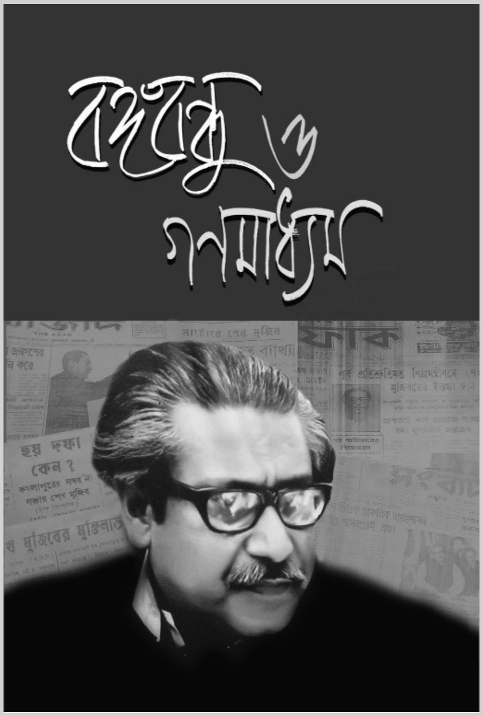

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টকে প্রধানমন্ত্রীর ১০ কোটি টাকার অনুদান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশব্যাপী সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে ১০ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জানান, প্রধানমন্ত্রী করোনার এই দুঃসময়ে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের সহযোগিতার অংশ হিসাবে 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে অনুদানের এই অর্থ দিয়েছেন। করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন পেশার মানুষকে প্রধানমন্ত্রী যে সহায়তা দিচ্ছেন, এরই অংশ হিসাবে সাংবাদিকদের জন্য এ অর্থ দেওয়া হয়।

সূত্র: ২৮ এপ্রিল ২০২১, সমকাল

সরকারের সমালোচক দুস্থ সাংবাদিকের জন্যও সহায়তা: তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

সরকারের সমালোচনাকারী সাংবাদিক যদি দুস্থ হন, তার জন্যও কল্যাণ ট্রাস্টের সহায়তা উন্মুক্ত বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ। ৪ মে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের সহায়তা চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসাবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, সচিব খাজা মিয়া বক্তব্য রাখেন। আলোচনায় অংশ নেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজে সভাপতি মোল্লা জালাল, যুগ্ম মহাসচিব আব্দুল মজিদ, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন-ডিইউজে সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ আলম খান তপু। ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, 'বাংলাদেশের গণমাধ্যম যে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে, উন্নয়নশীল দেশের জন্য তা নজিরবিহীন। বহুমাত্রিক সমাজব্যবস্থাকে এগিয়ে নেওয়া ও রাষ্ট্রের বিকাশের স্বার্থে এটি প্রয়োজন, সে বিশ্বাস নিয়েই আমরা কাজ করছি।'

সূত্র: ৫ মে ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

কবরীর স্মরণসভা

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, 'রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গন, মুক্তিযুদ্ধ ও ১৯৭৫ সালের পর কবরীর যে ভূমিকা ছিল, তিনি যে অবদান রেখেছেন, তা জাতি কখনো ভুলবে না।' ২৫ মে অভিনেত্রী ও মুক্তিযোদ্ধা সারাহ বেগম কবরীর এক স্মরণসভায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন। জাতীয় প্রেস ক্লাবের রাউন্ড টেবিল মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোট কেন্দ্রীয় কমিটি এ স্মরণসভার আয়োজন করে। স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সিনিয়র সহসভাপতি ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠশিল্পী রফিকুল আলম। বক্তব্য রাখেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মুরাদ হাসান, আওয়ামী লীগের উপপ্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক অরুন সরকার রানা প্রমুখ।

সূত্র: ২৬ মে ২০২১, কালের কণ্ঠ

গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডসে প্রথম আলোর স্বীকৃতি

দেশের সবচেয়ে বড়ো অবকাঠামো প্রকল্প পদ্মা সেতু। এই সেতুর দুই পারের সংযোগের দিনটি ঘিরে গত ডিসেম্বরে প্রথম আলো পত্রিকা ও অনলাইনের বিশেষ আয়োজন ছিল 'প্রত্যাশার ৬.১৫ কিলোমিটার'। এই আয়োজনের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেল প্রথম আলো। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ মিডিয়া অ্যাসোসিয়েশন (ইনমা) আয়োজিত 'গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডস ২০২১'-এ একটি বিভাগে সম্মানজনক স্বীকৃতি (অনারেবল মেনশন) পেয়েছে প্রথম আলো। বিশ্বের পত্রিকা,

টেলিভিশন, রেডিয়োসহ সংবাদমাধ্যমের জন্য সম্মানজনক এই পুরস্কারের আসরে প্রথমবারের মতো স্বীকৃতি পেল বাংলাদেশি কোনো সংবাদমাধ্যম। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসভিত্তিক বৈশ্বিক সংগঠন ইনমা ১৯৩৭ সাল থেকে বিশ্বের সংবাদমাধ্যমগুলোকে স্বীকৃতি ও পুরস্কার দিয়ে আসছে। ৭৭টি দেশের আট শতাধিক সংবাদমাধ্যম ইনমার সদস্য। সংবাদমাধ্যমের ব্যবসা, ব্র্যান্ড ও পাঠকদের নিয়ে কাজ করা বিশ্বের বৃহত্তম সংগঠন এটি। এবার গ্লোবাল মিডিয়া অ্যাওয়ার্ডে ৩৭টি দেশের সংবাদমাধ্যমের ৫৮টি উদ্যোগকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

সূত্র: ৫ জুন ২০২১, প্রথম আলো

তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন

তথ্য মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১৫ মার্চ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, নতুন নাম 'তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়'। ইংরেজিতে Ministry of Information and Broadcasting।

তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে জানা যায়, তথ্য মন্ত্রণালয় যে কাজ করে, নামে এর পুরো প্রতিফলন নেই। তথ্য মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধিতে তথ্য ছাড়াও একটি বড়ো অংশজুড়ে রয়েছে ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট গণমাধ্যম সংক্রান্ত কার্যাবলি। তাই নামে 'সম্প্রচার' শব্দটি যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

সূত্র: ১৬ মার্চ ২০২১, দৈনিক ইত্তেফাক

তপন বিশ্বাস

মাসুদুল হক

সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের নতুন কমিটি

সচিবালয় বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়েট রিপোর্টার্স ফোরামের (বিএসআরএফ) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন জনকণ্ঠের তপন বিশ্বাস এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন ইউএনবির মাসুদুল হক। সহসভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন দৈনিক বর্তমানের মোতাহার হোসেন। ২০২১-২২ কার্যনির্বাহী কমিটি গঠনে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ১৩ জুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করেন। নির্বাচন কমিশনের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন ভোরের কাগজ সম্পাদক শ্যামল দত্ত এবং দৈনিক সংবাদের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন। কমিটিতে সহসাধারণ সম্পাদক মেহেদী আজাদ মাসুম (জাগরণ), সাংগঠনিক সম্পাদক আকতার হোসাইন (ভোরের ডাক), অর্থ সম্পাদক মো. শফিউল্লাহ সুমন (বিটিভি), দপ্তর সম্পাদক মো. মোসকায়েত মাশরেক (রেডিয়ো টুডে) এবং প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন বাহরাম খান (কালের কণ্ঠ), প্রশিক্ষণ ও গবেষণা সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন তাওহিদুল ইসলাম (আমাদের সময়)।

সূত্র: ১৪ জুন ২০২১, কালের কণ্ঠ

ডিআরইউ-এর ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

বিভিন্ন আয়োজনে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) ২৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে ২৬ মে জাতীয় পতাকা ও সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে সীমিত পরিসরে শোভাযাত্রা বের করা হয়। দুপুরে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর কেক কাটেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদসহ সংগঠনের বর্তমান ও সাবেক নেতারা। ডিআরইউ প্রাঙ্গণে সংগঠনটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ডিআরইউ সভাপতি মুরসালিন নোমানী ও সাধারণ সম্পাদক মসিউর রহমান খান সংগঠনের সব সদস্যকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, গঠনতন্ত্র ও সাধারণ সদস্যদের সেন্টিমেন্টকে ধারণ করে সব সময় এগিয়ে চলে ডিআরইউ। অনুষ্ঠানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদমন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম, বিএনপির প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সাইফুল আলম, বর্তমান সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন, সাধারণ সম্পাদক ইলিয়াস খান, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাবেক সভাপতি শফিকুল করীম সাবু ও ইলিয়াস হোসেন, রফিকুল ইসলাম আজাদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শুক্কুর আলী শুভ, কবির আহমেদ খান, রিয়াজ চৌধুরীসহ ইউনিটির কর্মকর্তা ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সূত্র: ২৭ মে ২০২১, কালের কণ্ঠ

কান চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলাদেশের ইতিহাস

বিশ্ব চলচ্চিত্রের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আসর কান চলচ্চিত্র উৎসবের ৭৪তম আসরে ইতিহাস গড়লেন বাংলাদেশের নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদ। তার পরিচালনায় নির্মিত সিনেমা 'রেহানা মরিয়ম নূর' উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'আঁ সার্তে রিগা'-এ জায়গা করে নিয়েছে।

৩ জুন প্যারিসের ইউজিসি নরম্যান্ডি প্রেক্ষাগৃহে আসরের চারটি বিভাগে প্রতিযোগিতা করা ছবির নাম ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে একটি আঁ সার্তে রিগা বিভাগ। ১৮টি দেশের সিনেমা এ বিভাগে প্রতিযোগিতা করে। এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন উৎসবের জেনারেল ডেলিগেট থিয়েরি ফ্রেমো ও সভাপতি পিয়েরে লেসকিউর। এবারই প্রথম বাংলাদেশের কোনো ছবি আঁ সার্তে রিগা বিভাগে জায়গা করে নিল। উৎসবের নির্বাচিত ছবি হিসেবে রেহানা মরিয়ম নূরের নাম ঘোষণার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নির্মাতা আবদুল্লাহ মোহাম্মদ সাদকে অভিনন্দন জানান অনেকে। 'রেহানা মরিয়ম নূর' ছবিটির প্রেক্ষাপট প্রসঙ্গে সাদ জানান, প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের এক শিক্ষক রেহানা মরিয়ম নূরকে কেন্দ্র করেই এই ছবির গল্প। ছবিতে রেহানা একজন মা, মেয়ে, বোন ও শিক্ষক হিসাবে জটিল জীবনযাপন করেন। এর মধ্যে এক সন্ধ্যায় কলেজ থেকে বেরোনোর সময় রেহানা এক অপ্রত্যাশিত ঘটনার সাক্ষী হন। এক ঘণ্টা ৪৭ মিনিটের এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সাবেরী আলম, আফিয়া জাহিন জায়মা, আফিয়া তাবাসসুম বর্ণ, কাজী সামি হাসান, ইয়াসির আল হক, জোপারি লুই, ফারজানা বীথি, জাহেদ চৌধুরী মিঠু, খুশিয়ারা খুশবু অনি ও অভ্রদিত চৌধুরী।

সূত্র: ৪ জুন ২০২১, সমকাল

রয়টার্সের প্রথম নারী সম্পাদক গ্যালোনি

প্রভাবশালী আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের ১৭০ বছরে এই প্রথম কোনো নারী প্রধান সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি হলেন আলেসান্দ্রা গ্যালোনি। ৪৭ বছর বয়সি গ্যালোনি বর্তমানে রয়টার্সের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় একজন সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি রয়টার্সের বর্তমান প্রধান সম্পাদক স্টিফেন জে. অ্যাডলারের স্থলাভিষিক্ত হলেন। এক দশক ধরে রয়টার্সের বার্তাকক্ষকে নেতৃত্ব দেওয়ার পর অবসরে গেছেন অ্যাডলার। তাঁর নেতৃত্বকালে রয়টার্স কয়েক শ পুরস্কার পায়। এর মধ্যে সাংবাদিকতার সর্বোচ্চ সম্মান পুলিৎজারও রয়েছে। গ্যালোনি রোমের অধিবাসী।

সূত্র : ১৪ এপ্রিল ২০২১, সমকাল

পুলিৎজার জয় কিশোরীর

যুক্তরাষ্ট্রে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তার হাতে কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জর্জ ফ্লয়েড হত্যার ভিডিয়ো ধারণকারী পথচারী কিশোরী ডারনেলা ফ্রেজিয়ারকে বিশেষ বিভাগে পুলিৎজার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। গত বছর ২৫ মে শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মকর্তা ডেরেক শভিন হাঁটু দিয়ে জর্জ ফ্লয়েডের ঘাড় চেপে ধরেন। এতে দম বন্ধ হয়ে মারা যান ফ্লয়েড। মোবাইল ফোনে ওই ঘটনার ভিডিয়ো ধারণ করে ডারনেলা।

এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পুলিশ ব্যবস্থায় বর্ণবৈষম্য নিয়ে সাংবাদিকতার স্বীকৃতি হিসাবে পুলিৎজার পুরস্কার পেয়েছে দ্য মিনিয়াপলিস স্টার ট্রিবিউন, বার্তা সংস্থা রয়টার্স ও দ্য আটলান্টিক। ফ্লয়েড হত্যাকাণ্ডের খবর দ্রুত প্রকাশ করার জন্য দ্য মিনিয়াপলিস স্টারকে পুরস্কৃত করা হয়। এসবের পাশাপাশি কোভিড-১৯ মহামারি নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রচারের জন্য জনসেবা সাংবাদিকতার সম্মান দেওয়া হয়েছে নিউইয়র্ক টাইমসকে। পুলিৎজার পুরস্কারের ২২টি বিভাগের মধ্যে এটিকেই সবচেয়ে লোভনীয় বিবেচনা করা হয়।

সূত্র: ১৩ জুন ২০২১, কালের কণ্ঠ

শোক সংবাদ

সৈয়দ শাহজাহান

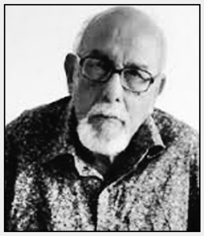

বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের প্রেস সচিব বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীণ সাংবাদিক সৈয়দ শাহজাহান ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)।
২৮ এপ্রিল রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭৮ বছর বয়সে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সৈয়দ শাহজাহান দৈনিক ইত্তেফাকে প্রায় ৪৫ বছর সাংবাদিকতা করেন। প্রধান প্রতিবেদক, শিফট ইনচার্জসহ বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি কচিকাঁচার আসরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গেও তাঁর বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল।

হাসান শাহরিয়ার

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক ইত্তেফাকের সাবেক নির্বাহী সম্পাদক হাসান শাহরিয়ার (৭৬) (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)।

৯ এপ্রিল রাজধানীর ইমপালস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। ফুসফুসের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন হাসান শাহরিয়ার। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে আইসিইউতে স্থানান্তর করার পর তিনি মারা যান। হাসান শাহরিয়ার ১৯৪৪ সালের ২৫ এপ্রিল সুনামগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গত শতকের ষাটের দশকে দৈনিক ইত্তেফাকে সাংবাদিকতা শুরু করেন। তিনি পাকিস্তানের করাচিতে পড়াশোনা ও দৈনিক ডন পত্রিকায় কাজ করেন। সত্তরের দশকের শুরুতে ঢাকায় এসে দৈনিক ইত্তেফাকে কাজ শুরু করেন। ২০০৮ সালে নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে ইত্তেফাক থেকে অবসর নেন হাসান শাহরিয়ার। ইত্তেফাকের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সাময়িকী নিউজ উইক, আরব নিউজ, ডেকান হ্যারাল্ডসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকার বাংলাদেশ প্রতিনিধি ছিলেন তিনি। 1993-৯৪ সালে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন হাসান শাহ-রিয়ার। তিনি কমনওয়েলথ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (সিজেএ) আন্তর্জাতিক সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন।

সারাহ বেগম কবরী

বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি অভিনেত্রী সারাহ বেগম কবরী (৭০) মারা গেছেন। ১৭ এপ্রিল করোনায় আক্রান্ত হয়ে রাজধানীর শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। অতুলনীয় অভিনয় দিয়ে কোটি কোটি ভক্তের হৃদয় জয় করা কবরী চট্টগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মীনা পাল। চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে ১৯৫০ সালের ১৯ জুলাই জন্ম সারাহ বেগম কবরীর। ঢাকার চলচ্চিত্রে এসে তিনি কবরী নামেই পরিচিতি পান। পরে তিনি সারাহ বেগম কবরী নাম ধারণ করেন। সুভাষ দত্তের পরিচালনায় 'সুতরাং' ছবির নায়িকা হিসাবে কবরীর অভিনয় জীবনের শুরু, যা মুক্তি পেয়েছিল ১৯৬৪ সালে। এরপর অভিনয় করেছেন তিন শতাধিক ছবিতে। ষাট ও সত্তর দশকে এদেশের চলচ্চিত্র রাজত্ব করা প্রায় সব নায়কের প্রথম নায়িকা হিসাবে অভিনয়ের গৌরব একমাত্র

কবরীরই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পরিবারের সঙ্গে ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি চলে যান কবরী। সেখান থেকে ভারতে পাড়ি দেন। আগরতলা থেকে প্রচারিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে কাজ করেছেন একজন কণ্ঠযোদ্ধা হিসাবে।

মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ ওয়াসিম

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনালি দিনের আরেক অভিনয়শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ ওয়াসিম (৭১) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। ১৭ এপ্রিল রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 'রাতের পর দিন' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে নায়ক হিসাবে অভিষেক হয় ওয়াসিমের। ১৯৭৬ সালে মুক্তি পাওয়া এসএম শফী পরিচালিত 'দ্য রেইন' চলচ্চিত্র তাঁকে ব্যাপক পরিচিতি এনে দেয়। ১৯৭৩ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত চলচ্চিত্রে শীর্ষ অভিনেতাদের অন্যতম ছিলেন তিনি। অভিনয়জীবনে ১৫২টি ছবিতে অভিনয় করেছেন ওয়াসিম।

খোন্দকার ফজলুর রহমান ফিউরি

খ্যাতিমান সাংবাদিক, জাতীয় প্রেস ক্লাবের জ্যেষ্ঠ সদস্য ও ডেইলি অবজারভারের যুগ্ম বার্তা সম্পাদক খোন্দকার ফজলুর রহমান (ফিউরি খোন্দকার) (৭০) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। ১৫ মে ঢাকার সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সত্তরের দশকে দ্য বাংলাদেশ অবজারভারে সাংবাদিকতা শুরু করেন। কিছুদিন বার্তা সংস্থা ইউএনবিতে কাজ করেন। টাঙ্গাইলের মির্জাপুর উপজেলায় নিজ গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। খোন্দকার ফজলুর রহমানের উল্লেখযোগ্য প্রকাশনাগুলোর মধ্যে রয়েছে 'সমকালীন প্রেমের গল্প' (সম্পাদনা), 'সত্তর দশকে প্রায় দুই'শ ছোটগল্প', উপন্যাস, কবিতা ও অন্যান্য রচনা।

এসএম মহসিন

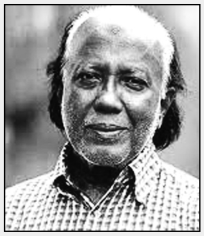

একুশে পদকপ্রাপ্ত অভিনয়শিল্পী, নাট্যশিক্ষক এসএম মহসিন (৭৩) মারা গেছেন। ১৮ এপ্রিল সকালে রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করা হয় এই বীর মুক্তিযোদ্ধাকে। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর এসএম মহসিনকে রাজধানীর হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এসএম মহসিন দেশের প্রখ্যাত মঞ্চ ও টেলিভিশন অভিনেতা। তিনি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্য বিভাগ অনুষদের সদস্য। গুণী এই অভিনেতা বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক এবং জাতীয় থিয়েটারের প্রথম প্রকল্প পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সরকার তাঁকে ২০২০ সালে একুশে পদক দেয়।

শহীদুজ্জামান খান

জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য, ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেসের নির্বাহী সম্পাদক শহীদুজ্জামান খান (৭২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। ৩০ মে রাজধানীর শ্যামলীর বাংলাদেশ স্পেশালাইজড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। শহীদুজ্জামান খান ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেসের শুরু থেকেই যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। তিনি ১৯৭০ সালে দ্য বাংলাদেশ অবজারভারে রিপোর্টার হিসাবে সাংবাদিকতা শুরু করেন। ডেইলি স্টারেও সাংবাদিকতা করেন তিনি। কাজ করেন ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফেও। মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

রিফাত সুলতানা

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে একাত্তর টিভির সহযোগী প্রযোজক রিফাত সুলতানা (৩২) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। মারা যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে তিনি একটি কন্যাসন্তান প্রসব করেন। রিফাত সুলতানা করোনায় আক্রান্ত হওয়ার পর রাজধানীর বিভিন্ন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন। সর্বশেষ ইমপালস হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

মো. রফিকুল আলম

আজকালের খবরের সাবেক মফস্‌সল সম্পাদক ও জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য মো. রফিকুল আলম ৪ এপ্রিল হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। গাজীপুর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

মিজানুর রহমান লুলু

দিনাজপুর থেকে প্রকাশিত দৈনিক তিস্তার সম্পাদক অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান লুলু (৭৪) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। ১২ জুন রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তিনি দিনাজপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১৯ এপ্রিল মিজানুর রহমান লুলু করোনায় আক্রান্ত হলে দিনাজপুর এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। গ্রামের বাড়ি পাঁচবাড়ি দ্বিমুখী উচ্চবিদ্যালয় মাঠে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

মমতাজ উদ্দীন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক কার্যনির্বাহী সদস্য ও ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক দপ্তর সম্পাদক সিনিয়র সাংবাদিক মমতাজ উদ্দীন (৬২) ২৭ জুন কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় গ্রামের বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। বরুড়ার শিলমুড়ী ইউনিয়নের সুলতানপুর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে জানাজা শেষে গোবিন্দপুর গ্রামে পারিবারিক কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

এনামুল হক

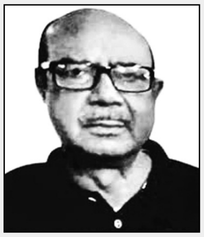

বিশিষ্ট সাংবাদিক এনামুল হক (৭২) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। ৭ এপ্রিল রাজধানীর মহাখালীতে ইউনিভার্সেল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। তাঁকে মিরপুর শহিদ বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে দাফন করা হয়। এনামুল হক দীর্ঘদিন দৈনিক বাংলায় কাজ করেছেন। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দৈনিক জনকণ্ঠের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্থায়ী সদস্য।

মঞ্জুর মোর্শেদ খান রিয়েন

একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি মঞ্জুর মোর্শেদ খান রিয়েন (৩৫) মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে ৯ এপ্রিল ঈশ্বরদীর আমবাগানের নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। ঈশ্বরদী কেন্দ্রীয় গোরস্তানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়েছে। তিনি প্রয়াত ভাষাসংগ্রামী মাহবুব আলী খানের নাতি এবং রাজনীতিক মাহবুব মোর্শেদ খান জেমের ছেলে।

খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন

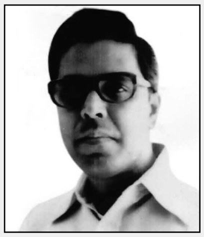

প্রবীণ সাংবাদিক খোন্দকার শাহাদাৎ হোসেন (৭৫) ৪ এপ্রিল রামপুরার একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। খোন্দকার শাহাদাৎ ১৯৪৫ সালের ৭ ডিসেম্বর বরগুনা জেলার বামনায় জন্মগ্রহণ করেন। সত্তর ও আশির দশকে সিনে পত্রিকা পূর্বাণীর সম্পাদক ছিলেন। সর্বশেষ দৈনিক ইত্তেফাকের জিএমের দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বাচসাসের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থানে জানাজা শেষে তাঁর লাশ দাফন করা হয়।

আবদুর রশিদ বাবু

রংপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি আবদুর রশিদ বাবু (৬৮) ২২ মে নিজ বাসভবনে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি বাংলাদেশ জাতীয় দলের সাবেক ক্রিকেটার সোহরাওয়ার্দী শুভর বাবা। জানাজা শেষে মুনশিপাড়া কবরস্থানে তাঁর লাশ দাফন করা হয়। আবদুর রশিদ বাবু ১৯৭০ সালে সাপ্তাহিক সিনে পত্রিকা 'চিত্রালী'তে কাজ করেন। এরপর তিনি দিনকাল, বাংলাবাজার ও দৈনিক ঢাকার ডাক পত্রিকায় রংপুর প্রতিনিধি হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আ হ ম ফয়সাল

ঢাকা সাব-এডিটরস কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য আ হ ম ফয়সাল (৫১) ৩০ এপ্রিল হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে কক্সবাজারের উখিয়া সদর হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তাঁর মরদেহ নিজ এলাকা লক্ষ্মীপুরের রামগতি উপজেলার আলেকজেন্ডার গ্রামে দাফন করা হয়। কর্মজীবনে তিনি ইউনাইটেড নিউজ টোয়েন্টিফোরে সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন।

আলী আহমেদ

খুলনা থেকে প্রকাশিত দৈনিক অনির্বাণ সম্পাদক এবং বাংলাদেশ আঞ্চলিক সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি অধ্যক্ষ আলী আহমেদ (৭৭) ২৯ এপ্রিল চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি...রাজিউন)। তিনি খুলনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি। দুই দফা জানাজা শেষে অধ্যক্ষ আলী আহমেদকে নগরীর টুটপাড়া কবরস্থানে দাফন করা হয়। সাতক্ষীরা জেলার কলারোয়া থানার মুরারীকাটি গ্রামে জন্ম নেওয়া আলী আহমেদ ১৯৬৪ সালে দৈনিক পূর্বদেশের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদদাতা হিসাবে সাংবাদিকতা জীবন শুরু করেন।

আহমেদ মুসা

বিশিষ্ট লেখক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আহমেদ মুসা ১৭ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি... রাজিউন)। তিনি বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের পরিচালক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

শফিউজ্জামান খান লোদী

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার অন্যতম পথিকৃৎ শফিউজ্জামান খান লোদী (৬৬)। ১৮ এপ্রিল রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। জানাজা শেষে উত্তরা ৪ নম্বর সেক্টরের কবরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়। চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার পাশাপাশি তিনি দীর্ঘদিন বেতার ও টিভির উপস্থাপক ছিলেন। চ্যানেল আইয়ের চলচ্চিত্রভিত্তিক অনুষ্ঠান 'আমার ছবি' টানা ১৮ বছর উপস্থাপনা করেছেন তিনি।

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ *এমপি*, সম্মানিত অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক *এমপি*, তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান *এমপি*, বিশেষ অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন, এটুআইয়ের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আব্দুল মান্নান পিএএ এবং সভাপ্রধান পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সঙ্গে পুরস্কার বিজয়ীরা

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১ প্রদান

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) এবং এটুআইয়ের যৌথ আয়োজনে ২৭ জুন ২০২১ পিআইবির অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন গণমাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও তথ্যপ্রযুক্তিবান্ধব নাগরিক সেবা সম্পর্কিত রিপোর্টিংয়ের জন্য সাত ক্যাটাগরিতে সাত সাংবাদিককে পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১ প্রদান করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ প্রধান অতিথি হিসাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান এমপি, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক এমপি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মকবুল হোসেন, এটুআইয়ের প্রকল্প পরিচালক ড. মো. আব্দুল মান্নান পিএএ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

ড. হাছান মাহ্‌মুদ

জুনাইদ আহমেদ পলক

ডা. মো. মুরাদ হাসান

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১ গ্রহণ করছেন এক পুরস্কার বিজয়ী

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, করোনাকালে অনলাইন আর টেলিভিশনের মাধ্যমে পাঠদান চলছে। এই পরিস্থিতি কতদিন চলবে, তা জানা নেই। তাই আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, যত দ্রুত সম্ভব বিটিভির একটি শিক্ষা চ্যানেল চালু করব। তিনি বলেন, সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির প্রভাব অনেক বেড়েছে। সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা রয়েছে। কিন্তু সবার আগে সর্বশেষ সংবাদ পরিবেশন করতে গিয়ে অনেক সময় ভুল হয়। এটি যেন না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। মন্ত্রী আরও বলেন, সাংবাদিকদের যদি ডিজিটাল লিটারেসি দেওয়া যায়, তাহলে তারা অনেক লাভবান হবেন। তাই আমরা প্রথম পর্যায়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও ময়মনসিংহে ডিজিটাল লিটারেসি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণের আয়োজন করব। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন বিভাগীয় শহরে এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান বলেন, গণমাধ্যম সরকারের ভুলত্রুটি তুলে ধরবে। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের সংবাদ জনগণের কাছে পৌঁছে দেবে। তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রণোদনা সহায়তা সাংবাদিকরা পাচ্ছেন। বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টের মাধ্যমে সাংবাদিকদের এই আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষ অতিথি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ২০২১ সাল আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছর ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্প পৌঁছানোর বছর। তিনি বলেন, করোনাকালে প্রযুক্তি ব্যবহার করে সাড়ে চার কোটি শিক্ষার্থীকে পাঠদান করা হচ্ছে। ১৫ মাসে ৪০ লাখ মানুষকে টেলিমেডিসিন সেবা দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ৪০ লাখ ই-ফাইল সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০১৬ সাল থেকে এই পর্যন্ত ১ কোটি ৯১ লাখ ই-ফাইল সম্পন্ন হয়েছে। এসব কর্মযজ্ঞ সম্পন্ন হয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়।

পিআইবি-এটুআই গণমাধ্যম পুরস্কার-২০২১ সালের পুরস্কার বিজয়ী হলেন জাতীয় সংবাদপত্র (বাংলা) ক্যাটাগরিতে দৈনিক জবাবদিহির প্রতিবেদক সাদেকুর রহমান, জাতীয় সংবাদপত্র (ইংরেজি) ক্যাটাগরিতে ফিন্যানসিয়াল এক্সপ্রেসের প্রতিবেদক জসীম উদ্‌দীন হারুন, টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে বাংলাভিশনের প্রতিবেদক আল মামুন, আঞ্চলিক সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে দৈনিক সিলেট মিররের প্রতিবেদক শুয়াইবুল ইসলাম, বেতার ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশ বেতারের মো. মোস্তাফিজুর রহমান, অনলাইন সংবাদপত্র ক্যাটাগরিতে বাংলানিউজ২৪-এর প্রতিবেদক সোলায়মান হাজারী এবং নারী সাংবাদিক ক্যাটাগরিতে চ্যানেল আইয়ের আঞ্জুমান লায়লা। অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিজয়ীদের প্রত্যেককে ৭৫ হাজার টাকা, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়, পিআইবি ও এটুআইয়ের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন গণমাধ্যম ব্যক্তিরা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ফিচার কর্মশালা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে দুদিনব্যাপী এক ফিচার কর্মশালা সম্প্রতি পিআইবিতে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সমাপন অনুষ্ঠানে সনদপত্র বিতরণ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. মফিজুর রহমান, চ্যানেল আইয়ের বার্তা সম্পাদক মীর মাশরুর জামান, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ১০টি বিশেষ উদ্যোগ কর্মসূচির

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে আয়োজিত ফিচার কর্মশালায় প্রধান অতিথি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ সহকারী ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়া বক্তব্য দিচ্ছেন

পিআইবির ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা ও পিআইবির সহকারী সম্পাদক মিজানুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিপ্লব বড়ুয়া বলেন, সাংবাদিকতা পেশার অন্তর্নিহিত একটা উদ্দেশ্য থাকে। এ পেশায় জীবিকানির্বাহের পাশাপাশি মানুষকে সঠিক তথ্য দেওয়া এবং মানুষের পাশে থাকার কমিটমেন্ট আছে। একটা স্বাধীন দেশের মানুষের মৌলিক অধিকার পেতে ৫০ বছর লেগেছে। আওয়ামী লীগ দুদশকে মানুষের উন্নয়নে অনেক কিছুই করেছে। সামাজিক নিরাপত্তাসহ ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ স্লোগানকে সামনে রেখে গ্রামীণ অবকাঠামোসহ নানান উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছে। তিনি বলেন, সাংবাদিকতা পেশার মাধ্যমে মানুষকে তথ্য জানানো এবং জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করা সম্ভব।

সভাপতির বক্তব্যে পিআইবির মহাপরিচালক ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ বলেন, কর্মশালা থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা কর্মজীবনে কাজে লাগালে সাংবাদিকতার গুণগত মান উন্নত হবে। একই সঙ্গে দেশ যে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাচ্ছে, জনগণ সে বিষয়ে জানতে পারবে।

২৫ ও ২৬ জুন দুদিনব্যাপী কর্মশালায় বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, বার্তা সংস্থা ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ৩০ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় ফিচার লেখার কলাকৌশল ও টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি, আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প, বিনিয়োগ বিকাশ, ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ, আশ্রয়ণ প্রকল্প, নারীর ক্ষমতায়ন, পরিবেশ সুরক্ষা, শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি, ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং কমিউনিটি ক্লিনিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে ওয়েবিনার

গত ২৫ ও ২৬ জুন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ বিষয়ে পিআইবি দুইটি ওয়েব সেমিনারের (ওয়েবিনার) আয়োজন করে। ওয়েবিনার দুটিতে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। রিসোর্স পারসন ছিলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক মোল্লাহ এম আমজাদ হোসেন।

ওয়েবিনার দুটির সমন্বয়ক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির সহ-সম্পাদক আকিল উজ জামান খান। ওয়েবিনার দুটিতে দুইদিনে মোট ৪০ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন।

অংশীজনদের সঙ্গে পিআইবির অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে অংশীজনদের সঙ্গে চারটি অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ জুন অংশীজনদের সঙ্গে সিটিজেন চার্টার ও অভিযোগ প্রতিকারব্যবস্থা বিষয়ে এবং ২৮, ২৯ ও ৩০ জুন অভিযোগ প্রতিকারব্যবস্থা বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিআইবির সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালাগুলো সঞ্চালনা করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। কর্মশালায় আলোচক ছিলেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান এবং রেপোটিয়ারের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির উপপরিচালক (প্রশাসন) চলতি দায়িত্ব মো. জাকির হোসেন। চারটি কর্মশালায় ৬০ অংশীজন অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবি'র কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার’ প্রদান অনুষ্ঠান পিআইবি সেমিনার কক্ষে ২৮ জুন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন পরিচালক প্রশাসন মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান, রিসার্চ অফিসার শেখ মজলিশ ফুয়াদ, উপপরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হেসেন প্রমুখ।

এ বছর কর্মকর্তাদের মধ্যে সার্বিক বিবেচনায় শুদ্ধাচার পুরস্কার পেয়েছেন উপপরিচালক প্রশাসন (চলতি দায়িত্ব) মো. জাকির হোসেন ও কর্মচারীদের মধ্যে স্টোরকিপার (চলতি দায়িত্ব) মল্লিক আল আমিন। এছাড়াও ২৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য সম্মানি ভাতা দেওয়া হয়।

মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ বলেন, পিআইবির কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের কাজে দক্ষতার প্রমাণ রেখেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় কর্মক্ষেত্রে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়েছে। একে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, পুরস্কারের মূল লক্ষ্যই হলো কাজে নিষ্ঠাবানদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান।

গণমাধ্যম সঠিকভাবে কাজ না করলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়

–তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী

তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, গণমাধ্যম যখন সঠিকভাবে কাজ না করে, তখন বহুমাত্রিক সমাজ ও গণতান্ত্রিক

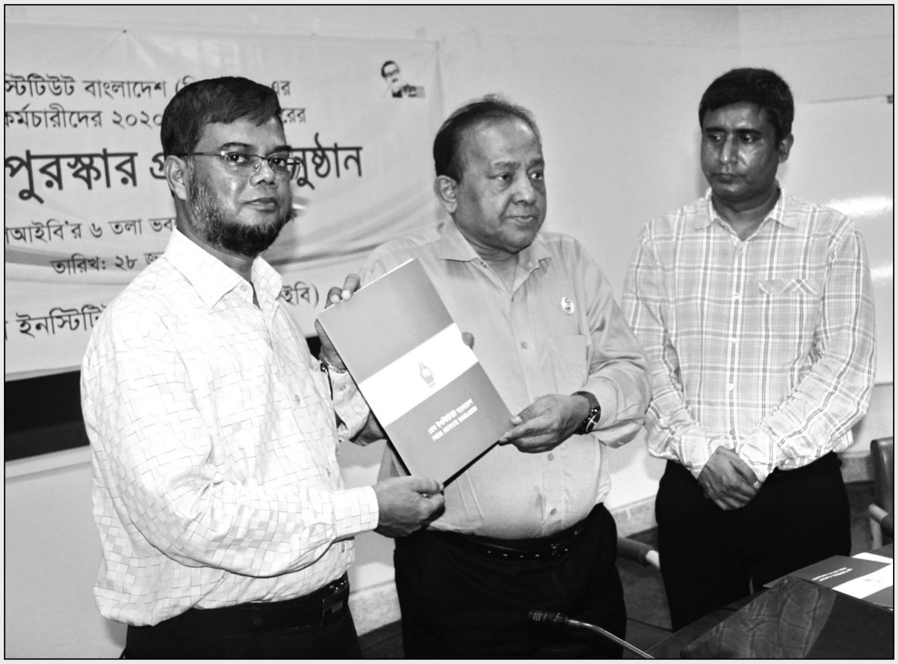

পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের কাছ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করছেন পিআইবি উপপরিচালক, প্রশাসন (চ.দা.) মো. জাকির হোসেন

চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ, *এমপি*

সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে ২ এপ্রিল কাপ্তাই উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া, রাউজান ও রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলার সাংবাদিকদের জন্য তিনদিনব্যাপী (৩১ মার্চ-২ এপ্রিল) সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা দেশকে উন্নত করতে চাই। বস্তুগত উন্নয়নের মাধ্যমে রাষ্ট্র উন্নত হবে। একটি উন্নত সমাজও হবে। যেখানে মানবিকতা, মূল্যবোধ, দেশাত্মবোধ ও মমত্ববোধ থাকবে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙামাটির জেলা প্রশাসক মো. মিজানুর রহমান, রাঙামাটির পুলিশ সুপার মীর মোদাচ্ছের হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. মামুন, কাপ্তাই উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা মুনতাসির জাহান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৪ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে ভিটামিন-‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে সংবাদ সম্মেলন

৫ থেকে ১৯ জুন দুই সপ্তাহব্যাপী ভিটামিন-‘এ’ প্লাস ক্যাপসুল ক্যাম্পেইন উপলক্ষ্যে ৩ জুন বৃহস্পতিবার প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) মিলনায়তনে সিভিল সার্জন অফিস আয়োজিত ও পিআইবির সহযোগিতায় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। এতে পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন ঢাকা জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন ও জেলা তথ্য অফিসের পরিচালক কাজী গোলাম আহাদ। ডেপুটি সিভিল সার্জন মুহাম্মদ বিল্লাল হোসেন বলেন, এবার ঢাকা জেলার ধামরাই, দোহার, কেরানীগঞ্জ, নবাবগঞ্জ ও সাভারের ৬৩টি ইউনিয়নে ৪ লাখ ৯১ হাজার ৪৭ জন শিশুকে ভিটামিন-‘এ’ ক্যাপসুল খাওয়ানোর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬-১১ মাস বয়সি ৬১ হাজার ৯৬৫ জন এবং ১২-৫৯ মাস বয়সি ৪ লাখ ২৯ হাজার ৮২ জন শিশু রয়েছে।

দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে উপকূলীয় বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক দুটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৭-৮ জুন বরিশাল, ভোলা ও পটুয়াখালী জেলার সাংবাদিকদের দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। একই সঙ্গে ৯-১০ জুন লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর ও নোয়াখালী জেলার সাংবাদিকদের জন্য আরও একটি দুর্যোগ সাংবাদিকতাবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণ দুটিতে উদ্বোধনী ও সমাপন বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণ দুটিতে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

পিআইবিতে শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালা

শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (পঞ্চম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালা ৭ জুন প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর সেমিনার কক্ষে অনুষ্ঠিত

পিআইবির সহযোগিতায় ঢাকা সিভিল সার্জন অফিস আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক পরিকল্পনা কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

হয়েছে। পিআইবি আয়োজিত এই পরিকল্পনা কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম প্রকল্পের পরিচালক এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব মো. আনছার আলী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. তানিয়া হক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন পিআইবির পরিচালক (প্রশাসন) মোহাম্মদ আফরাজুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের (ডিইউজে) সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) নির্বাহী সদস্য শেখ মামুনুর রশীদ, দৈনিক আমাদের নতুন সময়ের নির্বাহী সম্পাদক সালেহ বিপ্লব, ভোরের কাগজের বিশেষ প্রতিনিধি আসাদুজ্জামান প্রমুখ। কর্মশালায় সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ।

পিআইবিতে শিশু ও নারীবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (পঞ্চম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনব্যাপী (১১-১২ জুন) নারী ও শিশুবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১২ জুন পিআইবির সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফরিদা ইয়াসমিন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান খান, অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের জন্য বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের জন্য দুটি বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৮-১০ জুন সিলেটে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। ২০-২২ জুন কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতায় বুনিয়াদি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণগুলোয় প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে সমাপন বক্তব্য দেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। প্রশিক্ষণ দুটিতে ৭০ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারীবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে শিশু ও নারী উন্নয়নে সচেতনতামূলক যোগাযোগ কার্যক্রম (পঞ্চম পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য দুইদিনব্যাপী (৯-১০ জুন) শিশু ও নারীবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১০ জুন পিআইবির সেমিনার কক্ষে প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী সম্পাদক মুন্নী সাহা প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ। এর আগে ৯ জুন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন এটিএন বাংলার প্রধান নির্বাহী

শিশু ও নারী উন্নয়নবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন পিআইবি মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ

সম্পাদক জ. ই. মামুন। প্রশিক্ষণে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক আটটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর আয়োজনে জুম প্ল্যাটফরমের মাধ্যমে আটটি বিভাগের বিভিন্ন জেলার সাংবাদিকদের জন্য তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক আটটি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৪ জুন বরিশাল, ১৫ জুন সিলেট, ১৬ জুন খুলনা, ১৭ জুন রাজশাহী, ২০ জুন ঢাকা, ২১ জুন রংপুর, ২২ জুন চট্টগ্রাম এবং ২৩ জুন ময়মনসিংহ বিভাগের সাংবাদিকদের জন্য দিনব্যাপী তথ্য অধিকার আইনবিষয়ক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রশিক্ষণে তথ্য অধিকার আইনের সংজ্ঞা ও ধারণা, তথ্য অধিকার আইনের প্রায়োগিক দিক, তথ্যপ্রাপ্তির চ্যালেঞ্জ ও তথ্যপ্রাপ্তির কৌশল নিয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়। প্রত্যেকটি প্রশিক্ষণে ৩৫ জন করে সাংবাদিক অংশগ্রহণ করেন।

সম্ভাব্য সাংবাদিকদের জন্য শিশু ও নারীবিষয়ক রিপোর্টিং প্রশিক্ষণের সমাপন অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করছেন এটিএন নিউজের প্রধান নির্বাহী মুন্নী সাহা

সৈয়দ বদরুল আহসান পেলেন পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার

পিআইবি-সোহেল সামাদ স্মৃতি পুরস্কার- ২০২০ পেয়েছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক সৈয়দ বদরুল আহসান। কলাম লেখায় অবদান রাখায় তাঁকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। দ্য এশিয়ান এজ বাংলাদেশ-এর সম্পাদক সৈয়দ বদরুল আহসানের সাংবাদিকতা শুরু দ্য নিউ নেশন পত্রিকায়। এরপর তিনি কাজ করেন মর্নিং সান, বাংলাদেশ অবজারভার, ইনডিপেনডেন্ট, নিউজ টুডে এবং ডেইলি স্টারে। কলাম লেখার পাশাপাশি ১৯৯৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত তিনি লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশনে প্রেস মিনিস্টার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে: From Rebel to Founding Father: Sheikh Mujibur Rahman (2013), Glory and Despair: The Politics of Tajuddin Ahmed (2018) and The History Makers in Our Times (2018).

বাংলাদেশের সংবাদপত্র ছাড়াও তিনি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, সাউথ এশিয়া মনিটরসহ বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে নিয়মিত কলাম লেখেন।

পিআইবির মহাপরিচালকের মেয়াদ বাড়ল দুই বছর

আবারও দুই বছরের জন্য প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)-এর মহাপরিচালক হিসাবে নিয়োগ পেয়েছেন কবি ও একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক জাফর ওয়াজেদ। ২২ এপ্রিল পিআইবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৯(২) অনুযায়ী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সঙ্গে কর্মসম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে এই নিয়োগ দেওয়া হয়। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে এ নিয়োগের

আদেশ জারি করা হয়েছে। ২১ এপ্রিল যোগদানের তারিখ থেকে আগামী দুই বছর বিশিষ্ট এই সাংবাদিক পিআইবি মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে ২০১৯ সালের ২১ এপ্রিল পিআইবির মহাপরিচালক পদে নিয়োগ পান জাফর ওয়াজেদ। তাঁর সেই নিয়োগের মেয়াদ ২০ এপ্রিল শেষ হয়েছে।

পিআইবির নতুন পরিচালনা বোর্ড গঠিত

ইংরেজি দৈনিক দ্য ডেইলি সানের সম্পাদক এনামুল হক চৌধুরীকে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশের (পিআইবি) পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দিয়ে নতুন বোর্ড গঠন করা হয়েছে। ২২ জুন ২০২১ এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

পিআইবির ১৫ সদস্যের পরিচালনা বোর্ডে সদস্য হিসাবে রয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়), অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়), প্রধান তথ্য অফিসার (তথ্য অধিদফতর), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান, দৈনিক সমকালের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, দ্য বাংলাদেশ পোস্টের প্রধান সম্পাদক শরীফ শাহাবুদ্দিন, ডিবিসি নিউজের প্রধান সম্পাদক এম. মঞ্জুরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন-বিএফইউজের কোষাধ্যক্ষ দীপ আজাদ, বিএফইউজের সদস্য শেখ মামুনূর রশীদ, জাতীয় প্রেস ক্লাবের সভাপতি বেগম ফরিদা ইয়াসমিন এবং দৈনিক দেশ বর্তমানের সম্পাদক নাসিরুদ্দিন চৌধুরী। পিআইবির মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ এই বোর্ডে সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি) আইন, ২০১৮-এর ধারা ৭ অনুযায়ী এই বোর্ড গঠন করা হয়েছে। মনোনীত সদস্যরা মনোনয়নের তারিখ থেকে দুই বছরের জন্য স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। পিআইবি তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম ও উন্নয়ন যোগাযোগ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও প্রকাশনা নিয়ে পিআইবি কাজ করে।

গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য
পিআইবি'র প্রকাশনা

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও ফিচার বিভাগ
প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)
৩ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা